সাভারকার
ও
হিন্দুত্ব
এ জি নুরানী

সাভারকার ও হিন্দুত্ব

[গডসে-যোগসূত্র]

এ জি নুরানী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারি, ২০০৪
সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ
জানুয়ারি, ২০০৫

ভাষান্তর
কাবেরী বসু

প্রকাশক
সলিলকুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১ এ পি সি রোড
(ফেডারেশন হল, তৃতীয় তল)
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
গৌতম চট্টোপাধ্যায়

দাম : ৫৫ টাকা

২০০২ সালে গুজরাটের রক্তাক্ত ধ্বংসলীলার শিকার যাঁরা

এবং

প্রকাশনা ও বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যম

যাঁরা ভারতের গর্ব

তাঁদের উদ্দেশে

সূচী

মুখবন্ধ

হিন্দুত্বের মতাদর্শে বিশ্বাসীরাই বর্তমানে ভারতের কর্ণধার। শব্দটির স্রষ্টা বিনায়ক দামোদর সাভারকার যদিও অতীব বেদনায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছিলেন যে, তিনিই প্রথম তাঁর 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধের ভাববস্তু হিসেবে ১৯২৩ সালে এই শব্দটি 'উদ্ভাবন' করেছিলেন তবু অনেকেই এখনো এটিকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে একাসনে বসান। স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা স্বামী রামতীর্থ কিংবা এই মহান বিশ্বাসের অন্যান্য প্রচারকেরা কোনদিনই হিন্দুত্ব শব্দটি ব্যবহার করেননি। হিন্দুত্ব প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক দর্শন। ধর্মের সঙ্গে এর যে কোন যোগই নেই সেটি একটিমাত্র তথ্যে প্রকটিত হয়। এর প্রবক্তা সাভারকার নিজেই ছিলেন নাস্তিক। ধর্ম বা দর্শন চর্চার জন্য তাঁর একবিন্দু সময় ছিল না। রাজনৈতিক কাজকর্মেই তিনি ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর ঘৃণার নীতির সপক্ষে ইতিহাসকে কাজে লাগাতেন।

১৯৮৯-৯০ সালে বিজেপি হিন্দুত্বের বিশ্বাসকে আশ্রয় করল। আর কেবলমাত্র ২০০২ সালে বিজেপি-র হিন্দুত্বের প্রধান প্রবক্তা লালকৃষ্ণ আদবানী সাভারকারকে জাতীয় বীর হিসেবে ঘোষণা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন। অত্যন্ত ক্ষতিকারক এই প্রচেষ্টা। এর নিহিতার্থ ক্রমেই স্পষ্টতর হবে। ঠিক যেমন বিজেপি একেবারে খোলাখুলি হিন্দুত্বের প্রচার শুরু করার পর গত দশক ধরেই এর প্রভাব ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ১৯৯২ সালে ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা থেকে শুরু করে এই সেদিন ২০০২ সালে গুজরাটের রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক হত্যা এবং লুণ্ঠনে এক রক্তক্ষয়ী পদযাত্রা। আদবানী তো বারংবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, অযোধ্যা সংক্রান্ত প্রচারে বিজেপি অনেক মুনাফা করেছে। কিন্তু অনুদ্দেশ নিদারুণ যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এ দেশ। আর এস এস-এর রাজনৈতিক ক্ষেত্রটির ক্ষমতা দখল করার এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের বিরোধিতা করে, সাভারকার নিজেই করুণার পাত্র হয়ে গেলেন। 'অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদী'-এর ধারণা বর্জন করলেন তিনি এবং 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর প্রচারক হয়ে উঠলেন। আর এস এস এবং বিজেপি এই মতবাদেই অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। সাভারকার ও আর এস এস এবং বিজেপি-র নেতাদের রচনা থেকে হিন্দুত্বের ধারণা ও সমোন্নতিরেখাগুলি শাণিত কঠোরতায় প্রতিভাত হলো।

জাতীয় বীর হিসাবে সাভারকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিজেপি-র প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক রূপে গান্ধীর মহিমান্বিত অবস্থান থেকে

তাঁকে অপসারণের এক হীন প্রয়াস। সাভারকার যে গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এই অভিমত পোষণ করতেন বল্লভভাই প্যাটেল এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিচারক জীবনলাল কাপুরের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশন। তাঁদের এই অভিমতের নিরিখে বিজেপি-র এই খেলা আরো বেশি ছলনাময়, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। ভারতের নীতিগুলিকে ঢেলে সাজানো এবং তার আত্মিক চরিত্রের নবরূপ দেওয়া— এই হলো এর উদ্দেশ্য। এই ব্যাপকতর উদ্দেশ্যের একটি অংশ হলো শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণ। সাভারকার বারবার ব্রিটিশ শাসকের কাছে নতজানু হয়েছেন, আপত্তিকর ভঙ্গিতে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে একজোট হবার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি নাকি বীর। এভাবেই ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রাচীন তথ্য সংক্রান্ত প্রতিটি গবেষণায় হতভাগার মতো তাঁর চেহারা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যিনি জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, একঅর্থে তাঁকে বিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতাও বলা চলে, তিনি ১৯৪২ সালে প্রস্তাবিত ভারত-ছাড় আন্দোলনের সময় গোপনে এমন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর কেউ নয়, অবজ্ঞাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল খোদ ব্রিটিশ শাসক।

গান্ধী হত্যায় সাভারকারের ভূমিকা এবং তাঁর নীতিসমূহ প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক বিবরণ হয়ত পড়েছেন। সেই সাভারকারকেই আবার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আদবানীর এই উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায় এই গ্রন্থে লেখক সেই সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান একত্রিত করেছেন এবং সহ-নাগরিকদের স্বাধীন বিচারের জন্য এগুলি তাঁদের দরবারে উপস্থাপিত করেছেন। এক গভীর, গভীরতর সর্বনাশের মুখোমুখি আমরা।

নানান গবেষণাকর্মে সহায়তা করার জন্য নতুন দিল্লিস্থ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজ্-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক মুশিরুল হাসানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। লেফ্‌ট ওয়ার্ড বুকস সংস্থার শিল্পী গোস্বামী পাণ্ডুলিপি নিয়ে যে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করেছেন সেজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ। লেফট ওয়ার্ড বুকস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুধন্য দেশপাণ্ডে সর্বদাই সাহায্যের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে বিশালতর ক্ষেত্রে তাঁর সহৃদয় সহায়তা প্রসারিত করে থাকেন। এবারে, তিনি পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা ব্যতিরেকে গবেষণার কাজেও সাহায্য করেছেন। এই প্রকাশনা সংস্থায় কর্মরত তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের কথাও ভুলতে পারবো না। কিন্তু গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যের দায় একমাত্র গ্রন্থকারের, বন্ধুদের কারোর-ই এবিষয়ে কোন দায়িত্ব নেই।

পরিশেষে, সবিশেষ গুরুত্বে যার অমূল্য সহায়তার কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তিনি পি এম ম্যাথুউ। গত দেড় শতকের বেশি সময় তাঁর এই সাহায্য পেয়ে আসছি। অতীতে আমার সমস্ত শিথিলতা সংশোধন করেছেন তিনি। একমাত্র তিনিই আমার অপাঠ্য পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করে টাইপ-করা হরফে তাদের পাঠযোগ্য করে তুলতে পারেন। ১৯৮৫ সাল থেকে যা কিছু লিখেছি আমি, সমস্ত গ্রন্থ, সমস্ত নিবন্ধ তাঁর যত্নে সুন্দর হয়ে উঠেছে।

তাঁর কাছে আমার অসীম ঋণ।

এ জি নুরানী

১. কিংবদন্তী এবং মানুষটি

বিলম্বে হলেও শেষপর্যন্ত ন্যায়বিচার পেলেন মানুষটি।

২০০২ সালের ৪ঠা মে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অবশেষে বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে স্বীকৃতি দিল; বীর হিসাবে, পূজনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিল। সেইমতো জনসমক্ষে প্রচারের কাজে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ব্রতী হলো তারা। তাঁর কাছে পার্টির যে সুবিপুল তাত্ত্বিক ঋণ একাজ একরকম তারই বিলম্বিত স্বীকৃতি। তাঁর নাম কখনো উচ্চারিত হয়নি। এমনকী এক দশক আগে, সে সময়কার অপেক্ষমান-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি যখন তাঁর দলের রাজনৈতিক ভাগ্যের সঙ্গে 'হিন্দুত্ব' নামক নক্ষত্রটি জুড়ে দিলেন তখনো নয়। সাম্প্রতিককালের নিরিখে এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। এটি প্রথম উদ্ভাবন করেন সাভারকার, ১৯২৩ সালে। বারংবার বেশ সোজা কথায় তিনি বুঝিয়ে দেন যে, ভ্রমক্রমে যেন একে 'হিন্দুধর্ম'-এর সঙ্গে একাকার করে ফেলা না হয়। তাদের এহেন বীরের প্রতি বিজেপি'র এমন আপাত-উপেক্ষা লজ্জাজনক। আর এর কারণ নির্ধারণ সম্ভবত সাধ্যের অতীত। উপমা সাদৃশ্য টানলে বলতে হয়, এ যেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে কার্ল মার্কসের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ না করার শপথ নেওয়া— অনেকটা এইরকমই ব্যাপার। ১৯৮০ সালে বিজেপি'র প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে যদি কেউ দলটির গড়ে-ওঠা, এর প্রকৃত দায়বদ্ধতা আর বিশ্বাসের চরিত্র গোপন করার প্রচেষ্টা, সর্বসাধারণের সামনে অন্য এক ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের সমগ্র কলাকৌশল— এ সমস্তই স্মরণে আনেন, তবেই এই অনুল্লেখ সঠিকভাবে বোধগম্য হবে।

৪ঠা মে, ২০০২, পোর্ট ব্লেয়ারে আদবানি যা বলেছেন, সেকথা তিনি পার্টি প্রতিষ্ঠার বেশ অনেক বছর পরে এমনকী ১৯৮৯ সালেও বলছেন এমন কল্পনা করা বেশ কঠিন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার বিমানবন্দরটি বীর সাভারকার বিমানবন্দর হিসেবে নামাঙ্কিত করার জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া আমাদের জানাচ্ছে যে, বিস্তারিতভাবে আদবানি আলোচনা করলেন কেমনভাবে ১৯৪২ সালে সাভারকারের 'প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম' বইটি পড়ার পর সেই তরুণ বয়স থেকেই তিনি সাভারকারকে তাঁর আদর্শ করেছিলেন... সাভারকারের রচনা থেকেই যে তিনি ''অতি কলঙ্কিত হিন্দুত্ব শব্দ''-টির সঙ্গে পরিচিত হন সেকথাও নিজমুখে স্বীকার করলেন।[১] সর্বাংশে সত্য এ কথা। কেননা বিবেকানন্দ কিংবা অরবিন্দ ঘোষের রচনায় তিনি কোনোমতেই এ শব্দটি খুঁজে পাবেন না। হিন্দু ধর্মের মহান দর্শন প্রচার করে গেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, দ্বি-জাতি

তত্ত্ব আর ঘৃণার দর্শন প্রচারের জন্য সাভারকার তাঁর 'হিন্দুত্ব : হিন্দু কে? (১৯২৩)' নিবন্ধে ঐ শব্দটি উদ্ভাবন করেছেন। হিন্দুধর্ম মহান। হিন্দুধর্ম প্রাচীন। মানুষকে আত্মোপলব্ধির রাস্তা দেখায় এই ধর্ম। আর হিন্দুত্ব হলো, অনুদার, আধুনিক। দুই আদিমতম আবেগ— ভয় আর ঘৃণাকে জাগরিত করে এটি মানুষকে তার স্বধর্মচ্যুত করে।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত সাভারকারের 'ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম — ১৮৫৭' গ্রন্থটিতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি আসেনি। অতএব 'সাভারকারের রচনাবলী'র মধ্যে আদবানি সেই প্রধান প্রধান রচনাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে অবশ্যই 'হিন্দুত্ব' রয়েছে। আরো বেশ কয়েকটি রচনা এবং বক্তৃতার অংশবিশেষ পরে উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁর রথযাত্রায় (অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য 'রথযাত্রা') সমাসীন হয়েই তিনি যখন হিন্দুত্বের প্রচার শুরু করে দিলেন, তখনই বেশ পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, হিন্দুত্বের রসধারা তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। অবশ্য এর উদ্ভাবক সেসময় তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি— এতদিন পরে সে কাজটি সারা হলো পোর্ট ব্লেয়ারে। 'অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই... বিস্তৃত অর্থে 'হিন্দুত্ব' সাভারকারের উদ্ভাবিত শব্দ। এটি এক সর্বপ্রসারী তত্ত্ব যার মূল প্রোথিত দেশের ঐতিহ্যের গভীরে।'[২] তাই যদি হয়, তাহলে পূর্বেই এর স্বীকৃতির প্রশ্নে কেন এমন বাক্‌সংযম?

সাভারকার এবং গান্ধী

আদবানির প্রকৃত উদ্দেশ্যের নিরিখে পোর্ট ব্লেয়ার বিমানবন্দরের এই নতুন নামকরণ বেশ প্রাসঙ্গিক। এই উপলক্ষ্যটি ব্যবহার করে তিনি আসলে যে বার্তা পাঠাতে চাইলেন সেটি অবজার্ভার-এর নজর এড়ালো না : 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানি সংকেত পাঠালেন যে, তিনি কিংবা তাঁর দল কেউই তাঁদের হিন্দুত্ব তত্ত্বের বিষয়ে ক্ষমাপ্রার্থী নন।' আদবানি বললেন, ''আজ হিন্দুত্ব একটি আপত্তিকর শব্দ হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বীর সাভারকার এবং আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ারের মতো হিন্দুত্বের অগ্রগামী প্রচারকেরা উগ্র-জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনার যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে তার অবদান রয়ে গেছে।''[৩]

নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণ। কংগ্রেস যে মাসে সমস্ত প্রদেশে তার যত মন্ত্রী আছে সবাইকে পদত্যাগ করতে বলছে, ১৯৩৯ সালের সেই অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে সাভারকার বোম্বেতে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ভাইসরয় লিনলিথগো-র সঙ্গে দেখা করে ব্রিটিশের সপক্ষে অত্যুৎসাহী সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষ বিষয়ক রাষ্ট্রসচিব লর্ড জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন :

তিনি (সাভারকার) বললেন, পরিস্থিতি এমন যে, মহামান্য সরকার বাহাদুরের উচিত হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করা এবং তাদের সমর্থন নিয়ে কাজ করা। অতীতে যদিও আমাদের এবং হিন্দুদের মধ্যে বেশ ভালো রকমের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা ছিল, সে যা হোক, গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। খুবই

সাম্প্রতিককালের ঘটনায় রাশিয়া আর জার্মানির সম্পর্কও তাই ছিল। এখন আমাদের পরস্পরের স্বার্থ একই, আর তাই আমাদের একত্রে কাজ করা উচিত। তিনি এই মুহূর্তে যদিও চরমতম নরমপন্থীদের একজন, কিন্তু অতীতে যে তিনি একটি বিপ্লবী দলের অনুগামী ছিলেন, সম্ভাব্য কারণেই সে বিষয়ে আমাকে সচেতন থাকতে হচ্ছিল (আমি নিশ্চিত যে, আমি তা ছিলাম)। কিন্তু বর্তমানে আমাদের স্বার্থসমূহ পরস্পরকে এমন দৃঢ়ভাবে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে যে হিন্দুধর্ম আর গ্রেট ব্রিটেন উভয়ের পক্ষে একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠাই জরুরী বিষয়। পুরোনো শত্রুতা আর মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।[৪]

সাভারকার যে 'উগ্র-জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা' প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, সে হলো হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা। সেলুলার জেল এলাকার অভ্যন্তরে সাভারকারের কুঠুরীতে গিয়েছিলেন আদবানি। "মোরারজী দেশাই সরকার (১৯৭৭-৭৯ সালের জনতা পার্টির সরকার যার সদস্য ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং আদবানি) যদিও সমগ্র জেল এলাকাটিকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় স্মারক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, তবু সম্প্রতি সাভারকারের কুঠুরীতে একটা ফলক স্থাপনা করে তাঁকে এমন এক নেতা হিসেবে মহিমান্বিত করা হলো যিনি দেশকে দিয়েছিলেন 'হিন্দুত্বের মন্ত্র, সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে সাম্য, হিন্দু জাতিসত্তা, অখণ্ড ভারত' "।[৫] ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কোনো উল্লেখই নেই।

মোরারজী দেশাই যে ইচ্ছাকৃতভাবেই ১৯৭৯ সালে সাভারকারকে সম্মান প্রদর্শন করেননি সেটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পোর্ট ব্লেয়ারে আদবানি যাঁকে আঘাতে আঘাতে একেবারে জর্জরিত করে ফেলেছিলেন, মোরারজী দেশাই নিশ্চয়ই সেই জওহরলাল নেহরুর সহচর ছিলেন না। বোম্বে প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন, দেশাই গান্ধী-হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায়, প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট-জেনারেল সি কে দপ্তরির ওপর সাভারকারের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে মামলা চালানোর দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তদন্তকার্য পরিচালনা করেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত স্বনির্বাচিত পুলিস অফিসার, বোম্বে সি আই ডি স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক এবং দুই নম্বর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জামশিদ ('জিম্মি') ডি. নাগরওয়ালা। স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একত্রিত করার কৃতিত্ব তাঁরই।

এই মামলায় সাভারকার এক চুলের জন্য রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন; অপরাধী সাব্যস্ত হননি। অপরাধের সহযোগী ব্যক্তির সাক্ষ্যের সত্যতা, নিরপেক্ষ স্বাধীন সাক্ষ্যের সাহায্যে সমস্ত বাস্তব কোণ থেকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করা আইনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। রাজসাক্ষী দিগম্বর ব্যাজের যে সাক্ষ্যে সাভারকারকে স্পষ্টতই অভিসম্পাত করা হয়েছিল, আইনের প্রয়োজন মতো তার কোনো নিরপেক্ষ সমর্থনকারী ছিল না। কেবলমাত্র এই কারণেই সাভারকার বেকসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাজকে বিচারক আত্মাচরণ সত্যবাদী সাক্ষী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। 'একেবারে সরাসরি, খোলাখুলিভাবে তার বর্ণনায় প্রকৃত ঘটনার সমস্ত তথ্য সে জানিয়েছিল। কখনো জেরার সময় সে অসহযোগিতা করেনি কিংবা কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার বা কৌশলে জবাব

দেবার চেষ্টা করেননি।' তার বর্ণনা অনুযায়ী জানুয়ারির ১৭ তারিখে, সে হত্যাকারী নাথুরাম বিনায়ক গডসে আর সহযোগী নারায়ণ আপ্তের সঙ্গে সাভারকারের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে তাদের বিদায় জানাবার সময় সে সাভারকারকে বলতে শুনেছিল যে : 'যশস্বী হৌন ইয়া' (সফল হয়ে ফিরে এসো)। ফেরবার পথে আপ্তে ব্যজেকে বলেছিল যে, সাভারকার ভবিষ্যবাণী করেছেন, 'গান্ধীজীর শতক শেষ— কাজ যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সারা হবে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।'[৬]

আদালতে নাথুরাম গডসে সাভারকারকে 'হিন্দুদের সপক্ষে সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রচারক' হিসেবে মহিমান্বিত করেছিল। ১৯২৯ সালে এরা একে অপরকে চিনত। অতএব, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি নতুন দিল্লির বিড়লা ভবনে গান্ধী-হত্যার অব্যবহিত পরেই সন্দেহের কালো মেঘ সাভারকারের ওপর ঘনিয়ে এল। ঠিক তার পরের দিনই পুলিস তাঁর বাড়ি তল্লাশি করল এবং কড়া নজর রাখল তাঁর ওপর। ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে তিনি গ্রেপ্তার হলেন এবং তাঁকে কয়েদ করা হলো। মার্চ মাসের ১১ তারিখে, জেলে থাকাকালীন তাঁকে দিল্লির প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেওয়া হলো। যে মানুষটিকে তিনি সবচেয়ে ঘৃণা করতেন, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ— এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

৮ই আগস্ট, ১৯৪২ সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামান্য পূর্বে গান্ধীজী তাঁর সেই বিখ্যাত ভাষণে বললেন : 'ড. মুঞ্জে এবং শ্রী সাভারকারের মতো যেসব হিন্দু, মুসলমানদের হিন্দুদের আধিপত্যে রাখার জন্য তলোয়ারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, আমি হিন্দুদের সেই অংশের প্রতিনিধি নই। আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি।'[৭] একেবারে পুরোপুরি দুই বিপরীত জগতে গান্ধী এবং সাভারকারের অবস্থান। তাঁরা যে মতাদর্শ, যে নীতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেগুলি তীব্রভাবে পরস্পর সংঘাতী। গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচার করে গেছেন। সাভারকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই বিশেষ ধারণাটিকে বাতিল করে দিয়েছেন।

স্বভাবত, সেই কারণেই সাভারকার ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই ভারতীয় সাংবিধানিক গণপরিষদে গৃহীত ভারতের জাতীয় পতাকাটি-ও বাতিল করে দিয়েছিলেন। "সমগ্র গণ-পরিষদ উঠে দাঁড়িয়ে" সর্বসম্মতিক্রমে এই পতাকাটির প্রবর্তনা করেছিল। এই আলোচনার শেষ বক্তা শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু তাঁর মর্মস্পর্শী উপসংহারে বললেন, 'আমরা যাই হই না কেন, হিন্দু বা মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ কিংবা জরথুস্ত্রীয় এবং অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী, আমাদের ভারত জননী অভিন্নহৃদয়া, অবিভক্ত উদ্দীপনায় উদ্ভাসিতা। পুনর্জাত এই ভারতভূমির সমস্ত নারীপুরুষ উঠে দাঁড়াও, এই পতাকাকে অভিবাদন জানাও। আমি আহ্বান জানাচ্ছি, উঠে দাঁড়াও, এই পতাকাকে অভিবাদন জানাও (সমবেত হর্ষোল্লাস)।' গণপরিষদের রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই একতার সুরটি অনুভব করে বললেন: 'সদস্যদের আমি বলবো, যে সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা পতাকার প্রতি তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করেছেন, আধ মিনিট নিজ নিজ অবস্থানে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরা সেই সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করুন।'

এক সপ্তাহ পরে, জুলাই মাসের ২৯ তারিখে সাভারকার, একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন, যেখানে গান্ধীজীর প্রতি তির্যক কটাক্ষে তিনি 'চরকা'-র পরিবর্তে সারনাথের অশোক-স্তম্ভের 'চক্র'-টির (চাকা) সংযুক্তিকে স্বাগত জানান। 'কংগ্রেসীদের সেই পুরোনো ঢং স্বাভাবিকভাবেই দৃঢ় বিরোধিতাকে উসকে দিয়েছিল, বিশেষভাবে হিন্দু সংঘের প্রচারকেরাই তার নেতৃত্বে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত চরকা প্রতীকটি অপসারণের মাধ্যমে এই প্রতিরোধ সফল হলো। চরকাটি এখন তার সঠিক স্থান— খাদি ভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং সম্ভবত যে কোনো বয়ন সঙ্ঘের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে এটি বেশ মানানসই হয়ে উঠবে।' এর সঙ্গে তিনি আরও বলেন :

> নিরপেক্ষ বিচারে সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রের জন্য গৃহীত এই নতুন পতাকার অনেক ভালো ভালো দিক চোখে পড়লেও এবং সেকারণে এটিকে তুলনায় কম আপত্তিকর মনে হলেও, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আমি বলব, কোনো অবস্থাতেই এটিকে হিন্দুস্থানের জাতীয় পতাকা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। প্রথমত, সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র এবং তথাকথিত গণপরিষদ ব্রিটিশের গড়া, জাতীয় গণভোটে নির্ধারিত আমাদের জনগণের স্বাধীন নির্বাচনে সৃষ্ট নয়। এমনকী আজও তা জাতীয় সম্মতি কিংবা জাতীয় শক্তি নয়, তাদের চরম প্রেরণা হলো ব্রিটিশের বেয়নেট। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশেষ উল্লেখে এক জাতি, এক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের সংহতি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, আমাদের মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ, বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীদের দুষ্কর্ম আড়াল করার অপরাধ এই সব কথাই কেবল মনে পড়ে যায়। গোটা দেশের কাছ থেকে কোনো সঠিক অনুমোদন ছাড়াই কেবলমাত্র এমনই এক পার্টির গৃহীত এই যে জাতীয় পতাকা, একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী কেমন করে সেই পতাকাকে অভিবাদন করতে পারে!
>
> না: একমাত্র ভাগোয়া, (গৈরিক পতাকা) যার বুকে অঙ্কিত আমাদের জাতিসত্তার আপন উপস্থিতির প্রকাশে উদ্ভাসিত কুণ্ডলিকা এবং কৃপাণ, সেটি ছাড়া সিন্ধু থেকে সমুদ্র অবধি বিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন, অবিভক্ত আমাদের পবিত্রভূমি, আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের আর অন্য কোনো কর্তৃত্বপ্রকাশী জাতীয় পতাকা হতে পারে কি! এটি কারোর ফরমাশে গড়া নয়, আমাদের জাতিসত্তার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে এটি স্বতোদ্ভাষিত। আমাদের হিন্দু-ইতিহাসের সমগ্র বিস্তৃত দৃশ্যপট এই পতাকায় প্রতিবিম্বিত। লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রকৃতপক্ষে এরই পূজারী। ইতিমধ্যেই হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে দক্ষিণের সমুদ্র অবধি এটি স্বমহিমায় উড্ডীন। অন্যান্য দলীয় পতাকাগুলিকে বরদাস্ত করা যেতে পারে। সেইজন্যে এদের কয়েকটিকে এমনকী কিছুটা সম্মানও করা যেতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই হিন্দুরাজত্ব তার জাতীয় আদর্শ হিসেবে এই হিন্দু-অনুসারী ধ্বজা, এই ভাগোয়া পতাকা ছাড়া আর অন্য কোনো পতাকাকে আনুগত্যে অভিবাদন করতে পারে না।[৮]

পোর্ট ব্লেয়ারে জেলের অভ্যন্তরে সাভারকারের কুঠুরীতে সম্প্রতি উন্মোচিত ফলকটির পাশে অবশ্যই ইতিহাসের এই আর একটি খণ্ড রয়েছে। এই হলো সেই মানুষ যাকে আজ বিজেপি জাতীয় বীর হিসাবে মহিমান্বিত করছে। সেজন্যেই গুজরাটে সংগঠিত গণ-হত্যা ও লুণ্ঠনের পর যখন সামান্য আরোগ্যের লক্ষণ চোখে পড়ছে, এমনই এক সময়ে সাভারকারের প্রতি আদবানির এই অসংযত প্রশংসাবাক্য, বিজেপি-র ইতিহাসে একটি সংজ্ঞাত মুহূর্তকে চিহ্নিত করছে। আদবানি নিশ্চয়ই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। খুব তাড়াতাড়ি না হলেও, ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর সেটিকে দখল করবেন এমনই আশা তাঁর। কিন্তু এর চেয়েও বিশালতর যে লক্ষ্য তাঁর রয়েছে সেটি এখনো দূরতিক্রম্য। তিনি চান, এই ঋজু পরিস্থিতি তাঁর দলের ওপর বলপূর্বক যে সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দিয়েছে, বিজেপি তার সমস্ত বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলুক; তার যে বিকল্প নিজস্ব বিশ্বাস— হিন্দুত্বের বিশ্বাস তাকে সঙ্গী করে অত্যন্ত সাহসিকতায় একেবারে খোলাখুলি সর্বসমক্ষে অবতীর্ণ হোক। আর তিনি তখন গান্ধীজীকে সরিয়ে এই বিশ্বাসের উদ্ভাবক সাভারকারকে জাতীয় বীর হিসেবে সেই আসনে বসাবার আদেশ জারি করতে পারবেন। পোর্ট ব্লেয়ারে আদবানি তিক্তস্বরে বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, "কোনো কোনো পার্টি তাদের সংকীর্ণ তাত্ত্বিক দর্শনের কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় বীরদের কোনো একটি রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে রাখে!"[১০] নিশ্চিতরূপে এখানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টরাও এই গর্বিত সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন। এমনকী ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক কোনো সংগঠনের সদস্যপদের বিষয়টি নিষিদ্ধ করে দেবার আগে পর্যন্ত হিন্দু মহাসভাও তাই-ই ছিল। কংগ্রেসীরা যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে জেলে গেলেন, মহাসভা তখন ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলালো। কংগ্রেস দাঁড়াল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সপক্ষে। সাভারকার স্লোগান তুললেন : 'নীতিগুলি হিন্দু-রঙে রঞ্জিত কর আর সশস্ত্র কর হিন্দুরাজকে।' আদবানি এবং সাভারকারের অন্যান্য গুণমুগ্ধেরা অভিযোগ করেন যে, তাদের বীর 'তাঁর প্রাপ্য পাননি'। কিন্তু একথা বলে তাঁরা সাভারকার আর তাঁর বিমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের দেশাত্মবোধ এবং আত্মত্যাগের লিখিত দলিলের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমন এক আলোচনা পর্বে আমরা দেখতে পাবো যে, এর মধ্যে সাংঘাতিক এক ঝুঁকির ফাঁদ পাতা আছে। সর্বসমক্ষে সত্যের আবরণ উন্মোচনের ঝুঁকি।

হিন্দুত্বকে বরণ

আর এস এস (RSS)-এর মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এ একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো যে, "১৯৯১ সালের ১৩ই মার্চ "আগে কখনো দেখা যায়নি এমন সংখ্যায়" এক ঝাঁক নেতা এবং বুদ্ধিজীবী সাভারকারকে স্মরণ করলেন।'[১১] এই 'ঝাঁকের' মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে এল কে আদবানি, এম এল সোন্ধি, রাম জেঠমালানি, ভি কে মালহোত্রা, বিজয় রাজে সিন্ধিয়া এবং বালারাও সাভারকার বিরাজমান ছিলেন। প্রতিবেদনে আদবানির অবদানকে

একটি বাক্যে একত্রিত করা হলো: আদবানিজী তাঁর লেখন-ক্ষমতা এবং দেশাত্মবোধের বর্ণনা দিলেন। স্মরণ করা যেতে পারে, পোর্ট ব্লেয়ারে আদবানি দাবি করেন যে, তিনি 'তাঁর যৌবনকাল থেকেই সাভারকারকে আদর্শ করেছিলেন'। কিন্তু ১৯৯১ সালের প্রতিবেদনটিতে সে কথার কোনো উল্লেখ নেই। আদর্শায়িত হবার এই কাহিনীটি নিশ্চয়ই সুবিধাজনক কোনো মুহূর্তে প্রকাশের ইচ্ছায় তাঁর হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে অর্গলবদ্ধ করে রাখা ছিল।

সাভারকারের প্রতি এই বিলম্বিত 'ন্যায়বিচার' সেই চিরাচরিত চৌর্যবৃত্তি, প্রবঞ্চনা। এরই সহায়তায় বিজেপি তার পরামর্শদাতা 'আর এস এস' এবং তার বীর 'সাভারকারের' প্রচারিত হিন্দুরাষ্ট্রের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।[১২]

১৯৮০ সালের এপ্রিলে যখন জনসঙ্ঘের সদস্যরা আর এস এস-এ তাঁদের দ্বৈত সদস্যপদের প্রশ্নে জনতা পার্টি থেকে ইস্তফা দিলেন, তখন তাঁদের সামনে কেবল একটি সৎ উদ্দেশ্য থাকার কথা : জনসঙ্ঘকে পুনর্গঠিত করা। কিন্তু তাঁরা তা করলেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে জনসঙ্ঘের নাম কালিমালিপ্ত হয়ে গেছে। পরিবর্তে তাঁরা জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত জনতা পার্টির মিথ্যা পতাকার নিচে একত্রিত হলেন। পাঁচ বছর পর, ১৯৮৫ সালের ২০শে জুলাই ভূপালে, আত্মপরিচয়ের যে কোনো সঙ্কট ছিল বাজপেয়ী সে কথাই অস্বীকার করলেন, 'জনসঙ্ঘ থেকে আমরা আবার বেরিয়ে এলাম কবে?' সুনিপুণ বাগ্মিতায় তিনি প্রশ্ন তুললেন।[১৩]

অথচ, মাত্র পাঁচ বছর আগে, 'ডেবোনেয়ার'-কে দেওয়া একটি অকপট সাক্ষাৎকারে বাজপেয়ী বলেছিলেন যে বিজেপি জনসঙ্ঘের থেকে 'আলাদা':

> জনসঙ্ঘ অনেকটা বিরোধী সংগঠনের মতো কাজ করছিল... হিন্দুদের প্রতি একপেশে পক্ষপাত নিয়ে। এতে তো ভুল কিছু নেই। কেননা ভারতীয় সমাজের সব অংশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা, তার উন্নতি করা, এসব তো হওয়ার কথা। কিন্তু জনসংঘের একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবমূর্তি ছিল। কেননা এটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত। ড. মুখার্জি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা, দেশভাগের ঠিক পরেই আমরা ৩৭০ ধারাটির (সংবিধানের যে ধারাটিতে কাশ্মীরকে কয়েকটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল) বিলুপ্তির কথা তুলেছিলাম।

আর একটা বিষয় 'আর এস এস-এর সঙ্গে এর কিছুটা যোগাযোগ' ছিল। সাময়িক পত্রিকাটি এর পরে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নটি করেছিল :

> ডেবোনিয়ার : গান্ধীজীর হত্যা?
>
> বাজপেয়ী : হ্যাঁ। ঐসব পুরোনো প্রসঙ্গ।

যখন জিজ্ঞেস করা হলো, 'কী হিসেবে আপনারা সংখ্যালঘুদের কাছে বেশি গ্রহণীয়?' বাজপেয়ী উত্তর দিলেন : 'প্রশ্নটা তো সংখ্যালঘুদের কাছে বেশি গ্রহণীয় হওয়া নয়। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠা এটাই হলো প্রশ্ন।'[১৪] জনসঙ্ঘের মতো বিজেপি-ও হিন্দুদের সঙ্গে পাওয়ার আগ্রহেই যত্নবান ছিল। 'গান্ধীজীর হত্যা' আর

'সব পুরোনো প্রসঙ্গ' এই একটা কারণে যদি সাভারকার আর হিন্দুত্বের কথা মুখে উচ্চারণ করা না যায়, তবে রইলেন এস পি মুখার্জি। তাঁকে জুড়ে নেওয়া গেল।

অসততার ক্রমোন্নতির যাত্রাপথে সন্ধিক্ষণের মুহূর্তগুলো চিহ্নিত করা যাক। ১৯৮০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মুম্বাই-তে অনুষ্ঠিত বিজেপি-এর প্রথম প্লেনারি কনভেনশনে ঘোষিত হলো, এর পাঁচটি দায়বদ্ধতার মধ্যে একটি হলো 'গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র'। এর সঙ্গে ছিল 'যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা' আর মূল্য-ভিত্তিক রাজনীতি। এই আলাপ আলোচনায় হিন্দুত্বের কোনো হদিস ছিল না। ১৯৮৫ সালে বিজেপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ 'গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র' পরিত্যাগ করল। জাতীয় কাউন্সিল এটিকে পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়ে আনল বটে, তবে জনসঙ্ঘের সভাপতি দীন দয়াল উপাধ্যায়ের 'অখণ্ড মানবতাবাদ'-কে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। এমনকী বাবরি মসজিদ বিষয়ে ১১ই জুন, ১৯৮৯ তারিখে পালমপুর সিদ্ধান্তে হিন্দুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়নি। সোমনাথ মন্দির থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা শুরু করার ঠিক আগের দিন ১৯৯০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আদবানি বললেন : 'মতাদর্শগতভাবে এই বিশেষ বিষয়টির কারণে সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান। এ প্রসঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক দলের ভাবনা একই।' বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হলো। বিষয়টি রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত নয়। এটা ছিল 'হিন্দুত্বের সপক্ষে, ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার বিপক্ষে একটা ধর্মযুদ্ধ।' উদ্দেশ্য, ১৮৮৫ সালের জন্মলগ্ন থেকে কংগ্রেসের মতাদর্শের চূড়ান্ত যে রূপ সেই গান্ধী-নেহরু তত্ত্বটিকে ভেঙে ফেলা এবং একটা বিকল্প তত্ত্ব উদ্ভাবন করা।

এমনকী ১৯৮৯ কিংবা ১৯৯১, বিজেপি-র কোনো বছরের নির্বাচনী ইস্তাহারেই হিন্দুত্বের উল্লেখ নেই। এটি প্রথম এল ১৯৯৬ সালে এবং তারপর আবার ১৯৯৮-তে। আর এর উদ্ভাবক সাভারকারের গুণকীর্তন করা হলো এই সেদিন ২০০২ সালে। শেষপর্যন্ত আজ সাভারকার যখন সামনের সারিতে এসে গেছেন, তখন কি আর তাঁর সঙ্গী গান্ধী হত্যাকারী নাথুরাম গডসে পিছনে পড়ে থাকতে পারেন? সঙ্ঘ পরিবার তাঁর গুণকীর্তন করবে কবে? হিন্দু রাষ্ট্রই বা কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? যতটা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে, বিষয়টা কিন্তু আসলে সেরকম নয়। 'দি হিন্দু'-র সংবাদে প্রকাশিত যে, 'ব্রিটেনের সঙ্ঘপরিবার আজ "গডসের দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের প্রচার এবং প্রতিটি দেশ বিরোধী মোল্লা-কমিডকে-এর (মুসলমান এবং কমিউনিস্টের প্রতি ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত) চ্যালেঞ্জ জানানো এই দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করলেন।'[১৫] হিন্দুত্বের একজন পোড়খাওয়া সক্রিয় কর্মী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রী এল কে আদবানির ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিপিন প্যাটেল পরিবারের সদস্যদের ই-মেলে এই মর্মে সতর্ক করেছেন, 'প্রতিশোধ নেবার জন্য রক্তের প্রতিটি বিন্দুর প্রয়োজন হবে আর তার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত।' আরো বলা হয়েছে, 'গান্ধীজীর অনেক গুণ আমরা দেখেছি, কিন্তু সমস্ত ভগবৎতত্ত্ব সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রাণিত করার পর সেসব গুণাগুণ বাসি হয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত না আমাদের লক্ষ্যপূরণ হয় ততদিন আমরা গডসের চিন্তাভাবনা আর তাঁর কাজকর্ম প্রচার করে যাবো। এর মধ্যে যদি আর একজন গান্ধী আমাদের পথে

বাধা সৃষ্টি করতে আসে, তখন দরকার পড়লে সেই গান্ধীকেও আমরা আমাদের পথ থেকে সরিয়ে দেব।' একটি 'আলোচনার টেবিলে' এই ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করল। গান্ধীজীর প্রসঙ্গে সঙ্ঘ পরিবার সবসময়েই দ্বিচারিতায় ভোগে এবং প্রকাশ্যে গডসের নিন্দা করলে তারা অস্বস্তিতে পড়ে যায়। পাপের নিন্দা করা হচ্ছে কিন্তু ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে পাপীরা। বিজেপি-র তদানীন্তন সহ-সভাপতি রাম জেঠমালানি ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮১ কোচিনে বললেন যে, গডসে এবং গান্ধী 'অবিভক্ত' ভারত প্রসঙ্গে একই রাজনৈতিক দর্শনের অংশীদার ছিলেন।[১৬] প্রথম কথা হলো, গডসে আর গান্ধীর 'রাজনৈতিক দর্শন' পরস্পরের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র ছিল। জেঠমালানি যদি কেবলমাত্র 'অখণ্ড ভারত' বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাসের কথাটি (তাঁদের সমগ্র রাজনৈতিক দর্শনের অংশীদারিত্বের কথা নয়) বোঝাতে চেয়ে থাকেন তবে নিশ্চিতরূপেই আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ভাবনার অংশীদার ছিলেন। এর মধ্যে থেকে গডসেকে আলাদা করা কেন? উত্তরটা খুবই সোজা তার অপরাধের গুরুত্ব কমানো এবং অবশ্যই পক্ষপাতিত্বের আলোয় তাকে উদ্ভাসিত করা।[১৭] অন্যেরা একটু কম অকপট। ন'বছর আগে আর এস এস-এর মুখপত্র 'অর্গানাইজার' এরকম মর্মস্পর্শী শব্দে গডসেকে স্মরণ করেছিল : নেহরুর পাকিস্তান-পক্ষাবলম্বী অবস্থানের সমর্থনে গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন আর এই কাজের জন্যই জনতার প্রচণ্ড ক্রোধ তাঁর দিকে ঘুরে গেল।[১৮] কাজেই গডসে 'জনতার' প্রতিনিধি আর তার সংগঠিত হত্যাকাণ্ড ছিল 'জনতার রোষের' বহিঃপ্রকাশ। ১৯৬১ সালে দীন দয়াল উপাধ্যায় বললেন, 'গান্ধীজীর প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েও আসুন আমরা তাঁকে জাতির পিতা নামে ডাকা বন্ধ করি। আমরা যদি জাতীয়তাবাদের প্রাচীন ভিত্তিটি বুঝতে পারি তবে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সে ভিত্তিটি অবশ্যই হিন্দুধর্ম।'[১৯]

বিজেপি যেখানে কৌশলে সত্যের অপলাপ করছে, সেখানে তার সঙ্গী শিবসেনার সর্বেসর্বা বাল থ্যাকারে চরিত্রগতভাবে স্থূল এবং অপরিণত। ১৬মে, ১৯৯১ তিনি পুনেতে বললেন : 'আমরা নাথুরামের জন্য গর্বিত। তিনি দ্বিতীয় দেশভাগ থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন।' এর সঙ্গে তিনি যোগ করলেন, 'নাথুরাম একজন ভাড়াটে খুনী ছিলেন না। দেশের প্রতি মহাত্মা গান্ধীজীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি অত্যন্ত সততায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।' যে কোনো মানুষকে হত্যা করা 'খুব অন্যায় কাজ এবং একে নিন্দা করাই উচিত।' কিন্তু 'এইরকম ঘটনার পিছনে যে কারণগুলি আছে সেগুলি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। একমাত্র হিন্দুত্বের নীতিই আরো অধোবনতির হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারে।'[২০] একটা নির্বাচনী জনসভায় এই কথা বলা হলো। তখনো পর্যন্ত বিজেপি-র সঙ্গে শিবসেনার নির্বাচনী জোট রয়েছে। চারদিন পরে মুম্বাইতে বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ মহাজনকে এই প্রসঙ্গে তাঁর দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বলা হলো। তিনি এই উচ্চারিত বক্তব্যের 'নিন্দা করতে স্বীকৃত হলেন।' তাঁর দল 'থ্যাকারের বক্তব্যকে নিন্দাও করে না, সমর্থনও করে না। হিংসা সর্বদাই অন্যায্য।'[২১] একইরকমভাবে আদবানি এই হত্যাকে 'জঘন্য পাপ' বলে উল্লেখ করলেন কিন্তু থ্যাকারের মন্তব্যটির বিরোধিতা করলেন না।[২২] বিস্মিত হবার কিছু নেই : থ্যাকারে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন

যে, বিজেপি যদি এই মন্তব্য অনুমোদন না করে তবে তিনি জোট ভেঙে দেবেন। টাইমস অফ ইন্ডিয়া সন্তুষ্ট হলো না। 'যেহেতু বিজেপির নির্বাচনী মঞ্চ থেকে থ্যাকারের এই বিবৃতি করা হয়েছে সেকারণে এই মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে বিজেপি-র আরো অনেকটা দূর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।'[২৩] বিজেপি-র বিভ্রান্তিকর দ্ব্যর্থক শব্দপ্রয়োগে পত্রিকাটির বিস্মিত হবার প্রয়োজন নেই। দু'বছর আগে ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল : "শ্রী আদবানি যখন 'ভারতমাতা'-কে সামনে তুলে ধরছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি জাতির পিতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে অস্বীকার করার পথেও অনেকটাই এগিয়ে গেছেন।"[২৪]

সাভারকারের রাজনৈতিক জীবন

গান্ধীজীর প্রকৃত বীর্যবান ব্যক্তিত্ব কোনোদিনই বিজেপি এবং আর এস এস নেতৃত্বের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা আদায় করতে পারেনি। সাভারকার পেরেছেন। তাঁর কোনো কাজটি এমন বীরজনোচিত যে সে সম্পর্কে তাঁর সমর্থকদের যা দাবি তাই একেবারে পুরোপুরি গ্রহণ করতে হবে? অত্যুচ্চ জাতীয়তাবোধ? মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি? অক্ষয় আত্মত্যাগ? সাহস? উচ্চ মাত্রার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা? চারিত্রিক মহত্ত্ব? তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের কোনো পর্বে এর একটিও প্রতিফলিত হয়নি। এমনকী, লন্ডনে, তাঁর জীবনের জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক পর্বের যে নথিবদ্ধ হিসাব সে বিশাল বিশাল ভুলে ভরা। সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে তাঁর নামাঙ্কিত একটি পার্ক উদ্বোধন এবং সেখানে তাঁর মূর্তি উন্মোচনের সময় আদবানি দাবি করলেন যে, তিনি ছিলেন এক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিপ্লবী যাঁকে তাঁর বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য আন্দামানে নির্বাসিত হতে হয়েছিল।[২৫] সোজা কথায় এটি সত্য নয়। একটি পাশবিক এবং উদ্দেশ্যহীন হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার জন্য শাস্তিস্বরূপ তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল। অন্য যে হত্যাকাণ্ডে তাঁর প্ররোচনা ছিল, সেটির ক্ষেত্রে অল্পের জন্য তিনি শাস্তি এড়াতে পেরেছিলেন। দু'টির কোনো ক্ষেত্রেই তিনি বন্দুক ধরেননি। যেসব হত্যা মামলায় তিনি যুক্ত ছিলেন তার কোনোটির ক্ষেত্রেই কখনো তিনি সেকাজ করেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি হত্যাকারীকে চালনা করেছিলেন বটে, কিন্তু সুনিপুণ কৌশলে নিজের পদচিহ্ন গোপন রেখেছিলেন। অন্য সব বিপ্লবী যারা প্রয়োজনে বন্দুক তুলে ধরতে কখনো ভয় পায় না, তাদের সঙ্গে তাঁর বিস্তর ফারাক।

সাভারকারের একটি সঠিক এবং নির্দিষ্ট জীবনী শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ধনঞ্জয় কীর-এর ইংরাজিতে লিখিত জীবনীটি আদর্শ মানের। এটি প্রায়শই সাধুজীবনীতে পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে সাভারকার মারা যান। বছর ঘোরবার আগেই, 'বীর সাভারকার' এই নতুন শিরোনামে ধনঞ্জয় কীর বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।[২৬] দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে কীর লিখেছেন, 'গবেষণায় নতুন মূল্যবান যেসব খবরাখবর আর নতুন তথ্য আমি পেয়েছি এবং সাভারকার নিজে অনুগ্রহ করে তাঁর কয়েকটি সদয় সাক্ষাৎকারে যেসব অসংখ্য নতুন বিষয় আমাদের জানিয়েছেন, তাদের সবকটিই ঐতিহাসিক কালপর্যায়ক্রমে তাদের সঠিক স্থানে যুক্ত হয়েছে।' তাঁর

মৃত্যুর পরেই এগুলো প্রকাশিত হবে এমন শর্ত কেন দিলেন সাভারকার, ভাবলে অবাক লাগে। দু'টি সংস্করণের মধ্যে এই যে ষোল বছরের ব্যবধান, তার প্রকৃত কারণ কেবল অনুমানের ভরসায় নির্ণয় করা অসাধ্য। এই নতুনভাবে যুক্ত যে অংশগুলি তাদের বেশিরভাগের মধ্যে এটাই অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয়। যেমন, ১৯০৯ সালে মদনলাল ধিংড়ে কর্তৃক উইলিয়াম কার্জন উইলি হত্যা এবং এরই সঙ্গে ১৯৩১ সালে ভি জি গোগেট-এর হত্যা প্রচেষ্টায় সাভারকারের সহযোগিতার উল্লেখ আছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য কীর বাদ দেন। অবশ্য সাভারকার যে 'ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন না' সেকথা কীর প্রথম সংস্করণে উল্লেখ করেননি। বেশ কৌতূহলজনক। কীর এটা ১৯৫০ সালের পর আবিষ্কার করেছেন এ কথা মানা যায় না। স্পষ্টত, সাভারকারের গোঁড়া হিন্দু অনুগামীদের অসন্তোষের ভয়ে এই তথ্যটি গোপন করা হয়েছিল। তথ্যের এই গোপনীয়তায় গ্রন্থের জীবনীকার এবং তার বিষয়ী উভয়েরই দৈন্য প্রতিফলিত হয়। তবে গান্ধী হত্যা-ষড়যন্ত্রে আদালতে অভিযুক্ত হবার দায় থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে একেবারে শপথ নিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন এই মর্মে সাভারকারের প্রস্তাবটি যে কীর দু'টি সংস্করণেই গোপন করে গেলেন, সেটিই সবচেয়ে ক্ষতিকারক। এই সবকটি বিষয়েই পরে আমরা বিশদে দৃষ্টিপাত করব, এই মুহূর্তে সাভারকারের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশের সন্ধান করা যাক। মহারাষ্ট্রের নাসিকের নিকটে ভাগুর গ্রামে ২৮শে মে, ১৮৮৩ সাভারকারের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন চিৎপবন ব্রাহ্মণ। তাঁর যখন দশ বছর বয়স, তখন সংযুক্ত প্রদেশে এবং মুম্বাই-তে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা তিনি শোনেন। কীর লিপিবদ্ধ করেছেন :

> সেইসময় সংযুক্ত প্রদেশ ও মুম্বাই-তে হিন্দুদের ওপর সংগঠিত স্বৈরাচার তাঁর রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তিনি সহধর্মাবলম্বীদের এই যন্ত্রণা ও মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত নেন। বালক সাভারকার তাঁর সহপাঠীদের একটি নির্বাচিত দলকে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের গ্রামের মসজিদের দিকে নিয়ে যান। বালক বাহিনী মসজিদের ওপর পাথর বৃষ্টি করে, তার জানলা আর টালি ভেঙে দেয়, তারপর বিজয়গর্বে ফিরে আসে। যে বীরোচিত উপাদানে বিনায়ক গড়া, এই ঘটনা তারই প্রথম ইংগিতবাহী এবং তাঁর ভবিষ্যত নিঃশঙ্ক জীবন ও নেতৃত্বের চাবিকাঠি।[২৭]

তাঁর দু'টি ভাই। দাদা গণেশ ওরফে বাবারাও, আর ছোট ভাই নারায়ণ। কলেজে পড়ার সময় তিনি মিত্র মেলা নামের একটি গোপন সমিতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। পরে এই সমিতির নতুন নাম দেওয়া হয় অভিনব ভারত। লন্ডনের ওকালতি পরীক্ষার জন্য পড়াশুনো করতে বিনায়ক লন্ডন গেলেন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মতো, তিনি বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ এবং ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এলেন। ১৯০৯ সালের ২৪শে অক্টোবর সাভারকার দশেরা সম্মিলনে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তার সভাপতিত্ব করেছিলেন গান্ধীজী। তিনি বলেছিলেন, হিন্দুরা

হলো ভারতবর্ষের হৃদয়... তথাপি, বিচিত্র বর্ণের ছটায় যেমন রামধনুর সৌন্দর্য খর্ব হয় না, বরং বর্ধিত হয়, ঠিক তেমনি ভবিষ্যতের মহাকাশে হিন্দুস্থানও মুসলমান, পার্শি, ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটুকু আত্তীকরণ করে আরো সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হবে।'[২৮]

দু'টি হত্যার কাহিনী

ইতিমধ্যে ভারতে, অভিনব ভারতের শাখাগুলি খুঁজে বের করা হয়েছে। বাবারাও-এর গ্রেপ্তারের পর কয়েকটি ছোট ছোট বোমার কারখানা আর গোপন ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার চক্রান্তে সহযোগিতার অপরাধে ১৯০৯ সালের ৮ই জুন বাবারাও-এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ভারতে সন্ত্রাসবাদ ১৯১৭-১৯৩৬ এই শিরোনামে দিল্লিস্থ গোয়েন্দা দপ্তরের সংকলিত প্রতিবেদনে যা নথিবদ্ধ করা আছে সেটি এরকম, 'এর অল্প কয়েকদিন পরেই তার ভাই বিনায়ক সাভারকার লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউসে অত্যন্ত রাজদ্রোহসূচক বক্তৃতা দেন। ভারত দপ্তরের রাজনৈতিক এ.ডি.সি স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলি হত্যার বারো দিনের মধ্যে এই ভাষণ দেওয়া হয়। এই একই বছর ডিসেম্বরে নাসিকের জেলাশাসক (এম.টি.জ্যাকসন) যিনি গণেশ সাভারকারকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং ষড়যন্ত্র মামলায় পরবর্তী পর্যায়ে সাতাশজনের জেল হয়।'[২৯]

এই দু'টি হত্যা আরো একটু বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা যে 'বিপ্লবী' কর্মকাণ্ডের জন্য সাভারকারকে সেলুলার জেলে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল, এই দু'টি ঘটনাকে তারই ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এম আর জয়কর বিশের দশকে হিন্দু সংগঠন আন্দোলন এবং হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২, এর সভাপতিত্ব করেছেন বিনায়ক সাভারকার। বাবারাও এবং বি বি ভোপাটকরের বিচার প্রসঙ্গে জয়কর তাঁর স্মৃতিচারণায় যে কথাটি বলতে বাধ্য হলেন তা হলো এই :

> এই দু'টি মামলাতেই অভিযুক্তদের আচার-আচরণের একটা প্রবল অননুমোদনের অনুভব ছিল আদালত কক্ষে। আর আমিও সম্পূর্ণরূপে তার অংশীদার ছিলাম। তিলক এবং পরাঞ্জপের আগের দু'টি মামলায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য যে মর্যাদা, যে নির্ভীকতা, যে সততায় উন্নীত হয়েছিল, পরবর্তী দু'টি মামলার অভিযুক্তদের আচরণে তা যেন অপরিমেয়তায় খর্ব হলো।[৩০]

লন্ডনে ১৯০৯ সালে পয়লা জুলাই-এর রাতে উইলিয়াম কার্জন উইলি মদনলাল ধিংড়ার ছোঁড়া গুলির শিকার হলেন। তাঁর সঙ্গে ড. কাওয়াস লালকাকা যিনি তাঁর জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও মারা যান। লন্ডনের ইমপেরিয়াল ইনস্টিটিউট সভাকক্ষে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার পরিসমাপ্তিতে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। কীর-এর বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(মদনলাল) ছিলেন সাভারকারের নিবেদিত প্রাণ অনুগামী... উইলির ঘটনার অল্প কয়েকদিন আগে ধিংড়া তাঁর নেতাকে জিজ্ঞাসা করেন শহীদের মৃত্যু বরণ করার সময় সত্যিই এসেছে কিনা। প্রত্যুত্তরে সাভারকারের নিকট থেকে তীব্র ব্যঞ্জনাময় উত্তর এল, কোনো শহীদ যদি নিজে সাধারণভাবে এই সত্যে উপনীত হয় স্থির প্রতিজ্ঞায় এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকে তবে তখনই শহীদের মৃত্যুবরণ করার সঠিক সময় অবশ্যই এসে যায়... ধিংড়ার তখনকার শিকার ছিলেন লর্ড কার্জন (ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয়)।[৩১]

কপালজোরে তিনি বেঁচে গেলেন। পরবর্তী শিকার ছিল উইলি।

সাভারকারের জীবদ্দশায় তাঁর বইটি প্রকাশকালে কীর যে কথা অব্যক্ত রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর রবার্ট পেইনকে বিশ্বাস করে সেই গুপ্ত কথা তাঁকে বলেন :

১৯০৯ সালে তিনি (সাভারকার) দেখালেন যে, উইলিকে হত্যার জন্য একজন তরুণ ভারতীয়কে হুকুম করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। তাঁর জীবনীকার ধনঞ্জয় কীর-এর কাছে,... এই হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তিনি দাবি করেছিলেন। 'এইবার না পারলে আমাকে তোমার মুখ দেখিও না।' সংক্ষেপে এই কথা বলে তিনি মদনলাল ধিংড়াকে একটি নিকেল করা রিভলবার দিয়েছিলেন। অন্ধের মতো তাঁর অনুগত ছিলেন ধিংড়া। তিনি একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো কাজ করেছিলেন। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার বেদিতে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করছেন। বিচার চলাকালীন প্রতিনিয়ত সাভারকার তাঁকে এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে, তিনি এমন একজন শহীদ, যাঁকে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ স্মরণ করবে। এই অপরাধের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে লন্ডন পুলিস সাভারকারকে পুরোপুরি সন্দেহ করেছিল, কিন্তু তাঁকে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না তাদের হাতে। শেষ পর্যন্ত নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীযুক্ত জ্যাকসনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় এবং এই অপরাধে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া হয়।

লাল কেল্লার বিচারে (১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যা মামলা) এই পূর্ববর্তী হত্যার স্মৃতি অশরীরী ছায়ার মতো বাতাসে ভেসে বেড়াতো, যদিও কখনোই আদালতে সেকথা উল্লেখিত হয়নি। দর্শকাসনে উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণতম দর্শক ছাড়া সবাই সেকথা বিস্মৃত হয়েছিল। সাভারকার তখন যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছেন আর এতদিন আগে তাঁর অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল যে, কেবলমাত্র বহু পুরাতন সংবাদপত্রের ছেঁড়াখোঁড়া পাতায় তাদের সন্ধান মিলত। স্যার কার্জন উইলি এবং শ্রীযুক্ত জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন, যদিও অস্ত্র ব্যবহার করেছিল অন্য কেউ। গডসে আর আপ্তের সঙ্গে তিনি যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং আইনের বিচারে গান্ধীহত্যার জন্য যে তিনিই দায়ী, এ ব্যাপারে বিচারকগণ নিশ্চিত ছিলেন।[৩২]

পরবর্তীকালে কীর-এর সুস্পষ্ট প্রকাশে পেইন-এর মন্তব্যটি ব্যাখ্যাত হয় :

> মদনলাল ধিংড়ার সম্পূর্ণ কাহিনী জানাজানি হতে অনেক বছর কেটে গেল, তিনি (ধিংড়া) নির্দোষ এই মর্মে গান্ধীর বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্য নিহিত ছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে সাভারকারের বশীভূত ছিলেন এবং কী করতে চলেছেন সে ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না বললেই চলে। কয়েকমাস ধরে সাভারকার তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং ভারতের কারণে শহীদ হবার এই বিশেষ দিনটির জন্য তাঁকে তৈরি করেছিলেন। তারপর, প্রথমবার অসফল হবার জন্য (লর্ড কার্জনকে হত্যা করা) ধিংড়া সাভারকারের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল। এরকম একটা সুবর্ণসুযোগ হারাবার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত ধিংড়াকে বিদ্রূপে জর্জরিত করতেন। স্যার কার্জন উইলি হত্যার দিন সকালে সাভারকার ধিংড়াকে একটি নিকেলকরা রিভলভার দিলেন এবং বললেন, 'এবারে যদি না পার তবে তোমার ও মুখ আর আমাকে দেখিও না।'[৩৩]

অবশ্য ১৯৫০ সালে সাভারকারের জীবদ্দশায় তাঁর জীবনীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে কীর এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেননি। সাভারকারের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার সময় কেবল তিনি তা করেছিলেন।[৩৪] গ্রেপ্তারের সময় ধিংড়ার কাছে তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী একটি লিখিত বিবৃতি পাওয়া গিয়েছিল। এটি লিখে দিয়েছিলেন সাভারকার।

উইলি হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই ষড়যন্ত্রের সহযোগী হিসেবে সাভারকারের বিরুদ্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। সেই বছরের শেষের দিকে, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০৯ নাসিক জেলার কালেক্টর এবং জেলা প্রশাসক এ এম টি জ্যাকসন একটা থিয়েটারে নিহত হলেন। হত্যাকারী অনন্ত কানহিয়ার গ্রেপ্তার হলো। কীর-এর মতে গণপত সাভারকারের 'সাংঘাতিক দ্বীপান্তরের এইভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হলো'। অবশ্য জ্যাকসন গণপত সাভারকারের বিচার করেননি। সেশন কোর্টে বিচারের জন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন মাত্র। এই হত্যা বিষয়ে বিশেষ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। জয়কর মন্তব্য করলেন :

> কালেক্টর জ্যাকসন ছিলেন একজন যশস্বী সংস্কৃত পণ্ডিত এবং তিনি ভারতীয়দের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাদের ভাষা এবং সাহিত্যের কদর করতেন তিনি। অনাত্মীয়তার বাতাবরণ থেকে নাসিক শহরকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল এমন অভিযোগ করা হয়। একজন বন্ধুভাবাপন্ন অফিসার হিসেবে জ্যাকসনের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। আর তাঁর সাহিত্যিক কাজকর্ম প্রধানত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে নানান প্রবন্ধ রচনা এবং বক্তৃতা দেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৩৫]

কানহিয়ার যখন তাঁকে গুলি করেন, তখন একটি জনপ্রিয় মারাঠী থিয়েটার দেখতে তিনি থিয়েটারে গিয়ে ছিলেন। কানহিয়ার অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি সামরিক কাজে যোগ দেবার জন্য আগ্রহীও ছিলেন। তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর শাস্তি আর মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের চূড়ান্ত ও ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তি ঘটল। আরো

একটি অধিক সম্ভাবনাময় জীবন অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে গ্রেপ্তার হলো এবং এই সমস্ত ঘটনার প্রবাহে সর্বনাশা পথে ভ্রষ্ট হলো।

সাভারকারের চিরন্তনী

সাভারকার তাঁর বই 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭'-এর জন্য ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে কয়েক মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করলেন। ১৯০৮ সালে সাভারকারের বয়স যখন প্রায় চব্বিশ বছর, তখন মূল বইটি মারাঠী ভাষায় লেখা হয়। গুণমুগ্ধ বন্ধুরা, যারা উকিল হবার জন্য কিংবা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য পড়াশুনা করছিলেন, তাঁরা সকলেই ইংরেজী অনুবাদটির বিষয়ে পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯০৯ সালে লন্ডনে এটি প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই এটি বে-আইনি বলে ঘোষিত হয়। ১৯৪৬ সালে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ইংরেজি অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে মুম্বাই-তে।[৩৬] গোপনে প্রচারিত 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর নিষিদ্ধ কপি সেই ব্রিটিশ যুগে যেসব ভারতীয়রা পড়েছিলেন তাঁদেরই মতো এই বইটির সবকটি পাতা ভারতের আজকের মানুষদের এখনো আবেগে বিহ্বল করে দিতে পারে। সত্যিই এ এক অত্যুৎকৃষ্ট রচনা।

সাভারকারের পরবর্তী জীবনচর্যার কারণে কখনই এমন অন্ধ হওয়া উচিত নয় যাতে তাঁর এই বিশিষ্ট অবদানে তিনি হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে যে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন তার মূল্যকে খাটো করে দেখতে হবে। অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্যে লিখিত এই ইতিহাস। অবশ্য এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভারতের অতীত সম্পর্কে যে অস্পষ্ট ধারণা এবং তার চেয়েও খারাপ, প্রতিশোধের যে উন্মাদনা এবং হিংস্রতার আবেগ প্রতিফলিত তাতে একজন মনোযোগী পাঠক বিরক্ত না হয়ে পারেন না। সাভারকার পরে যা করেছিলেন, সেই পথ তিনি কেন নিয়েছিলেন এতেই তার ব্যাখ্যা মেলে।[৩৭] কিন্তু জ্যাকসন আর উইলি হত্যায় জড়িয়ে না পড়লে তিনি হয়তো এমন পথে পা বাড়াতেন না।

জ্যাকসনের হত্যাকারী অনন্ত কানহিয়ারের সঙ্গে বাকি ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাদের কাছে সাভারকারের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি ছিল এবং কানহিয়ারের ব্যবহৃত ব্রাউনিং পিস্তল সাভারকারের বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তদনুযায়ী, বৃহৎ মুম্বাই প্রেসিডেন্সির সরকার Fugitive offenders Act, 1881 এই ধারায় সাভারকারের নামে টেলিগ্রাফ মারফৎ একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছিল। তখন তিনি প্যারিসে ছিলেন, কিন্তু পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। ১৩ই মার্চ, ১৯১০ লন্ডনে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে তিনি গ্রেপ্তার হন। ভারতসম্রাট মহামান্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা কিংবা পরিচালনায় সাহায্য করা, ব্রিটিশ ভারত কিংবা তার একটি অংশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব থেকে রাজাকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা, অস্ত্র মজুত এবং বন্টন করা ও জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করা, লন্ডনে অস্ত্র মজুত বন্টন করা এবং লন্ডন থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা, ১৯০৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ ভারতে

এবং ১৯০৮ থেকে ১৯০৯ লন্ডনে রাজদ্রোহসূচক ভাষণ দেওয়া— তাঁর বিরুদ্ধে এই ছিল অভিযোগ।

এস এস মোরিয়া জাহাজটি যখন মার্সাই বন্দরে নোঙর করেছিল, তখন ৮ই জুলাই, ১৯১০ তার পোর্টহোল দিয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের জমিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা— একজন বিপ্লবী হিসেবে তাঁর যশোলাভের রোমান্টিক বিভা এই ঘটনার কাছে ঋণী। ১৯১০ সালের ২২শে জুলাই তাঁকে মুম্বাই-তে আনা হলো এবং একটি বিশেষ ট্রাইবুনালের সামনে তাঁর বিচার শুরু হলো। ট্রাইবুনালে ছিলেন বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বাসিল স্কট, জাস্টিস স্যার এন জি চন্দভারকর এবং জাস্টিস স্যার জন হিটন। প্রবল প্রতাপান্বিত বিবাদী পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন জোসেফ বাপ্টিস্তা। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১০ থেকে তিনটি মামলার বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল বসানো হয়েছিল। প্রথমটিতে সাভারকারকে হিসেবে ধরলে আটত্রিশ জন অভিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় মামলাটিতে সাভারকার এবং প্রথম মামলার একজন সহ-অভিযুক্ত গোপালরাও পতঙ্কারকে জড়ানো হয়েছিল। শেষটিতে সাভারকারই ছিলেন একমাত্র অভিযুক্ত। পতঙ্কারকে ভারতে তাঁর সহযোগীদের কাছে কুড়িটি ব্রাউনিং পিস্তল সাভারকার পাঠিয়েছিলেন এই অভিযোগ করা হয়েছিলো।[৩৮]

ঊনসত্তর দিন ধরে শুনানী চলেছিল। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে প্রথম মামলায় সাভারকারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। জ্যাকসন হত্যাকাণ্ডে সহায়তা সংক্রান্ত দ্বিতীয় মামলাটি শুরু হয়েছিল ২৩শে জানুয়ারি, ১৯১১। এক সপ্তাহ পরে, আরেকবারের জন্য তাঁকে যাবজ্জীবন অর্থে ৫০ বছরের জন্য আন্দামানে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে সেভাবেই যাতে দু'টি দণ্ড এককালীন লাগু হয় এই মর্মে সাভারকারের অত্যন্ত যুক্তিসংগত আবেদন সরকার প্রত্যাখ্যান করে।[৩৯]

বোম্বে হাইকোর্টের একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক পি বি ভাদ্‌হা-র কাছ থেকে আমরা আরো অনেক বেশি বিষয়মুখী বিবরণ পাই।[৪০] জয়করের মতো ভাদ্‌হা-ও জ্যাকসনের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। 'তিনি ভারতীয়দের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।' তিনি আরও বলেন : সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এটা পরিষ্কার যে সাভারকার (তাঁর দু'ভাই-এর সঙ্গে একত্রে) ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল কেন্দ্র, নেতা এবং গতিময় উদ্দীপনা।'

ক্ষমাভিক্ষা এবং ক্ষমাভিক্ষা

আন্দামানের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে ১৯১১ সালের ৪ঠা জুলাই সাভারকারকে আনা হলো। কিন্তু বছর কাটতে না কাটতেই তিনি 'ক্ষমার জন্য আবেদনপত্র' জমা দিলেন। এটি পাওয়া যায়নি। ১৯১৩ সালের ১৪ই নভেম্বরের আরেকটি আবেদনপত্রে এটির উল্লেখ রয়েছে। গভর্নর জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের হোমমেম্বার রেগিনাল্ড ক্রাডকের উদ্দেশ্যে লিখিত ১৯১৩ সালের এই আবেদনপত্রটি 'মহামান্য' সম্বোধনে তাঁকে '১৯১১

সালে ক্ষমার জন্য আমি যে আবেদনপত্রটি পাঠিয়েছিলাম' সেটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল এবং শপথ করেছিল যে,

> সরকার যেমনভাবে চাইবেন ঠিক সেই শক্তিতে তাদের হয়ে কাজ করবো। যেহেতু এ আমার বিবেকের উচ্চারণ সেকারণে আমার ভবিষ্যৎ আচরণও তেমনি হবে এ আশা রাখি। আমাকে জেলে রাখলে আমার কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। সে তুলনায় অন্য ক্ষেত্রে হয়ত কিছু হতে পারে। পরমশক্তিধরের পক্ষেই সদয়তার মহত্ব দেখানো সম্ভব। কাজেই অনুতপ্ত পুত্র তার পিতৃমাতৃসদৃশ সরকারের দরজা ছাড়া আর কোথায় ফিরে আসতে পারে।

ক্ষমার জন্য কোনো ভিক্ষা, কোনো আবেদন, এর চেয়ে বেশি নীচ, বেশি হীন হতে পারে না। কোনোরকম প্রশংসা বা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতা যে সাভারকারের নেই, এই একটা প্রমাণই তার জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁর আচার-আচরণের গোটা ভঙ্গিমার একটা অংশ হিসাবে একে ধরলে দেখা যায়, একদিকে তিনি বন্দুক চালানোর জন্য নিশ্চিতভাবে অন্য কাউকে কাজে লাগাচ্ছেন এবং অত্যুৎসাহে যেকোনো নতুন পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, অন্যদিকে তাঁর দুষ্কর্মের পরিণতির হাত থেকে বাঁচবার জন্য যেকোনোভাবেই ক্ষমাভিক্ষা করছেন। এই দু'টি আবেদনপত্রের কথা ভারতের কোনো মানুষ জানল না। এমনকী তাঁর ভাই নারায়ণের কাছেও এটি গোপন রাখা হলো।

এরকম আরো দু'টি ঘটনার কথা এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। আন্দামান থেকে সাভারকারকে ফিরিয়ে আনা হলো, রাখা হলো রত্নগিরি জেলে। তারপর সেখান থেকে পুনের ইয়েরাভাড়া জেলে সরিয়ে নেওয়া হলো। কীর যেটিকে অত্যন্ত উৎসাহে সাভারকারের সপক্ষে প্রবাহিত 'অনুকূল বাতাস' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল যেকোনো মূল্যে মুক্তির প্রশ্নটি সুরক্ষিত করার জন্য তাঁর এবং তাঁর পরিবারের চরম উদ্যোগের পরিণতি। কীর লিপিবদ্ধ করেন :

> বোম্বের গভর্নর স্যার জর্জ লয়েড তাঁর কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে সাভারকারের সাক্ষাৎকার নিতে আসেন... সাভারকার এবং মহামান্য গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তারই উল্লাসে মুক্তির শর্তগুলি তৈরি করা হয়েছিল। কয়েকটি শব্দ অদলবদল করে সাভারকার শর্তগুলি মেনে নেন এবং সেই শর্তে স্বাক্ষর করেন। এরপর ৬ই জানুয়ারি, ১৯২৪ ইয়েরাভাড়া জেল থেকে শর্তসাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। শর্তগুলির পাঠ এইরকম :
>
> ১) সাভারকার রত্নগিরি জেলাতেই বাস করবেন এবং গভর্নরের অনুমতি ছাড়া কিংবা কোনো জরুরী অবস্থায় অন্তত জেলাশাসকের অনুমতি ছাড়া জেলার চৌহদ্দীর বাইরে যাবেন না।
>
> ২) সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে পাঁচবছর সময়সীমার মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্যভাবে কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থাকবেন না।

উক্ত শর্তের মেয়াদ শেষ হবার পরে সরকারের মর্জিমাফিক এই বিধিনিষেধ পুনরায় লাগু করা যেতে পারে।[৪২]

সাভারকারের লেখা এর চেয়েও হীন একটা দলিলের উল্লেখ কীর উহ্য রাখলেন। একটি সেমিনার-প্রবন্ধে কৃষাণ দুবে এবং ভেঙ্কিটেশ রামকৃষ্ণন লেখেন :

বিবেকের কোনো যন্ত্রণা ব্যতিরেকেই সাভারকার এই শর্তগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এটাই সব নয়। তাঁর সমস্ত উদ্দীপনা ভগ্ন, সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ দেখে সরকার প্রস্তাব দিল যে, তাঁর সঠিক বিচার হয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা দণ্ডাদেশ ন্যায্য এরকম একটা বিবৃতি তাঁর দেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে তাঁকে একথাও বলা হয়েছিল যে, এটি 'কোনোভাবেই তাঁর মুক্তির ব্যাপারে কোনো শর্ত সৃষ্টি করবে না।' তবুও তিনি এগিয়ে এলেন এবং এই বিবৃতি দিলেন। 'এতদ্বারা আমি স্বীকার করছি যে, আমার বিচার পক্ষপাতহীন এবং দণ্ডাদেশ ন্যায্য। বিগত দিনগুলিতে হিংসার যে পদ্ধতি আমি অবলম্বন করেছিলাম অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সেই পথ আমি ঘৃণায় পরিত্যাগ করছি। সর্বশক্তি দিয়ে আইন এবং সংবিধানের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার মহান কর্তব্যে আমার দায়বদ্ধতা আমি অনুভব করি। ভবিষ্যতে যখনই আমাকে সংস্কারের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে, অমনি আমি তাকে সফল করার জন্য সদা আগ্রহী থাকবো।'

১৯১৮ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড-এর প্রস্তাবনা, ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় দুঃখজনকভাবে যেটি প্রায় মুষ্টিভিক্ষারই শামিল, সংস্কার বলতে এখানে তারই উল্লেখ রয়েছে... তাকেই সফল করার জন্য সাভারকার তাঁর ক্ষুদ্র অস্তিত্ব উৎসর্গ করে পথে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর মুক্তিলাভের পরেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস)-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. কে বি হেডগেওয়ার রত্নগিরিতে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি সাভারকারের সহৃদয় আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছিলেন একথা বলা হয়। ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীর দিন সঙ্ঘের উদ্বোধন হলো।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সাভারকারের আত্মসমর্পণের কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (NWFP) কোহাট শহরে ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুরুতর সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝাট শুরু হলো। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহম্মদকে অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের মানুষ হিসেবে চিত্রিত করে কোহাটের জীবন দাস 'রঙ্গিলা রসুল' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। এরই কারণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাট ও অন্যান্য শহরে এবং তদানীন্তন পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। গোটা দেশে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে সাভারকার এতোই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন যে, পুনের 'মহারাষ্ট্র'-তে ১লা মার্চ, ১৯২৫ তিনি একটি নিবন্ধ লিখলেন।

সরকার বাহাদুর এটিকে সদয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হলো যে 'সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর মুক্তির প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনায় এরকম চরিত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নিবন্ধকে একটি যথেষ্ট যৌক্তিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হবে'। কোহাটের ঘটনা সম্পর্কে তাঁর বেশ দৃঢ় অভিমত থাকা সত্ত্বেও, পরবর্তীতে তড়িঘড়ি সাভারকার একটি সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা পাঠালেন। চিঠির শেষে তাঁর কাজের ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ দেওয়ায় তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানালেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁরা এরকম সদয় ব্যবহারেই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন এমন আশা প্রকাশ করলেন। 'স্বরাজ' এই ধারণাটির সঙ্গে তাঁর যে কোনোরকমের সংযোগ নেই সে কথাও তিনি ৬ই এপ্রিলের এই চিঠিতে বেশ পরিষ্কার করে দিলেন : 'তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে একটাই অংশ আছে যেখানে স্বরাজ শব্দটি এসেছে এবং সেখানেও এ কথা নিশ্চিত যে স্বরাজ প্রসঙ্গে আমি কিংবা অন্য লোকেরা কীভাবে তা দেখাবার জন্য বা সেকথা নির্দেশ করার জন্য মোটেই প্রসঙ্গটি আসেনি, বরং শ্রীযুক্ত গান্ধী খিলাফত সম্পর্কে যা ভাবেন তারই অতিরঞ্জিত অর্থে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।'

এতেও কিন্তু সরকারের মন ভিজল না। ১৯২৫ সালের ৬ই মে তাঁকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা হলো যে, তাঁর ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবার কোনো অবকাশই নেই। '... আপনার এ বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চিত হওয়া উচিত যে মহারাষ্ট্র-র ১লা মার্চ, ১৯২৪-এর সংখ্যাটিতে আপনি যা প্রকাশ করেছেন তাতে আবেগ প্রজ্জ্বলিত হবে বা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চাপা উত্তেজনা অবশ্যই বাড়বে এবং সরকারের সম্মতি ছাড়া কোনোভাবেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত না হবার যে জামিন আপনি দিয়েছিলেন, এটি তার পরিপন্থী।'

জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৮ই মে সাভারকার এই চিঠিটি পান। তিনি এমনি কাপুরুষ হয়ে পড়েছিলেন যে, একেবারে তার পরের দিনই গৃহ মন্ত্রণালয়ে বোম্বে সরকারের কার্যনির্বাহী ডেপুটি সেক্রেটারি, ডি উফ্লাইন কে এইভাবে তিনি লিখলেন : '... ৮ই মার্চ-এর আদেশটি আমার হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, ঐ দিনের আগে লেখা আমার সমস্ত রচনা এবং বক্তৃতাকে এই ব্যাখ্যার আওতায় ফেলা উচিত নয়, কেননা আমার মুক্তির শর্তাবলীর সম্পর্কিত অর্থে আমি স্বভাবতই যে প্রথম বা প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তারই দ্বারা সেগুলি পরিচালিত।' মার্চ মাস থেকে ৮ই মে-র মধ্যে তাঁর লেখা কয়েকটি নিবন্ধ এবং বক্তৃতার জন্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেন এই ভেবে সাভারকার অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। সরকারের পক্ষের একটা হুমকিতেই, হিন্দুদের তথাকথিত মঙ্গলের জন্য তাঁর উদ্বেগ একেবারে হাওয়ায় উবে গেল।[৩০]

তিনি এত বশংবদ, এমন আজ্ঞানুবর্তী হয়ে পড়লেন যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার কারণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির সারাংশ জেলা প্রশাসকের কাছে লিখে পাঠাতেন। কীর লিপিবদ্ধ করেছেন : তার রচনা, বক্তৃতায় 'স্বরাজ' বা 'রাজ'-এর মতো সামান্য শব্দগুলো ব্রিটিশ সরকারকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করেছিল এবং অনেকবার এর চরম পরিণতির উল্লেখে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।'[৪৪] কীর যখন এইসব কথা লিখছিলেন তখন কি একবারও তিনি হিসেব করে দেখেছেন যে, কোনো একদিন কোনো একজন গবেষক সাভারকারের ৬ই এপ্রিল, ১৯২৫ তারিখের চিঠিটির সন্ধান পেতে পারেন এবং 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহারের জন্য সাভারকার সত্যসত্যই যে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন তা দেখিয়ে দিতে পারেন!

ধর্মান্ধের অদৃশ্য হাত

বিধিনিষেধের এই পাঁচ বছরের সময়কাল ১৯২৯ সালে দু'বছর বাড়ানো হয় এবং তারপর আবার ১৯৩১, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৫ সালে। ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের যে আইনটি প্রকৃতপক্ষে ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ সালে লাগু হয়েছিল, সেখানে সমস্ত প্রদেশকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হয়েছিল। প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর অন্যান্য প্রদেশগুলির মতো বোম্বেতেও জনপ্রিয় কংগ্রেস মন্ত্রি-পরিষদ ক্ষমতায় আসবে, সর্বস্তরে এমন প্রত্যাশাই ছিল। কেননা কংগ্রেস আর ব্রিটিশের মধ্যে ভেতরে ভেতরে সমঝোতা ছিল। ইতিমধ্যে অন্তবর্তী মন্ত্রিপরিষদ বোম্বের অফিসে কার্যভার গ্রহণ করল। হিন্দু মহাসভার নেতা যমুনাদাস এম মেহতার সমর্থন নিয়ে সেই পরিষদে শামিল ছিলেন খান বাহাদুর ধ্যানজীশ' কুপার। তাঁরাই ১৯৩৭ সালের ১০ই মে সাভারকারকে মুক্ত করেন।

কিন্তু সেটাও আরেকটি হত্যা-প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়ার সন্দেহ ঘনীভূত হবার আগে নয়। ইন্টালিজেন্স বুরোর প্রতিবেদনে এটির বর্ণনা রয়েছে :

> বোম্বে প্রেসিডেন্সি এলাকায় যেসব সন্ত্রাসবাদী অপরাধ ঘটছিল তার অন্যতম কেন্দ্রগুলির মধ্যে পুনাও একটি কেন্দ্র ছিল। ১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই কার্যনির্বাহী গভর্নর স্যার আর্নেস্ট হটসন যখন এমনি অকারণেই পুনার ফার্গুসন কলেজ পরিদর্শন করছিলেন, তখন বাসুদেব বলবন্ত গোগেটে নামে এক ছাত্র অকস্মাৎ একটা রিভলবার বের করে তাঁর দিকে দু'টি গুলি ছোঁড়ে। মহামান্য মেয়রের পকেটে রাখা একটি নোটবুকের ধাতব প্রান্তে লেগে একটি ছিটকে যায় এবং দ্বিতীয়টি বাইরে দিয়ে চলে যায়। স্যার আর্নেস্ট আহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন। তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর (ADC) সহায়তার তাঁর হত্যার প্রচেষ্টাকারীকে ধরে ফেলেন। গোগেটের কাছে তাঁর দেহরক্ষী আর একটি রিভলবার খুঁজে পায়। ঘটনাকালে অন্যান্য ছাত্রদের আচার আচরণও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। পুলিস যখন গোগেটকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন 'শেম' 'শেম' ধ্বনি ওঠে। দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ থেকে আরো রিভলবার এবং অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। হত্যার কারণ হিসেবে

গোগেট গভর্নরের পদে একজন ভারতীয়ের পরিবর্তে স্যার আর্নেস্ট নিযুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর ঘৃণার কথা বলে। গোগেটকে আটবছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৪৫]

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সালে সংঘটিত গান্ধীহত্যার প্রসঙ্গে রবার্ট পেইনের তদন্তে এইসব তথ্যাদি পাওয়া যায় :

বোম্বের শহরতলীতে থানা রেলরোড স্টেশনের মালগুদামের এলাকায় ২৬শে জানুয়ারির রাতে নাথুরাম গডসে, আপতে আর কারকারে একটি গোপন সভা করেন। তাঁরা ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। গডসে বলছিলেন যে, পাহওয়া পুলিসের কাছে সব কথা বলে দেবে এই তাঁর ভয় আর হাতে সময়ও খুব অল্প। তাঁর মতে, ন-দশজন ষড়যন্ত্রকারীদের জড়িয়ে মূল যে পরিকল্পনা সেটি ভুল। যদি কোনো একজন মানুষ কাজটা করতে পারে তাহলেই ভালো। আর অনেকদিন থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে একাজটি যার করা উচিত সে মানুষটি তিনি নিজে। তিনি মদনলাল খিংড়া আর বাসুদেব রাও গোগেটের কথা বলেন, যাদের দুজনকেই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার আদেশ দিয়েছিলেন সাভারকার। মদনলাল খিংড়া লণ্ডনে গুলি করেছিলেন স্যার কার্জন উইলিকে। আর ১৯৩১ সালে বোম্বের গভর্নরকে গুলি করেছিলেন বাসুদেব রাও গোগেট। গর্ভনর বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে থাকার জন্য নিহত হননি, কিন্তু সেদিন থেকে চিরকালের জন্য হিন্দু মহাসভায় গোগেট উচ্চ মর্যাদাময় আসনে প্রতিষ্ঠিত।[৪৬]

কীর তাঁর বইটির ১৯৬৬ সালের সংস্করণে স্বীকার করেছেন যে, 'গোগেট ছিল গোঁড়া সাভারকারপন্থী এবং রগচটা হটসনকে গুলি করার কয়েক দিন আগে তিনি রত্নগিরিতে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।'[৪৭] এই কীর-ই কিন্তু প্রথম সংস্করণে এমন একটা ঘটনা বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন।

এবার, বোম্বের প্রেসিডেন্সির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯) কে.এম মুন্সি, একজন কংগ্রেস কর্মী হয়েও হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস-এর পক্ষে যাঁর সোচ্চার সহানুভূতি, তিনি গোগেট সম্পর্কে কী বলতে বাধ্য হয়েছিলেন সেটা পড়ে দেখা যাক :

অন্য যে ঘটনায় গর্ভনর অনিচ্ছায় আমার উপদেশ গ্রহণ করেন, সেটি বিনায়ক দামোদর সাভারকারের এক ভক্ত অল্পবয়সী এক কলেজ-ছাত্র ভি বি গোগেট-এর মুক্তি সম্পর্কিত।

বোম্বে সরকারের একজন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আর্নেস্ট হটসন যখন অস্থায়ী গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন পুনায় একটা কলেজ পরিদর্শনের সময় তাঁকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে ছেলেটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিল। লর্ড ব্রাবোর্ন আমার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'গভর্নরকে হত্যার প্রচেষ্টা একটি গুরুতর ব্যাপার।'

সেবার আমি এ বিষয়ে কোনো জোর খাটাইনি। অবশ্য এর অব্যবহিত

পরেই, স্যার আর্নেস্ট হটসন, ঘটনাচক্রে যিনি আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। গোগেট-এর মুক্তির প্রসঙ্গে সম্মত হয়ে, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে বললাম। সেই সঙ্গে বিশেষভাবে আভাস দিলাম যে, এরকম আচরণে নতুন মন্ত্রিসভার কিছু সুবিধা হতে পারে। কয়েকদিন পরে লর্ড ব্রাবোর্ন আমাকে ডেকে পাঠালেন। গোগেট-এর বিষয়ে সরাসরি হটসনকে চিঠি লেখায় তিনি আমার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। আমার পরামর্শ গ্রহণ করতে হটসনের কোনো আপত্তি নেই, এই মর্মে ভাইসরয়ের কাছ থেকে তিনি একটি বার্তা পেয়েছিলেন।[৪৮]

একজন মুসলিম বিদ্বেষী এবং সন্ত্রাসবাদীর জন্য মুন্সির এমন কোমর বেঁধে নেমে পড়া বেশ অভাবনীয়।

পুলিস এবং গোয়েন্দা দপ্তরের প্রতিবেদনগুলি যে ল্যারি কলিন্স এবং দোমিনিক লাপিয়ের-এর আয়ত্ত্বাধীন ছিল সেটা অত্যন্ত সুবিদিত এবং নিশ্চিত। সাভারকারের নানান সংযোগ, বিশেষ করে গান্ধী হত্যার ক্ষেত্রে তাঁর সংযোগের বিষয়টি তাঁরা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। তাঁদের দাবিতে তিনি 'পরবর্তীকালে (মুক্তির পরে) পাঞ্জাবের গভর্নরের হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করেন'— এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হলে বলা যায় যা কিছু প্রমাণপত্র পাওয়া গেছে তাতে জোরালো সমর্থন মেলে না— 'এবং বোম্বের গভর্নরের জীবনহানির একটি অসফল প্রয়াস চালান। কাজেই পেইল, কলিন্স এবং লাপিয়ের তিনজনেই গোগেট প্রসঙ্গে সাভারকারের মন্ত্রণাদানের বিষয়ে একমত। মুন্সি লিখেছেন যে তিনি সাভারকারের অনুগামী ছিলেন। কলিন্স এবং লাপিয়ের মন্তব্য করেন, 'অবশ্য আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সাভারকারকে ভালোই শিক্ষা দিয়েছিল। হত্যাকারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তিনি এমনভাবে গোপন রাখতেন যাতে পুলিস তাঁর বিরুদ্ধে কখনো মামলা সাজাতে পারেনি।'[৪৯] তাঁদের বর্ণনায় তিনি যেন 'সেই ধর্মান্ধ যার অদৃশ্য হাত অন্তত তিনটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রবাহটি নিয়ন্ত্রণ করেছে'— এই তিনটি হলো কার্জন উইলি, জ্যাকসন এবং গান্ধী হত্যা। একমাত্র জ্যাকসন মামলায় সাভারকারকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যেসব তথ্য প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষকরে তাঁর মৃত্যুর পর, তাতে এমনকী যখন তিনি বেঁচেছিলেন তখনো ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তাঁর প্রতি সন্দেহ দৃঢ়তর হয়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সাভারকারের নিজের রচনার ভিত্তিতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থানকালে তাঁর আচার-আচরণ (তৃতীয় অধ্যায়), তাঁর নিবন্ধ 'হিন্দুত্ব' (১৯২৩)-এর বিশ্লেষণ, আর এস এস-এর ক্ষেত্রে তার ফলাফল ও বিজেপি-র ওপর তার প্রভাব, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা (চতুর্থ অধ্যায়) এই সমস্ত বিষয়ে বিবরণ দেওয়া হবে। গান্ধীহত্যায় তাঁর বিশদ যোগাযোগ সংক্রান্ত সন্দেহের প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে পঞ্চম অধ্যায়ে। এই মুহূর্তে, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস জে এল কানপুরের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন এই বিশ্বাসকে যে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। জঘন্য প্রমাণাদির পুনরাবৃত্তি

করে কমিশন মন্তব্য করেছিল এই সমস্ত তথ্যগুলি একত্রিত করলে সাভারকার আর তাঁর দলবলই এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারী এই সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অন্য যে কোনো তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিতে হয়।'[৫০]

তাহলে, ১৯১৩ থেকে ১৯৫০, প্রায় এই চল্লিশ বছরে সাভারকারের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাঁর কার্যকলাপের পরিণতি থেকে বাঁচবার জন্য তিনি সরকারের কাছে হীন আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই কাজের ধরনগুলোও একইরকম ছিল— যাকে হত্যা করার জন্য নির্বাচন করেছেন সাভারকার, তার দিকে বন্দুক চালাবার কাজে অন্য কাউকে ব্যবহার করা। আর তিনি নিজে টুপির আড়ালে মুখটি ঢেকে রাখবেন। তাঁকে যারা চিনত তাদের সকলের জানা তথ্যগুলি তিনি মামলা চলাকালীন অসৎভাবে অস্বীকার করেছিলেন। অস্বীকার করেছিলেন নাথুরাম গডসেকে— তার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাকে। এমনকী কীরও সেকথা স্বীকার করেছেন।[৫১] নাথুরামের ভাই গোপালও তাই-ই করেছে। কানপুরের প্রতিবেদনে সেটি সমর্থিত ও অনুমোদিত হয়।

দ্বিজাতি তত্ত্ব

সাভারকারই হলেন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা। ১৯২৩ সালে তিনি 'হিন্দুত্ব'-এ এটি প্রথম উদ্ভাবন করেন এবং তারপর ১৯৩৭ সালে ৩০শে ডিসেম্বর মাসে হিন্দু মহাসভায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন : 'প্রধানত দু'টি জাতি ভারতবর্ষে, হিন্দু এবং মুসলিম।' এক বছর পর ১৯৩৮ সালে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে— আমাদের হিন্দুস্তানে হিন্দুরাই হলো প্রধান জাতি আর মুসলিম সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী।'[৫২]

ঐতিহাসিক আর সি মজুমদার, সঙ্ঘ-পরিবারের প্রতি সহানুভূতির কথা যিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী, সেটি হলো হিন্দু মহাসভা...।' তাঁর দৃষ্টিতে সাভারকার ছিলেন 'মহান বিপ্লবী নেতা'।'[৫৩] এর সঙ্গে তিনি যোগ করেন যে, 'মুসলিম লীগ সাভারকারের এই উদাত্ত বক্তৃতা (Sic) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল।' জিন্না তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্বটি ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন। যে দেশকে একদা তিনি ভালোবাসতেন এটি তাকেই দ্বিখণ্ডিত করল, যে গোষ্ঠীর পরিচালনায় তিনি ছিলেন সমৃদ্ধ ক্ষতি করল তাদেরই, যে রাষ্ট্র তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তার ভবিষ্যৎ ক্ষয়িত হলো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিভাজন তাঁর তত্ত্বের ভ্রান্তিকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করল। তিরিশ বছর পরে আজও সে দেশ বিচ্ছিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট। ১৯৪৭ সালে জিন্না নিজেই তাঁর তত্ত্বকে পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতিগত কারণেই দ্বিজাতি তত্ত্ব বিষময়। কিন্তু কেউ যখন একথা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে, দু'টি গোষ্ঠী কেবল যে আলাদা তাই নয়, একটি অপরটির চেয়ে হীন তখন এটি আরও মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সমগ্র জীবনব্যাপী সাভারকার এ কথাই বিশ্বাস করতেন।

স্বভাবতই তাঁর প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছিল। ১৯২৫ সালে বেদান্ত আশ্রমে একটি সাধারণ জনসভায় জয়কর তাঁকে আমন্ত্রণ জানান।

কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকার একটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর মূল বিষয়টি ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত না আমরা স্বাধীন জাতি হয়ে উঠতে পারি ততদিন নম্রতা, আত্মসমর্পণ কিংবা ক্ষমার মতো কোমল গুণগুলো অনুশীলন করার কথা আমাদের ভাবা উচিত নয়। বিপরীতে, আমাদের পরাধীনতার, ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা, শাস্তিদানের ইচ্ছা এবং অন্যান্য এরকম আরো সব কঠিন অভ্যাসগুলিকে উন্নততর করা উচিত। অন্যভাবে বলতে গেলে, যতদিন না স্বাধীন হচ্ছি ততদিন আমাদের ধর্মের বহুল প্রচারিত সদাচারগুলি আপাতত বন্ধ রাখতে হবে। যেহেতু তাঁর বক্তৃতায় শব্দচয়ন এবং বাচনভঙ্গি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল, কাজেই উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল। যতদিন না ভারত স্বাধীন হয় ততদিন ভারতবাসীর উচিত তাদের আমোদ-আহ্লাদ, স্বাচ্ছন্দ্য, পাণ্ডিত্য এবং গবেষণার মর্যাদা এসব কিছু স্থগিত রাখা— তিলকের এই ঘোষণার ভুল উপস্থাপনায় সাভারকার তাঁর যুক্তিগুলিকে দৃঢ়তর করেছিলেন। অধিকাংশই যদিও এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, তবু অল্প কয়েকজন বক্তা সাভারকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু মূল বিপদ হলো যে, প্রধানত শ্রী রামকৃষ্ণের মহৎ শিক্ষাকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই সভাটি আহ্বান করা হয়েছিল। যেখানে দেশাত্মবোধের নামে আক্রোশপ্রসূত প্রতিহিংসা, বিষাক্ত ঘৃণা, বিদ্বেষী প্রতিশোধস্পৃহা এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারিত হলো। অর্থাৎ এর অপব্যবহার করা হলো।[৫৪]

হিন্দুত্বের একটি বিশদ সমালোচনায় ড. বি আর. আম্বেদকর দেখান, হিন্দুত্বের ভিত্তি যে 'হিন্দু', সাভারকার-কৃত সংজ্ঞায় তাকে 'সযত্নে এবং অতি সতর্কতায় গড়ে তোলা হয়েছে।' একজন হিন্দু হলো সেই মানুষ যে ভারতবর্ষকে তার পিতৃভূমি এবং সেইসঙ্গে তার পুণ্যভূমি এই উভয় মর্যাদায় বিভূষিত করে। 'সাভারকারের যে দু'টি উদ্দেশ্য তা পূরণের জন্যই এটি পরিকল্পিত হয়েছে। প্রথমত, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্শী এবং ইহুদীদের এর থেকে বাদ দেবার জন্য হিন্দু হবার গুণাগুণ হিসেবে ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাওয়াই বাতলানো। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদিদের যুক্ত করার জন্য এই গুণাগুণের মধ্যে বেদের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিশ্বাসকে যুক্ত না করা।'[৫৫]

যে মানুষ এরকম ছলনাময় বিশ্বাসে ভরপুর, তাঁকেই বিজেপি আমাদের জাতীয় নেতা হিসেবে সম্মানিত করছে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০০০, নতুন দিল্লিতে ভগৎ সিং বিষয়ক একটি বই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাজপেয়ী হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করে সাভারকারের নাম টেনে আনলেন। তিনি 'বলে চললেন যে, আর এস এস-এর তাত্ত্বিক নেতা বীর সাভারকার এবং অন্যান্যদের অবদান শহীদ ভগৎ সিং এবং তাঁর সহ-দেশপ্রেমিকদের চেয়ে কম ছিল না।'[৫৬] ভগৎ সিং এবং সাভারকারের মতো এতই পার্থক্য যে, অন্য কোনো দুজন মানুষের মধ্যে বোধহয় তেমনটি থাকতে পারে না। ভগৎ

সিং নিজেই দু'বার বন্দুক ছুঁড়েছিলেন। দ্বিতীয় বার ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিষদে, পালানো অসম্ভব জেনেই তিনি তা করেছিলেন। আর সাভারকার যাঁকে ঘৃণা করেন তাকে হত্যার জন্য বারবার অন্য মানুষকে কাজে লাগিয়েছেন। ভগৎ সিং ছিলেন মহান বিচারধারার মানুষ। আর সাভারকার ঘৃণাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। ভগৎ সিং ছিলেন একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। যখন তাঁর পরামর্শদাতা লালা লাজপত রায় সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলেন তখনই তিনি নিজেকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আর সাভারকার নিজেই ছিলেন একজন হিন্দু জাতীয়তাবাদী যিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়েছিলেন। ভগৎ সিং ভুলের বিষয়ে উদার ছিলেন। আর সাভারকার এমনকী যারা তাঁর খুব নিকটজন তাদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সংকীর্ণ চিত্ত। জেলে ভগৎ সিং হিংসার অসারতা অনুভব করেছিলেন এবং এর প্রয়োগের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। আর সাভারকারের মানসিক গঠন এমনই যে, কোনো অনুভূতিই ছিল না তাঁর। ভগৎ সিং যখন ফাঁসির মুখোমুখি, এমনকী তখনো তিনি ক্ষমাভিক্ষা চাইতে অস্বীকার করেছিলেন। বস্তুত তিনি এই মর্মে সওয়াল করেছিলেন যে, তাঁরা যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে অভিযুক্ত, সেকারণে তাঁকে এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে যুদ্ধবন্দীদের মতো গুলি করে হত্যা করা হোক। তাঁর পক্ষ সমর্থনের প্রচেষ্টায় ট্রাইবুনালের কাছে কিছু লিখতে নিষেধ করে তিনি তাঁর বাবাকে তীক্ষ্ণভাষায় একটি পত্র লেখেন। অন্যদিকে মারাত্মক কাপুরুষতার একটি ধারাবাহিক উল্লেখযোগ্য রেকর্ড রয়েছে সাভারকারের।[৫৭] অতীতের প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদী আপন হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছিলেন, জীবনে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবেননি তাঁরা, ভারতবর্ষের মহান ভবিষ্যতের স্বপ্নে নিজের দেশের জন্য আপনার প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। মৃত্যুর সম্ভাবনাও তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাভারকার একেবারে বিপরীত। অত্যন্ত অমর্যাদাকর তার প্রতিটি আচার-আচরণ। কারারুদ্ধ হবার পর প্রথম সুযোগেই তিনি একেবারে দাসানুদাস হয়ে গেলেন কর্তৃপক্ষের পদানত হলেন। তিনি ছিলেন ঘৃণার ব্যাপারী। সুপরিচিত ধনিককুলের অর্থানুকুল্যে পুষ্ট ছিলেন, পুরোনো নথিপত্র আমাদের একথাই জানায়।

গান্ধী হত্যা

একটা প্রশ্ন মনে আসতে বাধ্য— কোনো দেশের ইতিহাসে কি এমন কোনো বিপ্লবীর সন্ধান মেলে যার অতীতকাহিনী সাভারকারের মতো কলঙ্কিত? তাঁকে বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার নিগূঢ়ার্থে বিজেপি-কে যা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, সে হলো তাঁর হিন্দুত্ব-এর উদ্ভাবন, সাম্প্রদায়িক ঘৃণার এই বিশ্বাস। সেইজন্য তাঁর সমস্ত পাপ এমন নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। গান্ধী হত্যা মামলার এমন একটি দিক আছে যেটি সাধারণভাবে চোখে পড়ে না। যেহেতু তদানীন্তন বোম্বে প্রদেশে হত্যার ষড়যন্ত্র সংগঠিত হয়েছিল, সে কারণে বোম্বে পুলিসই তার বিভিন্ন শাখায় এর তদন্তকার্য পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে দিল্লি পুলিস ঢুকে পড়ল। কেননা ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড দিল্লিতেই ঘটেছিল। বোম্বের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে নিখুঁত যোগাযোগ ছিল। প্যাটেল যদি সম্মতি না দিতেন তাহলে কোনো অবস্থাতেই এরকম একটা মামলায় কোনো অভিযোগের বয়ান (charge sheet) তৈরি করা যেত না। গান্ধীর প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ছিল। তাছাড়া তিনি তাঁর সময়ের একজন প্রথিতযশা ফৌজদারী উকিল (criminal lawyer) ছিলেন। প্যাটেলের সম্মতি ছাড়া কখনোই অভিযুক্তদের একজন হিসেবে সাভারকারের নাম তালিকাভুক্ত করা যেত না। এই সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্রে প্যাটেলের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিফলিত আর একই সঙ্গে তাঁরই ভুল পছন্দে নির্বাচিত ক্যাবিনেট-সহকর্মী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ছিলেন হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি, সাভারকারের সমর্থক এবং পরবর্তীকালে জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর হীন অবস্থান পরিস্ফুটিত।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা মে মুখার্জি খুব ব্যস্ত হয়ে প্যাটেলকে লিখলেন,

> মহাসভার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের যথার্থ পরিচয় প্রসঙ্গে আপনাকে লিখছি (শংকরের সঙ্গেও কথা বলেছি)। গান্ধীজীর ওপর নৃশংস আক্রমণের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে যাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদের যে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুনলাম যে এই প্রসঙ্গে সাভারকারের নামও উল্লেখিত হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ পাওয়া গেছে আমি জানি না। কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি যাতে রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য তাঁকে সোপর্দ দায়রায় করার কথা ভবিষ্যতে উঠতে পারে। এ বিষয়ে আপনি নিজেই যে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবেন, সে সম্পর্কে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে নথিপত্র নিশ্চয় আপনার সামনে উপস্থিত করা হবে এই আমার আশা। তাঁর অতীত আত্মত্যাগ এবং যন্ত্রণা দুই-ই যথেষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যার ষড়যন্ত্র করার দায়ে এই বয়সে তাঁকে অভিযুক্ত করা উচিত হবে না। গোটা বিষয়টিতে আমি আপনার সিদ্ধান্তের ভরসাতেই রইলাম।

প্যাটেল ১৯৪৮ সালের ৬ই মে এইভাবে প্রত্যুত্তর করলেন

> সাভারকারের প্রসঙ্গে বলি, এখানে আসার আগে বোম্বের অ্যাডভোকেট-জেনারেল যিনি এই মামলার দায়িত্বে আছেন, তিনি এবং অন্যান্য আইনী উপদেষ্টা ও তদন্তকারী অফিসারের দল দিল্লিতে একটা সম্মেলনে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের আমি বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছি যে, সাভারকারের নামটি অন্তর্ভূক্ত করার প্রশ্নে অবশ্যই পুরোপুরি আইন এবং আদালতের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগোতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এর মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনার আমদানি করা উচিত হবে না। আমার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট এবং সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আর আমি নিশ্চিত যে তাঁরা সেইমতোই কাজ করবেন। আমি তাঁদের একথাও বলেছি, যদি তাঁরা এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে সাভারকারের নাম অন্তর্ভূক্ত করা উচিত, তবে সেক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে

সমস্ত কাগজপত্র আমার সামনে পেশ করতে হবে। এই অপরাধের প্রশ্নে, এর যতটুকু আইন ও আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবশ্যই বিষয়ের কথাই বলা হচ্ছে। নৈতিকভাবে কারোর বিশ্বাস অন্যরকম হতে পারে। সেটাও সম্ভব।[৫৯]

এই শেষ অংশটিতে প্যাটেল কী এ কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, আদালতে যদি সাভারকারের অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করা না-ও যায় তবু নীতিগতভাবে তাঁকে এই অপরাধে অভিযুক্ত করা সম্ভব? ১৯৪৮ সালের ২৭শে মে যখন বিচার শুরু হলো তখন আদালতে সাভারকার সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হলো। কিন্তু তার আগে ১৫ই মে সরকারী গেজেটের 'Extraordinary' সংখ্যায় ন'জন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো। সাভারকার ছিলেন অষ্টম অভিযুক্ত।[৬০]

মুখার্জিকে লেখা প্যাটেলের চিঠির পরবর্তী অংশটিতে আসা যাক :

আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত যে, গান্ধী হত্যার যে ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল সেখানে সংগঠন হিসেবে হিন্দু মহাসভা কোনোভাবেই যুক্ত ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলব যে, হিন্দু মহাসভার বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য এই মর্মান্তিক ঘটনায় উৎফুল্ল হয়ে মিষ্টি বিতরণ করেছিল। এই ঘটনার বিষয়েও আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। এ বিষয়ে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। তদুপরি, মাত্র কয়েকমাস আগেও মহন্ত দিগ্বিজয় নাথ, অধ্যাপক রাম সিং এবং দেশপাণ্ডের মতো হিন্দু মহাসভার অনেক মুখপাত্র যে-ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন, তাকেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ঐ একই কথা আর এস এস-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সামরিক এবং আধা-সামরিক পদ্ধতিতে গোপনে পরিচালিত এই সংগঠনের মধ্যে আরো একটি বাড়তি বিপদ পুঞ্জীভূত রয়েছে।[৬১]

সংগঠন হিসেবে আর এস এস গান্ধী হত্যায় সরাসরি যুক্ত ছিল, এমন অভিযোগ এখন আর কেউ করে না। যে অভিযোগটি করা হয়েছে এবং বহুদিন যাবৎ যেটি তীব্রভাবে অস্বীকৃত হয়েছে, তা হলো গডসে আর এস এস-এর সদস্য ছিল। শেষপর্যন্ত রহস্যটি সম্পূর্ণ উন্মোচন করেন গোপাল গডসে। ১৯৯১ সালের ৫ই জুন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, নাথুরাম আর এস এস-এর একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিল কিন্তু আর এস এস এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।[৬২]

১৭ই জুলাই, ১৯৪৮ 'আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার প্রসঙ্গে আমাদের নীতি' এই বিষয়ে মুখার্জি আবার প্যাটেলকে চিঠি লিখলেন। সংগঠন হিসেবে দু'টির কোনোটিই এক্ষেত্রে যুক্ত নয় (এইরকম), এই তাঁর আবেদন। বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তিনি 'হিন্দু সংহতি'-র পক্ষে সওয়াল করলেন... মুসলিম অথবা অন্য কোনো বিদেশী শাসনের সম্ভাবনা থেকে ভারতকে রক্ষার প্রয়োজনে হিন্দুদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনোই স্বৈরাচারী কিংবা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত হবে না।' 'মুসলিমদের প্রতি আমাদের মনোভাব'-এর বিষয়টি

একটা গোটা অনুচ্ছেদ জুড়ে রয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ভারতের প্রতি বিশ্বস্ত নয়।[৬৩]

ঠিক তার পরের দিন ১৮ই জুলাই প্যাটেল উত্তর দিলেন :

> আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার সম্পর্কে বলা যায়, গান্ধীহত্যা সম্পর্কিত মামলাটি এখন আদালতের বিচারাধীন এবং এই ক্ষেত্রে ঐ সংগঠন দু'টির অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাওয়া অনুচিত। কিন্তু আমাদের প্রতিবেদন থেকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ঐ সংগঠনদু'টি, বিশেষ করে প্রথমটির কাজকর্মের ফলে গোটা দেশে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল যাতে এরকম একটা সাংঘাতিক দুঃখজনক ঘটনা সম্ভব হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রে যে হিন্দু মহাসভার চরমপন্থী অংশটি যুক্ত ছিল এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। সরকার এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে আর এস এস-এর কার্যকলাপ স্পষ্টত ভীতিপ্রদ। আমাদের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এদের কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বস্তুত, সময় যত এগোচ্ছে ততই এই আর এস এস চক্রটি আরো বেশি দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। আর বেশ বর্ধিত মাত্রায় নিজেদের নাশকতামূলক কাজকর্মে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।[৬৪]

'এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু মহাসভার চরমপন্থী অংশ' কোনটি? প্যাটেল স্পষ্টভাবে সেটিকে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু এদের নেতা যে কে, সে কথা তিনি বেশ ভালোই জানতেন। মুখার্জি যে নেতা বলতে কেবল গডসের উল্লেখ করেছিলেন, সাভারকারের কথা বোঝেননি, এটাই বেশ অস্বাভাবিক। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে লেখা ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮-এর চিঠিতে প্যাটেল সব কথাই বলেছিলেন :

> বাপুর হত্যা-মামলা সংক্রান্ত তদন্তের প্রতিটি অগ্রগতি বিষয়ে আমি নিজে, বলা যায়, দৈনন্দিন খোঁজখবর নিয়েছি। প্রতিটি সন্ধেবেলা বেশ অনেকক্ষণ প্রতিদিনের অগ্রগতির ব্যাপারে সঞ্জেভি-র সঙ্গে আলোচনা করেছি। উত্থিত সমস্ত বিষয়ে তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি। প্রধান অভিযুক্তরা সকলেই তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুদীর্ঘ এবং বিশদ বিবৃতি দিয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে টাইপ-করা বিবৃতি নব্বই পাতায় গড়িয়েছে। তাদের বিবৃতিগুলি থেকে একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার যে ষড়যন্ত্রের কোনো অংশই দিল্লিতে বসে করা হয়নি। পুনা, বোম্বে, আমেদাবাদ এবং গোয়ালিয়র— এগুলিই ছিল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। তাদের কার্যকলাপের চূড়ান্ত স্থানটি অবশ্যই দিল্লি ছিল, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এর কেন্দ্র ছিল না। এক-দু'দিনের বেশি একটানা কখনই তারা এখানে ছিল না। আর তাও ১৯ থেকে ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে মাত্র দু'বার। এই সমস্ত বিবৃতি থেকে আর একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আর এস এস একেবারেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে সাভারকারের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভার একটি ধর্মোন্মত্ত অংশ এই ষড়যন্ত্রের (পরিকল্পনা)

> করেছিল এবং দেখতে চেয়েছিল যে এর সাহায্যে...। অবশ্য, আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার যারা, বাপুর ভাবাদর্শ, নীতির কড়া বিরোধিতা করত, তারা তাঁর এই হত্যাকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও, আমাদের কাছে যেসব প্রমাণাদি আছে তার ভিত্তিতে আর এস এস কিংবা হিন্দু মহাসভার অন্য কোনো সদস্যকে জড়িয়ে ফেলা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।[৩৫]

কাজেই এই প্রশ্নের বিরুদ্ধে ওজর-আপত্তি ধোপে টিকবে না। গান্ধী হত্যায় সাভারকারের ভূমিকা বিষয়ে সমস্ত নথিপত্রকে বিজেপি এবং আর এস এস কেন উপেক্ষা করেছে, কেন তাঁকে নেতা বানিয়ে তোলার জন্য সোরগোল তুলছে? হত্যাকারী যদি হিন্দুত্বের স্রষ্টা না হতো, তাহলে কি তারা এতটা উদাসীন থাকত? ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখে যখন জনসঙ্ঘের সভাপতি দীন দয়াল উপাধ্যায়কে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তখন তাদের অতিব্যস্ততার সঙ্গে এই নিষ্ক্রিয়তার তুলনা করা যাক। আগের দিন রাত্রে তিনি শিয়ালদা এক্সপ্রেসে পাটনা যাবার জন্য লক্ষ্মৌ ত্যাগ করেছিলেন। মোগলসরাই-এর প্লাটফর্ম যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকে ৭৪৮ ফুট দূরে একটা ট্রাকশন পোলের কাছে তাঁর মৃতদেহ পড়ে ছিল। সেদিন প্রায় রাত দুটো বেজে দশ মিনিটে ট্রেনটি মোগলসরাই স্টেশনে থেমেছিল। সি বি আই-এর বক্তব্য ছিল যে, সাধারণ চোরের কাজ এটা; সামান্য কিছু লুটপাটের জন্য; আর মুহূর্তের আকস্মিকতায় হত্যাটি ঘটে গেছে। জনসঙ্ঘ সি বি আইকে আক্রমণ করল এবং প্রমাণ সংগ্রহের জন্য নানা দেশমুখের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হলো। এই মামলায় তাঁর বিবৃতি নথিভুক্ত করা হলো এবং তদন্ত কমিশনের সামনে জনসঙ্ঘ যে একান্নজন সাক্ষীকে জেরা করেছিল, তাদের মধ্যেও তিনি রইলেন। ২৩ জন সাক্ষীকে জেরা করেছিল সি বি আই। বোম্বে হাইকোর্টের ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়, যিনি পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনি এই কমিশনে ছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিশদভাবে উন্মোচিত হয়েছিল। এতে সঙ্ঘ পরিবার তখনকার মতো দমে গিয়েছিল।[৩৬] ৯ই জুন ১৯৬৯, বারানসীর সেশনজজ অভিযুক্ত দুই তরুণ ভরতলাল ডোম এবং রাম আওয়াধকে হত্যাপরাধে দণ্ডিত করেছিলেন। ভরতলালের বিরুদ্ধে উপাধ্যায়ের জিনিসপত্রাদি চুরির অভিযোগ ছিল এবং তাকে চার বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ২৩শে অক্টোবর।

জনসঙ্ঘ এমন কৌশল করে তার জাল বিস্তৃত করেছিল যাতে বিশ্বাসের সমগ্র ক্ষেত্রটিকেই অস্বীকার করা হয়েছিল। 'উপাধ্যায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়েছে' এমন অভিযোগ করা হলো এবং এই অপরাধে লিপ্ত থাকার অভিযোগে 'কিছু মুসলিম সংগঠন' আর সেইসঙ্গে 'কয়েকজন কমিউনিস্টকে' দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তারা কোনো একজন মেজর এস এম শর্মার সাহায্য নিয়েছে এমন অভিযোগও উঠল। ইনি হলেন কোনো এক ভি এন শর্মার জামাই। এই ভি এন শর্মা 'নাকি মজলিস মুশাওয়ারাত-এর সভাপতি ড. আবদুল জলিল ফরিদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।' আরো একদলকে এর মধ্যে টেনে আনা হলো। উপাধ্যায়ের জিনিসপত্র আবিষ্কারের পর

'নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে' এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ 'নষ্ট করেছে'— সি বি আই-এর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগও করা হলো।[৩৭]

জাস্টিস চন্দ্রচূড়ের ২০শে অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখের প্রতিবেদন এই সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলো না। পরিষ্কার বলা হলো, 'বেশ কিছুটা আস্থা নিয়েই আমি বলতে পারি যে আমার কাছে এমন কোনো কাগজপত্র আসেনি যাতে শ্রী উপাধ্যায়ের হত্যার সঙ্গে রাজনীতির সংশ্রব আছে এমন অভিযোগ সমর্থিত হয়।' ঘটনাটি হঠকারী এবং 'কয়েকজন চোরের তাৎক্ষণিক হাতের কাজ'। অবশ্য এটাই সব নয়। জনসঙ্ঘের এক সদস্য এবং একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদক রামাচার্য্য পাণ্ডে যে দিনলিপি লিখেছিলেন, দেখা গেল 'প্রমাণ হিসেবে পেশ করার উদ্দেশ্যে' সেটি পুরোপুরি রঙচড়ানো। একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রবিচারে নানা দেশমুখ নিজেও আর বিশ্বাসযোগ্য রইলেন না :

> শ্রী নানা দেশমুখ বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি ৩১ তারিখ সকালে রামাচার্য্যকে ফোনে বলেছিলেন যে সংশ্লিষ্ট খবরাখবর তিনি সংগ্রহ করবেন। এই বিবৃতিটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নানাজী তখন ছিলেন বোম্বেতে আর এই হত্যাকাণ্ডের বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। বস্তুত, ১১ তারিখ সকালে রামাচার্য্য লক্ষ্ণৌ থেকে নানাজীকে আদৌ ফোন করেছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। প্রকাশ চাটওয়াল নামে লক্ষ্ণৌ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের একজন কর্মী, আমার সামনেই সি বি আই তাঁকে জেরা করেছিল, তিনি বলেছেন যে, ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখে ২৩৫০৯ (লক্ষ্ণৌ) টেলিফোন নম্বর থেকে বোম্বেতে কোনো ট্রাঙ্ককল করা হয়নি। ২৩৫০৯ হচ্ছে লক্ষ্ণৌ-এ জনসঙ্ঘের কার্যালয়। রামাচার্য্য বলেছেন, তিনি উপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবরটা সেখানেই পেয়েছিলেন।[৩৮]

এরকম আচার-আচরণ করার পরেও জনসঙ্ঘ কোনোক্রমে টিকে রয়েছে। কিন্তু সাভারকারের মতো একজন মানুষ কী করে জনগণকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেন, যাতে তাঁর স্মৃতিতে মূর্তি তৈরি করা যায় কিংবা তাঁর নামে রাস্তা নামাঙ্কিত করা যায়? আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যাঁরা মুসলিম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যাঁদের আত্মত্যাগ তাঁদের হিন্দু সহযোদ্ধাদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, তাঁদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে এই ব্যবহারের বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন। একজন দায়বদ্ধ অসাম্প্রদায়িক মানুষ এবং পণ্ডিত হিসেবে ঐতিহাসিক অধ্যাপক মুসিরুল হাসানের খ্যাতি অবিসংবাদিত। এই প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ বিশদ উদ্ধৃতির দাবিদার :

> ভারতীয় রাষ্ট্র যখন তার অসাম্প্রদায়িক খ্যাতির বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য অত্যন্ত অনিচ্ছায় অতীতের স্মৃতিরক্ষা করে, তখন মুসলিমদের প্রতি সদিচ্ছার কারণে, তাদের ভাবাবেগকে একটু প্রশ্রয় দেবার কাজটি বেশ আহ্লাদে সম্পন্ন

করা হয়। সংগঠকরা বেশ সাবধানে 'মুসলিম' বুদ্ধিজীবীদের থেকে লোক বাছেন। পূর্বানুমান অনুযায়ী সম্মেলন বা আলোচনা সভার স্থান হয় আলিগড়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর পাটনার খুদাবক্স পাঠাগার।

'জাতীয়তাবাদী মুসলিম'-এর মতো এমন একটি অশোভন অভিব্যক্তি, কেমন করে যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল; আর আনসারি এবং আজাদের মতো মানুষের কাজকর্ম বিশদভাবে বর্ণনার জন্য সেই বিশেষণ এমন যত্রতত্র ব্যবহার করা হলো সেটাও সমানভাবে অস্বাভাবিক। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে, জাতীয়তাবাদী এবং দেশাত্মবোধক ভাবাবেগের অস্তিত্ব কেবলমাত্র 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' গোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যন্তরেই এর অশোভনতা বা অসংগতি বিদ্যমান। 'অন্যেরা' যদি সেই একই অনুভবের শরিক হয় তবে সেটাকে নিয়ম না ভেবে 'ব্যতিক্রম' হিসেবে দেখা হয়। কাজেই আজমল খান, আনসারি এবং আজাদ— এই সব 'জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের' তাঁদের সহধর্মীদের থেকে আলাদা করে রাখা হলো। তাঁদের সম্পর্কে এমন ব্যবহার করা হলো যেন তাঁরা ব্যতিক্রমী মানুষ; জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে কেবল প্যান-ইসলামীয় ভাবধারাকে পুষ্ট করতে এই যে এক সম্প্রদায় গড়ে তোলা হয়েছে, তার মধ্যে তাঁরা যেন অসাধারণ, অনন্য।

আজমল, আনসারি, আজাদ যদি জাতীয়তাবাদের বিশেষ অবস্থানের নিরিখে 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' হয়ে থাকেন, তবে ওই একই যুক্তিতে গান্ধী, নেহরু এবং প্যাটেলকে 'জাতীয়তাবাদী হিন্দু' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আবার ধর্মই যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো গোষ্ঠীর শ্রেণীনির্দেশের একমাত্র নির্ণায়ক হয় তবে একজন কৃষকনেতা কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন নেতার বর্ণনা কীভাবে দেওয়া যাবে? তাহলে মুজফফর আহ্‌মদ কি একজন 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' আর পি সি জোশি 'জাতীয়তাবাদী হিন্দু'। কেবল উত্তরের সন্ধানে ফেরাই যথেষ্ট নয়। ভারতের নিকট-অতীতের এমন চূড়ান্ত বিকৃত ভাবরূপকে সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থাও নিতে হয়।

আমাদের আত্মপরিচয়, তা সে ধর্মীয় বা অন্য কিছু যাই হোক না কেন, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই সেটির সৃষ্টি। গতানুগতিক সাম্প্রদায়িক প্রতিচ্ছবিতে মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রায়শই একটি পরিচয় অন্যটির ওপর আরোপ করা হয়। ফলত, 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম'-এর ক্রিয়াকলাপ, আদর্শগতভাবে এটি তো সাধারণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার একটি অংশ হয়ে উঠবে। এরকমই হওয়া উচিত ছিল। কেননা এটিও জাতিসত্তার সম্মিলিত ভাবধারার একটি অভিব্যক্তি। কিন্তু কার্যত এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে এটি কেবল মুসলিমদের সঙ্গেই অন্তর্বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়।[৩২]

এই নিখুঁত যুক্তিবিন্যাস অনুযায়ী, হিন্দুত্বের ঘোষণাপত্রের কারণে সাভারকারকে

১৯২৩ সাল থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল; আগে যদি না-ও করা হয়, তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর ১৯৬৬ সালে তো নিশ্চয়ই উচিত ছিল। তাঁকে যে কোনোমতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসেবে ঘোষণা করা যায় না, তার আর একটি বড়ো প্রমাণ হলো, নেহরুর ৫ই জানুয়ারি ১৯৬১-এর বিচক্ষণ সাবধানবাণী। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যম্ভাবী, 'কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকের সাম্প্রদায়িকতা অতি দ্রুত জাতীয়তাবাদ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।'[৭০]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মুখোশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে গোপন করার প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়ে নেহরু একথা বলেছিলেন। সাভারকার আপন বিকৃত ভঙ্গিমায় নিজেকে সঠিক প্রমাণ করলেন। কানপুরে একটি ছাত্র সমাবেশকে সম্ভাষণ করে সাভারকার বললেন,

> যাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়, সেটিকে বস্তুত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জাতীয়বাদ। এটিই দেশকে শাসন করছে এবং এখনো শাসন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে। একমাত্র এরই অবয়বে সঞ্চারিত করা যায়। কাজেই হিন্দুস্থানে জাতীয়তাবাদ হিন্দু সম্প্রদায় যে বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিদ্যমান এবং হিন্দু ধর্মের প্রচারক, তারাই জাতীয় গোষ্ঠী। তারাই জাতিরাষ্ট্রের জাতীয়তা সৃষ্টি করে এবং সেটিকে নির্দিষ্ট আকার দেয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এমনটি ঘটেছে ... সংখ্যালঘুরা তাদের পৃথক পৃথক ধর্ম এবং সভ্যতা বজায় রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সেই দেশসমূহের প্রশাসন ও সাধারণ জীবনে নিজেদের একাকার করে দেয়।[৭১]

সঙ্ঘ পরিবার যে নেহরুর স্মৃতিকে ঘৃণা করবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু মোরারজী দেশাই-এর ক্ষেত্রে তারা একটু নরম মনোভাব বজায় রেখেছে। সেকারণে ৩রা এপ্রিল ১৯৪৮, বোম্বে বিধানসভা কাউন্সিল-এ আর এন মান্দলিক যখন সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের অতীত অবদান-এর উল্লেখ করেন, তখন সাভারকার প্রসঙ্গে দেশাই-এর সযত্ন শব্দ চয়নে উচ্চারিত সিদ্ধান্ত তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই উপযুক্ত কাজ হবে। মোরারজী দেশাই-এর উত্তরটি ছিল সর্বনাশা, সংক্ষিপ্ত : 'মহাশয়, তাঁর সেই প্রাচীন সুকৃতিটি যে বর্তমান কুকার্যে পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে, বলা যায় তারও বেশি কিছু হয়েছে এ কথা কি আমি বলতে পারি'?[৭২]

২. সাভারকারের জাতীয়তাবাদ

১৮৫৭ সেই মহাবিদ্রোহ, তার অশ্রু-রক্তপাত, তার যন্ত্রণা, বীরত্ব আর অবমাননা— এসব নিয়ে লিখতে বসা কোনো ভারতীয়ের পক্ষে সহজ কাজ নয়। যতদিন না ভারত স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে, ততদিন পর্যন্ত আবেগময় অতিশয়োক্তির কবল থেকে এই রচনার মুক্তি নেই। আমাদের মানুষজন ঘটনা নিয়ে বিশেষ কথা বলে না— বলাটা নিরাপদও নয়— সেসব ঘটনা আমাদের স্মৃতির অন্ধকার গুহায় স্টালাকটাইটের মতো আলম্বিত থাকে। একজন মিশনারি একবার একদল ছেলেকে সেনাবিদ্রোহের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। 'প্রত্যেকটি ছেলে এক গুচ্ছ সাদা কাগজ ফেরত দিয়েছিল। এই কাজটি করার বিরুদ্ধে এ ছিল তাদের নিঃশব্দ, সর্বসম্মত, ক্ষমাভিক্ষাহীন প্রত্যাখ্যান।' আমরা আমাদের ভাবনাচিন্তা মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে ভালোবাসি। এই একগুঁয়ে নীরবতায় আমরা এই বিদ্রোহের বিষয়ে ব্রিটিশ লেখকদের কলম থেকে যা কিছু উৎসারিত হয়েছে তাকে এড়িয়ে যাই, প্রত্যাখ্যান করি। অবশ্য আমাদের স্মৃতির মধ্যে প্রতিশোধ না নিতে-পারা, অসন্তুষ্ট এক অশরীরী কেবলি হেঁটে চলে, হেঁটে চলে।

অন্য দিকে, কোনো ইংরেজ লেখকই এই বিদ্রোহকে তার যথাযোগ্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সফল হননি। ক্ষমাপ্রার্থী ব্রিটিশদের কাছে যুক্তিজাল বিস্তারের জন্য যথেষ্ট তথ্যাদি পাবার সুবিধা ছিল। যুদ্ধে হার হয়েছিল ভারতীয়দের, তাদের পক্ষে যত কীর্তি সবই তাদের যোদ্ধাদের সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই শহীদ বীরদের স্মৃতিকে বিবর্ণ করে তোলার কোনো তুচ্ছ পথও ব্রিটিশ লেখকরা বাকি রাখেননি।[১]

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের বিষয়ে অশোক মেহতা লিখিত একটি বই থেকেই এই কথাগুলি নেওয়া। অসংখ্য কারণে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৫৭ কে একটি প্রলয়ংকর ঘটনা বলে গণ্য করা উচিত। এর একটি কারণ হলো, ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয়দের মধ্যেকার দূরত্বকে বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৭-এর ফলাফল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ অশোক মেহতার :

বিদ্রোহ যখন শুরু হলো তখন হিন্দু এবং মুসলমান অধিক সংখ্যায় এতে

অংশগ্রহণ করেছিল। কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্রোহী ছিল না তারা। কিন্তু ঐতিহাসিক এবং ভাবাদর্শগত কারণে, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা অনেক বেশি উগ্র ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। শাহ ওয়ালিউল্লা-র প্রেরণায় তাদের অনেকের কাছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত ছিল 'দর-উল-হার্ব'। কেবলমাত্র জাতীয়তাবোধের প্রয়োজনে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ নয়, এ ছিল তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সেকারণে ব্রিটিশ চলতি কথায় একটু নরম স্বভাবের হিন্দুর তুলনায় এই হঠকারী, উত্তেজনাপ্রবণ মুসলমানদের বেশি ভয় করতো।

সাংঘাতিক দমন পীড়ন নেমে এসেছিল মুসলমানদের ওপর— তাদের সর্বাঙ্গে যেন আতঙ্কের উলকি পরানো হয়েছিল। তাদের অনেক অগ্রগণ্য নেতা— যেমন ঝাজ্জর, বল্লভগড়, ফারুকনগর এবং ফারুকাবাদের নবাব— এঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, নির্বাসিত করা হয়েছিল... ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। দিল্লি পুনর্দখলের পরে, কয়েক মাসের মধ্যেই হিন্দুদের ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হলো কিন্তু গোটা মহামেডান সম্প্রদায়কে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলো; তাদের বাড়িঘরের ওপর থেকে সরকারী দখলকারী কেবল ১৮৫৯ সালেই তুলে নেওয়া হলো; দিল্লি ডিভিসনে যেখানে প্রতিটি মুসলমানকে তার স্থাবর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ অর্থদণ্ড দিতে হলো, সেখানে হিন্দুদের ওপর ধার্য জরিমানার পরিমাণ হলো মাত্র দশ শতাংশ।

শাসকদের কোপানল প্রধানত মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হলো। 'বজ্জাত মুসলমানগুলোকে দেখিয়ে দাও যে', ক্যাপ্টেন রবার্টস (ভবিষ্যতের ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস) লিখলেন 'ঈশ্বরের সহায়তায়, ইংরেজরা চিরকাল ভারতের প্রভু হয়েই থাকবে'। মুসলিমদের যন্ত্রণা ছিল বিপুল। বিজয়ীদের প্রতিশোধের আগুনে দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমনকী সৈয়দ আহমেদ খানের মতো একজন অনুগত ইংরেজভক্তের পরিবারকেও নির্যাতন এবং মৃত্যুর সাংঘাতিক মাশুল দিতে হলো। সে সময়ের সন্ত্রাস আর ভীতিবিহ্বলতা ধরা রয়েছে গালিবের পত্রাবলীতে, 'শাহের সাহ্‌রা হো গয়া' (শহর হয়ে গেছে বিলাপের মরুভূমি)। উর্দুবাজার তো গেল, তারপর উর্দুর কী হলো? দিল্লি আর শহর নয়, সে একটা অস্থায়ী ছাউনি— দুর্গ, শহর, বাজার, পরিখা সব শেষ!...

মুসলিমরা শুধুমাত্র বিদ্রোহে বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিল, বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তাই-ই নয়, কিছুতেই তারা এই পরাজয় মেনে নেয়নি, অনেকদিন পর্যন্ত আপসহীন ছিল। বিভিন্নভাবে তারা তাদের প্রতিরোধ বহাল রেখেছিল... তারা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেছিল। ফলে ক্রমাগতই পেশায় এবং সরকারী কাজে তারা নিজেদের পায়ের নিচের জমিটুকু হারাতেই লাগল।

অংশগ্রহণ করেছিল। কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্রোহী ছিল না তারা। কিন্তু ঐতিহাসিক এবং ভাবাদর্শগত কারণে, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা অনেক বেশি উগ্র ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লা-র প্রেরণায় তাদের অনেকের কাছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত ছিল 'দর-উল-হার্ব'। কেবলমাত্র জাতীয়তাবোধের প্রয়োজনে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ নয়, এ ছিল তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সেকারণে ব্রিটিশ চলতি কথায় একটু নরম স্বভাবের হিন্দুর তুলনায় এই হঠকারী, উত্তেজনাপ্রবণ মুসলমানদের বেশি ভয় করতো।

সাংঘাতিক দমন পীড়ন নেমে এসেছিল মুসলমানদের ওপর— তাদের সর্বাঙ্গে যেন আতঙ্কের উলকি পরানো হয়েছিল। তাদের অনেক অগ্রগণ্য নেতা— যেমন ঝাজ্জর, বল্লভগড়, ফারুকনগর এবং ফারুকাবাদের নবাব— এঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, নির্বাসিত করা হয়েছিল... ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। দিল্লি পুনর্দখলের পরে, কয়েক মাসের মধ্যেই হিন্দুদের ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হলো কিন্তু গোটা মহামেডান সম্প্রদায়কে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হলো; তাদের বাড়িঘরের ওপর থেকে সরকারী দখলকারী কেবল ১৮৫৯ সালেই তুলে নেওয়া হলো; দিল্লি ডিভিসনে যেখানে প্রতিটি মুসলমানকে তার স্থাবর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ অর্থদণ্ড দিতে হলো, সেখানে হিন্দুদের ওপর ধার্য জরিমানার পরিমাণ হলো মাত্র দশ শতাংশ।

শাসকদের কোপানল প্রধানত মুসলিমদের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হলো। 'বজ্জাত মুসলমানগুলোকে দেখিয়ে দাও যে', কাপ্টেন রবার্টস (ভবিষ্যতের ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস) লিখলেন 'ঈশ্বরের সহায়তায়, ইংরেজরা চিরকাল ভারতের প্রভু হয়েই থাকবে'। মুসলিমদের যন্ত্রণা ছিল বিপুল। বিজয়ীদের প্রতিশোধের আগুনে দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমনকী সৈয়দ আহমেদ খানের মতো একজন অনুগত ইংরেজভক্তের পরিবারকেও নির্যাতন এবং মৃত্যুর সাংঘাতিক মাশুল দিতে হলো। সে সময়ের সন্ত্রাস আর ভীতিবিহ্বলতা ধরা রয়েছে গালিবের পত্রাবলীতে, 'শাহের সাহ্রা হো গয়া' (শহর হয়ে গেছে বিলাপের মরুভূমি)। উর্দুবাজার তো গেল, তারপর উর্দুর কী হলো? দিল্লি আর শহর নয়, সে একটা অস্থায়ী ছাউনি— দুর্গ, শহর, বাজার, পরিখা সব শেষ!...

মুসলিমরা শুধুমাত্র বিদ্রোহে বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছিল, বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছিল তাই-ই নয়, কিছুতেই তারা এই পরাজয় মেনে নেয়নি, অনেকদিন পর্যন্ত আপসহীন ছিল। বিভিন্নভাবে তারা তাদের প্রতিরোধ বহাল রেখেছিল... তারা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করেছিল। ফলে ক্রমাগতই পেশায় এবং সরকারী কাজে তারা নিজেদের পায়ের নিচের জমিটুকু হারাতেই লাগল।

হিন্দুরা যেখানে পশ্চিমী ভাবধারাকে আত্মস্থ করে, নতুন পরিস্থিতিতে নিজেদের মানিয়ে-গুছিয়ে নিতে লাগল, সেখানে মুসলিমরা রয়ে গেল একা, বিচ্ছিন্ন, চিরাচরিত বিশ্বাসে ঢেকে রাখল নিজেদের। দিল্লির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তালমেলানো মুসলিম নবজাগরণ বিদ্রোহের মধ্যেই তার আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ... অপরদিকে, হিন্দু নবজাগরণের কেন্দ্র কলকাতার গায়ে এই বিদ্রোহের বিভীষিকার ছায়া পড়েনি। কাজেই কেবল শরীরে নয় মননের অনাহত উদ্দীপনায় এ শহর উত্থিত হলো।

অতএব, দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে ফাটল তৈরি হলো সেটি ভারতের অন্তরাত্মায় বাস্তবিকই মতান্তরী বিচ্ছেদের জন্ম দিল। যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিতর্ক আমাদের সভ্য জীবনপ্রবাহকে বিকৃত করেছে, বিষাক্ত করে তুলেছে, সেসবই হলো এই বিদ্রোহোত্তর সময়কালের অসুখী উত্তরাধিকার।

সাভারকার এবং ১৮৫৭

সাভারকার যে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান বিষয়ে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম-১৮৫৭' শিরোনামে একটি বই-ও রচনা করেছিলেন, সেটি সুবিদিত। সাভারকারের বইটি সম্পর্কে অশোক মেহতা লিখেছেন,

> এই সেনা অভ্যুত্থানের বিষয়ে অল্প কয়েকজন ভারতীয়ই লেখবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিনায়ক সাভারকার হলেন সেই ব্যতিক্রমীদের একজন। প্রাচীন ছাতাপড়া নথিপত্রের পাতালঘরে তিনি গবেষণার মশাল হাতে অগ্রসর হয়েছিলেন, একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এটির সর্বাঙ্গে অপরিণতির ছাপ লাগা। আবেগ, কবিতা এবং যৌবনময় দেশপ্রেমের দোলায় এটি সর্বদা তরঙ্গায়িত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং আবেগময় বহিঃপ্রকাশের নানান রেখা, বৃত্ত আর গ্রন্থিকে সম্মিলিত করে এখানে তাদের সম্পর্কের সূত্রটি উন্মোচন করা হয়েছে। এটি যত না ইতিহাস তার চেয়ে বেশি ইস্তাহার। এই বিদ্রোহ তার অমর ঐতিহাসিকদের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

সমালোচনাটি যথার্থ, কিন্তু সাভারকারের অত্যন্ত উচ্চ গুণসম্পন্ন লেখনীকে ইস্তাহার বলে খাটো করার কোনো যুক্তি নেই। ইতিহাস যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ : ব্রিটিশ শাসনমুক্তির সংগ্রামে হিন্দু এবং মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তারপরে এমন এক সংযুক্ত ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে এই দুই সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকারে থাকতে পারে।

পরবর্তীকালে সাভারকার এই মতাদর্শ বাতিল করায় তিন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রথমটি হলো, কোনো সমালোচনা ব্যতিরেকেই সাভারকারের সূচনাপর্বের মতাদর্শকে প্রচার করা, মধু লিমায়ে যেমন করেছিলেন। তাঁর যুক্তি হলো, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র প্রথম জীবনের সাভারকারকে মনে রাখবে।[৩] এ এক অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯২৩ সালের হিন্দুত্বকে উপেক্ষা করে, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বইটির

কয়েকটি আপত্তিকর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, লিমায়ে, ১৯৩৭ সালকে সাভারকারের কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এতেই তাঁর পাণ্ডিত্যের অযোগ্যতা প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো, সাভারকারের পরবর্তী জীবনের রাজনীতির কারণে এই বইটিকে অবজ্ঞা করা। অযোগ্য পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি এটিও অনৈতিহাসিক প্রবণতা। তৃতীয়টি হলো, এই গ্রন্থটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে গণ্য করে সেইমতো এর প্রশংসা বা সমালোচনা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিই যথাযথ। কেননা এভাবেই এই রচনাটিকে তার প্রকৃত মূল্যায়নে গ্রহণ করা যায়। সাভারকারের প্রতিটি শব্দ, তাঁর দৃষ্টির উদারতা সবকিছুকে স্বীকৃতি এবং আগত বছরগুলিতে প্রধানত, ইতিহাসের বিভ্রান্তিকর সাম্প্রদায়িক পাঠে এটির বীজ যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে কথাও মেনে নিয়ে, উভয়কেই সঠিকভাবে বিচার করা হয়। মুসলিমরা অতীতে অনেক ভুল করেছে, এই কল্পিত ভাবনা তখন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেগুলির জন্য সাভারকার সে সময় মুসলিমদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু একথা তিনি কখনো বিস্মৃত হননি, কিংবা তাঁর ভুল ব্যাখ্যার থেকে সরে আসেননি। এই ভুলটি যখন তিনি মনের মধ্যে বহন করছিলেন, তখন তারই ভিত্তিতে অন্য এক পথে বাঁক নেওয়া তেমন একটা চরমপন্থা নয়। এর চেয়ে তাঁর মনের অন্ধকার নিভৃতি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া আরো অনেক বেশি বিরক্তিকর ছিল। ১৯২৫ সালে এম. আর. জয়কর এ কারণে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। এটি কে তাঁর অপরিসীম যন্ত্রণাক্লিষ্ট এক মানুষের নিছক ফেটেপড়া বলে মনে হয়নি। সাভারকারের ভেতরে যে বৈশিষ্ট্যগুলির চিরকালের বাস, সেই সুতীব্র প্রতিশোধ-স্পৃহা এবং রক্তপাতের আশাঙ্ক্ষা— এই অভিজ্ঞতা তাদেরই ঠিকরে-পড়া বহিঃপ্রকাশ। অতএব 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম-১৮৫৭' বইটি যে চুলচেরা বিশ্লেষণের যোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সাভারকার ছিলেন অতীতের প্রতি মোহগ্রস্থ। 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর ভূমিকায় তিনি লিখলেন—

> নিজের অতীত বিষয়ে যে দেশ সচেতন নয় তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এটাও সমানভাবে সত্য যে, একটি দেশ শুধুমাত্র তার অতীত গৌরবের দাবিসনদ পেশ না করে ভবিষ্যতেও কেমন করে তার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় সেটিও ভাববে। দেশ তার ইতিহাসের প্রভু হবে, দাসানুদাস নয়। কাজেই, বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা না করেই কোনো কিছু কেবলমাত্র অতীতে একবার কার্যকর হয়েছিল বলে বর্তমানেও সেটি করার প্রচেষ্টা চূড়ান্ত বুদ্ধিহীনতা। শিবাজীর সময়কালে মহমেডানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অনুভব ছিল যথার্থ এবং প্রয়োজনীয়— কিন্তু আজ তেমন কোনো মনোভাব লালন-পালন করা অন্যায় এবং মূর্খামি। কারণ খুবই সরল। সেসময় হিন্দুদের মনে একধরনের শাসিতের মনোভাব বিদ্যমান ছিল। ইতিহাস থেকে পাওয়া নীতিগুলিকে কেবলমাত্র বর্ণনাত্মক হিসেবে গণ্য না করে বরং তাদের পরিশুদ্ধ করে নেওয়া উচিত।[৪]

১৮৫৭ সালের ভূমিকা লেখার সময় মুসলিমদের প্রশংসায় তিনি অশোক মেহতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এখানে আবার তিনি বর্ণনা থেকে নীতিসমূহকে সনাক্ত করেছিলেন :

> এই যে মৌলবীরা তাদের জন্য প্রচার করেছিল, ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করেছিল, দিল্লির মসজিদ আর বারাণসীর মন্দির থেকে একই সঙ্গে তাদের সাফল্যের আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল, এর থেকে কি শিখেছিল তারা। শিখেছিল মহান নীতি— স্বধর্ম আর স্বরাজ। সেইসময় যখন জীবনের চেয়ে প্রিয় ধর্মের ওপর ধূর্ত, বিপজ্জনক, ধ্বংসাত্মক আক্রমণের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে আর এই মারাত্মক আঘাতে স্বরাজ অর্জনের পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের ভাবনা আন্দোলিত হচ্ছে, তখন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য উত্থিত 'দিন' 'দিন' এই বজ্রনির্ঘোষে (সেকারণেই) হিন্দুস্থানের সমস্ত সন্তানের অস্থিমজ্জার মধ্যে স্বধর্ম আর স্বরাজের নীতিগুলি তো দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হবেই! (পৃ. ৮)

এখানে 'হিন্দুস্তান' শব্দটি অধিক মাত্রায় সেই একই ভাবার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল যেভাবে মহান মহম্মদ ইকবাল তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতাটিতে লিখেছিলেন : সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা (সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে আমাদের হিন্দুস্তান শ্রেষ্ঠতম)।

শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর উদার প্রশংসায় বিভূষিত এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত 'সেই দেশপ্রেমিক মৌলবী আহমদ শাহ যাঁর পবিত্র নাম সমগ্র হিন্দুস্তান জুড়ে ধ্বনিত হয়েছিল... তাঁর মৃত্যু সংবাদ যেইমাত্র ইংলন্ডে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা এই ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যে উত্তর ভারতে ব্রিটিশের সবচেয়ে দুর্দান্ত শত্রু আর বেঁচে নেই।' এই নিশ্চয়তার সমর্থনে তিনি হোমসের 'ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' (পৃ. ৫৩৯) থেকে উদ্ধৃত করেন। কোনো যন্ত্রণা থেকেই নিজেকে বাঁচাতে চাননি সাভারকার।

হায়দার আলি এবং টিপু সুলতানের মহত্বের দাবিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিপদ সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন পুনার নানা ফড়নবিশ এবং মহীশূরের হায়দার সাহেব।'... ভারতবর্ষে তখন যে নাট্য অভিনীত হচ্ছিল, 'তার নির্বাচিত অভিনেতামণ্ডলীতে ছিল তাঞ্জোরের গদি, মহীশূরের মসনদ, সহ্যাদ্রির রায়গড়, দিল্লির দেওয়ান-ই-খাস।' (পৃষ্ঠা ১৩-১৪)

এই অনুভবে কোনো ভুল নেই : 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম লিখেছেন এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে গর্বিত। মহারাষ্ট্রের অতীত নিয়েও তাঁর গর্ব। যদিও এই মানুষটিই ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের প্রতি দোদুল্যমান একনিষ্ঠতার মধ্যে আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় নিষ্ঠাকে একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। চিত্তাকর্ষক বিষয়টি হলো এই গ্রন্থে অযোধ্যা প্রসঙ্গে একটা গোটা অধ্যায় রয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়)। অবশ্য তাঁর আজকের রাজনৈতিক উত্তরসূরীদের ভণ্ডামির এক কণাও ঐ অধ্যায়ে নেই। সমগ্র বইটি জুড়ে একটাই বার্তা আর তা হলো জাতীয় ঐক্য।

বাজি রাও-এর পুত্র নানা সাহেবের একজন বিশ্বস্ত সংবাদবাহক ছিলেন উজ্জ্বল বুদ্ধির অধিকারী আজিমুল্লা খান। এ কথা গ্রন্থকারই উল্লেখ করেছেন। নীচের অনুচ্ছেদটি থেকে সাভারকারের সেই সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পাঠক বেশ ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন :

> নানান কর্মসূচী ছিলো, প্রথমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে একসঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করা এবং বিনাশকারী অস্ত্রশস্ত্র অপসারিত করে সংযুক্ত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তারপর এই দেশ পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহের কাউন্সিলে তার যোগ্যস্থানটি দখল করবে। তিনি এটিও অনুভব করেছিলেন যে, এরপর থেকে হিন্দুস্তান শব্দের অর্থ হবে, ইসলাম এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের দৃঢ়সংলগ্নতায় গড়ে-ওঠা সংযুক্ত রাষ্ট্র। যতদিন পর্যন্ত মহামেডানরা এদেশে ভিনদেশী শাসক হিসেবে বাস করতো, ততদিনই ভ্রাতৃবোধে তাদের সঙ্গে বাস করার অর্থ ছিল জাতীয় দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেওয়া। তদুপরি পাঞ্জাবের গুরু গোবিন্দ, রাজপুতানায় রাণা প্রতাপ, বুন্দেলখণ্ডে ছত্রসাল এবং মারাঠারা দিল্লির মসনদ দখল করে নিয়ে এই মহামেডান শাসন ধ্বংসও করেছেন। একশ বছর সংগ্রামের পর হিন্দু সার্বভৌমতা মহামেডান শাসনকে পরাজিত করেছে এবং সমগ্র ভারত জুড়ে স্বাধীন সত্ত্বায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন মহামেডানদের সঙ্গে হাতে হাত মেলানো লজ্জার বিষয় তো নয়ই, বরং বিপরীতে, এটি উদার হৃদয়ের পরিচায়ক।
>
> অতএব, এখন হিন্দু এবং মহামেডানদের পারস্পরিক বৈরিতা অতীতের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত। এদের বর্তমান সম্পর্ক মোটেই শাসক এবং শাসিত কিংবা বিদেশী এবং স্বদেশীয় এমন নয়, বরং সরলভাবে এটি ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক যাদের একটাই পার্থক্য তাদের ধর্ম আলাদা। কেননা উভয়েই হিন্দুস্থানের মাটির সন্তান। তারা নামে আলাদা, কিন্তু আসলে তারা সহোদর। ভারত-জননী তাদের সকলেরই মা। আর তাই রক্তসম্বন্ধে তারা পরস্পরের ভাই। নানা সাহেব, দিল্লির বাহাদুর শা জাফর, মৌলবী আহমদ শাহ, খান বাহাদুর খান আর ১৮৫৭-র অন্য সব নেতারা অনেকটা এরকম ব্যাপ্তিতেই এই সম্পর্ককে বুঝতেন। আর সেকারণেই পরস্পরের মধ্যে যে শত্রুতা ছিল, তখন সেটি অযৌক্তিক, এতো মুর্খামি বলে মনে হয়েছিল যে, তাকে সরিয়ে রেখে স্বদেশের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। সংক্ষেপে, নানা সাহেব আর আজিমুল্লাহ-র নীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, হিন্দু এবং মহামেডান উভয়েরই উচিত একজোট হয়ে তাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা। তারপর যখন স্বাধীনতা অর্জিত হবে, তখন ভারতীয় শাসক এবং রাজাদের অধীনে সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা উচিত তাদের (পৃ. ৫৯-৬০)।

বারবার তিনি হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের এই ভাবনায় ফিরে এসেছেন। বারবার এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে দুজনের অবশ্যই ভাইয়ের মতো আচরণ করা উচিত।

অবশ্য অপর আর একটি কারণে হিন্দুস্থানের ইতিহাসের এই পাঁচটি দিন (দিল্লির) চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেটি হলো, গজনীর মামুদের আক্রমণের সময়কাল থেকে হিন্দু ও মহামেডানদের মধ্যে যে অবিরাম সংঘর্ষ চলেছিল, রণবাদ্যের তালে অন্তত কিছু কালের জন্য হলেও সেই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল ঐ পাঁচ দিনে। এই প্রথম ঘোষিত হলো যে, হিন্দু এবং মহামেডান পরস্পরের শত্রু নয়, তারা বিজয়ী ও বিজেতা নয়, তারা একে অপরের ভাই; সুদূর অতীতে যে ভারতমাতা শিবাজী, প্রতাপ সিংহ, ছত্রসাল, প্রতাপাদিত্য, গুরু গোবিন্দ সিং আর মহাদাজি সিন্ধিয়ার বাহুবলে মহামেডানদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, আজকের দিনে এই হলো তার আদেশ। এখন থেকে তোমরা সকলে সমান, সকলেই ভাই, আমি তোমাদের দুজনেরই জননী! ঐ পাঁচ দিন হলো এমন এক সময়কাল যখন হিন্দু ও মহামেডানরা একত্রে ঘোষণা করেছিল যে ভারতবর্ষ তাদের স্বভূমি আর তারা সকলেই ভাই, একত্রে তারা দিল্লিতে জাতীয় স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে ছিল। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে ঐ মহান দিনগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক! (পৃ. ৯৯-১০০)

'ইসলামী চন্দ্রকলা'র যত বেশি প্রশংসা, ততখানি প্রশংসা পেল 'মারাঠী বল্লম' (পৃ. ৭৮)। মুঘলরা বিদেশী শাসক হিসেবেই এদেশে এসেছিল, দেশ শাসনও করেছিল। ১৮৫৭ সবকিছুকেই অতীতের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। সমস্ত ভারতবাসী বাহাদুর শাহকে তাদের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে তাঁর ভবিষ্যতের আশা এবং অতীতের স্মৃতি উভয়ই কল্পিত সব ভুল ভাবনায় উন্মুক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি লিখলেন :

অতীতের মুঘল সাম্রাজ্য এ দেশের সাধারণ মানুষের নির্বাচিত ছিল না। বিজয়ের নামে মহিমান্বিত করে তীব্র বলপ্রয়োগে একে ভারতবর্ষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুঃসাহসী বিদেশী ভাগ্যান্বেষী আর আত্মপর স্বদেশীয়দের একটি শক্তিশালী জোট একে কায়েম রেখেছিল। আজ যে সিংহাসনে বাহাদুর শাহকে বসানো হয়েছে, এটি সেই সিংহাসন নয়। না, কখনোই তা হওয়া সম্ভব নয়, কেননা এমন সিংহাসন কেবল জয় করা যায়, পাওয়া যায় না। তেমন হলে তা আত্মহত্যার শামিল হবে। কেননা তখন তিন চার শতাব্দী ধরে শত শত যে হিন্দু শহীদের রক্তে এটি স্নাত হয়েছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যু থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত কখনো যুদ্ধে সাময়িক বিরতি হয়নি। অগণন বছরের এই রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিমের পর্বত শ্রেণীতে একটি হিন্দুশক্তি উত্থিত হয়েছিল। যে অসংখ্য মানুষ তাদের জাতীয় সত্তার সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন এবং অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেইসব মৃতের লক্ষ্য পূরণের জন্য এই শক্তির উত্থান পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। পুনা থেকে বলিষ্ঠ উদ্যমে অগ্রসর হয়েছিলেন

'যতদিন পর্যন্ত সেই স্বর্গীয় কাল এসে না পৌঁছবে যতদিন পর্যন্ত শেষের সেই শুভক্ষণ কেবল সাধু স্বভাব কবিদের লেখনীতে আর পবিত্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যেই রয়ে যাবে।' যতদিন পর্যন্ত না সর্বজনীন ন্যায় বিচারের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে যাতে মানুষের মন অপরাধময় আক্রমণাত্মক প্রবণতাগুলিকে ধ্বংস করার কাজে ব্যাপৃত থাকতে পারে, ততদিন, বিদ্রোহ, রক্তপাত আর প্রতিশোধ কিছুতেই পাপ হতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত 'কর্তৃপক্ষ' ন্যায্য এবং অন্যায্য উভয়ক্ষেত্রেই 'শাসন' শব্দটি ব্যবহার করবে, ততদিন তার বিপরীতার্থে 'বিদ্রোহ' ন্যায্য এবং অন্যায্য দুই-ই হতে পারে... বিদ্রোহ, রক্তপাত আর প্রতিশোধ, এগুলো অন্যায়ের মুলোচ্ছেদ করে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার কাজে প্রকৃতিরই সৃষ্ট হাতিয়ার মাত্র। ন্যায্য যখন তার মুক্তির জন্য এইসব ভয়ংকর উপায় অবলম্বন করে তখন সে কাজের অপরাধ কখনও তার ওপর বর্তায় না, বরং তার পূর্ববর্তী যে নিষ্ঠুর অন্যায় সমস্ত দোষের ভাগিদার হলো সে...

আর হিন্দুস্থানের সন্তানদের অন্তর এই সেই প্রতিশোধের আগুনে ১৮৫৭ সালে দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছিল। তাদের রাজসিংহাসন ভগ্ন, রাজমুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ, দেশ পর-অধিকৃত, ধর্ম পদদলিত, স্বভূমি ছিন্নবিচ্ছিন্ন, প্রতিশ্রুতি ভাঙার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাতে শুধু তারা প্রতারিতই হয়েছে, অপমান, নির্যাতন একেবারে সহ্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছে গেছে। যে চরম অসম্মানের পঙ্কে তারা নিমজ্জিত তাতে জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ হারিয়ে গেছে। সমস্ত অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ। ব্যর্থ সব আবেদন, অভিযোগ, বিলাপ, চীৎকার। তখন শুরু হয়ে গেল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আর সর্বত্র শোনা গেল ফিসফিসানি 'প্রতিশোধ', 'প্রতিশোধ'। যে অসংখ্য নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ভারতবর্ষ তার প্রত্যেকটি এই প্রতিশোধস্পৃহার ন্যায্যতাকেই প্রতিপন্ন করেছে। এর পরেও যদি কোনো বিপ্লবের আভাস না থাকত, তবে তো আমাদের বলতেই হতো, 'ভারতবর্ষ' মৃত!'...

[এরকম প্রতিশোধ ন্যায্য] বস্তুত এমন এক ভয়ানক অন্যায়ে পীড়িত হবার কারণেও যদি মানুষের স্বভাবের গভীরে ভয়ংকর প্রতিশোধের প্রবণতা না থাকে, তবে মানুষের আচরণে পশুশক্তিকেই সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে এখনো সক্রিয় থাকতেই হবে। আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অপরাধের শাস্তি— তাই নয় কি? (পৃষ্ঠা ২১৭-১৯)

সাভারকার তাঁর জীবন সায়াহ্নে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি 'ইতিহাস' লিখেছিলেন। কিন্তু সেটিও প্রতিশোধের সেই একই আবেগে বাঁধা।[৫] ছটি গৌরবময় যুগ গ্রন্থটি হলো ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার কাহিনী। পড়লে বড় বিষণ্ণ লাগে। টিপু সুলতান 'বর্বর' নামে অভিহিত। বাকি নামগুলির কী দশা তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম' বইটির উল্লেখ করে তিনি লিখলেন, ''এখানে

আমি হিন্দু জাতিরাষ্ট্রের অবস্থান থেকে এই যুদ্ধের পুনর্মূল্যায়ন করেছি।''[৬] এই বিদ্রোহে মুসলিমদের ভূমিকা এবার পুরোপুরি গোপন করা হলো। সাভারকারের বক্তব্য অনুযায়ী, 'মুসলিমরা যা চেয়েছিল পরিশেষে তারা তা পেয়ে গেল; ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কেরা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে জোর খাটিয়েছিল। কেননা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে, এমনকী ১৮৫৭ সাল থেকেই মুসলমানরা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছিল। তারা দেশের বাকি অংশ থেকে মুসলিম-অধ্যুষিত প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে একটি সংযুক্ত ভূমিখণ্ডের দাবি করেছিল। আর এই সাহায্যের মূল্য হিসাবে ইংরেজরা তাদের পুরস্কৃত করতে চেয়েছিল।'

খলনায়কদের এরকম সার বেঁধে ডেকে আনার সময় নায়করাও বাদ পড়েনি। আমাদের বলা হলো যে, কেবলমাত্র হিন্দু মহাসভা একাই দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিল। 'গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দুদের পক্ষাবলম্বী ব্রতধারী এই সব মানুষেরাই শত্রুর সমস্ত স্বৈরাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল অসীম সাহসে, যদিও তখন তারা নেহাত সংখ্যালঘু ছিল। এমনকী হিন্দু রক্তপাতের বদলা নেবার জন্য শত্রুর রক্ত ঝরাতেও পেছপা হননি তাঁরা। হিন্দু স্বার্থের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের কোতল করতেও তারা ছাড়েননি।' সদা সর্বদা কেবল রক্ত, রক্ত আর রক্ত।

অবশ্য এই দু'টি বইকে তাদের পৃথক পৃথক পরিপ্রেক্ষিত এবং গুণাগুণের মধ্যেই বিচার করতে হবে। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত অত্যন্ত সঠিক যখন তিনি বলেন যে,

> ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে সাভারকারের যেকোনো বক্তব্যকে তার প্রেক্ষিত বাদ দিয়ে উদ্ধৃত করা শক্ত। কেননা সমগ্র প্রেক্ষিতই অতি দ্রুত বাতিল হয়ে যাচ্ছে। 'ছটি গৌরবময় অধ্যায়', যেটি আর এস এস প্রচারকদের কাছে বাইবেল, যেখানে বৈদান্তিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষের জন্য সম্রাট অশোককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। টিপু সুলতান, তাঁর ভাষায় একজন বর্বর সুলতান, যিনি মারাঠী এবং ইংরেজদের সম্মিলিত শক্তির কাছে নির্দয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। আর সম্রাট আকবরকে হতেই হয়েছে 'বিদেশী, নিষ্ঠুর, অসহিষ্ণু এবং বিধর্মী'।

বৌদ্ধ এবং শিখরা যদিও নিজেদের হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সম্প্রদায় বলে মনে করে, কিন্তু তাঁর ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ এবং সিকিমিয় দর্শনকে হিন্দুধর্মের একটি সংশ্লিষ্ট শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি বদ্ধপরিকর। দাশগুপ্ত যখন নিচের কথাগুলি লেখেন, তখন তিনি একেবারে মোক্ষম জায়গাটিতেই ঘা দেন,

> ঐ একই গ্রন্থে হিন্দু শহীদ বীর বান্দা বৈরাগীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেও পরিশেষে এই চিরযুবা জাতীয়তাবাদী 'হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানির যোগ্যতম প্রতিশোধ'-এ উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এই প্রতিশোধের চেহারা হলো, 'মুসলিম এলাকা জ্বালিয়ে দেওয়া... প্রখর রৌদ্রে মুসলিম নারী, পুরুষ শিশুদের খালি পায়ে হাঁটানোর বিষয়ে একটা কথাও না বলা... শেষাবধি গোটা পাঞ্জাবকে একটা হিন্দু প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা।'

৩. আন্দামান এবং হিন্দুত্বের উৎস

সাভারকারই একমাত্র মানুষ নন যাঁকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলের বিভীষিকার মধ্যে পাঠানো হয়েছিল। অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তিনি, কিন্তু অন্যান্য বন্দীরাও যেমন তা করেছিলেন, তেমনি মাত্র। তাঁকে ছোট করার জন্যে নয় বরং প্রকৃত তথ্য নথিভুক্ত করানোর জন্য এসব বলা হচ্ছে। তাঁর বিষয়ে একটু জানলেই আর কেউ তাঁর জন্য এতটুকু সহানুভূতি কিংবা দুঃখ অনুভব করবে না।[১] তাঁকে যেন একটা তোষামুদে তেলকলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ আর্কাইভের নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক আর সি মজুমদারের যে গবেষণাকর্ম তাতে দেখা যায় অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এরকম আরো অনেকেই সেখানে ছিলেন।[২]

৪ঠা জুলাই, ১৯১১ তারিখে তাঁকে আন্দামানে আনা হয়। তারপরই দ্রুত, ঐ বছরেই তিনি নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেই আবেদনের বিষয়বস্তু এবং তারিখ পাওয়া যায়নি। অবশ্য সাভারকারের ২৪শে নভেম্বর, ১৯১৩ তারিখের আবেদনপত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বাড়িতে লেখা চিঠিতে দু'টি আবেদনের একটিরও উল্লেখ নেই। তখন তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েনি। কেবল তাঁর উদ্দীপনা কুঁকড়ে গিয়েছিল। এরকম প্রবণতা বার বার দেখা গেছে। তাঁর ভুলে অন্যদের তিনি যেসব কাজ করতে উৎসাহিত করেছেন, সেই কাজের পরিণতির মুখোমুখি তাঁকে যখনই হতে হয়েছে, তখনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এমন প্রবণতা দেখা গেছে। ১৯১৫-১৬ সাল নাগাদ তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করে, এবং শেষপর্যন্ত ১৯১৮ সালে তা ভেঙে পড়ে। ৪ঠা আগস্ট, ১৯১৮ তিনি তাঁর ভাইকে লিখলেন, 'এই হলো জেলের সুবিধার কথা [দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি হবার পর]; কিন্তু আমার শরীরটা যখন তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল, তখন এ সমস্তই আমার সহ্য হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে বলা উচিত যে, এ বছরে বেশ বড়ো বড়ো অনেকগুলো অসুবিধা আমাকে ভীষণ জ্বালাচ্ছে কেননা শরীরটা বেশ ভেঙে পড়েছে'।[৩] কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে, কোনো না কোনোভাবে তিনি কর্তৃপক্ষের এমন অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর মতো একজন 'বিপজ্জনক' বন্দীকে তত্ত্বাবধায়ক (Foreman) করে দেওয়া হলো। হাতে-গোনা সামান্য কজন বিপ্লবীই তাঁদের পরাধীন দেশের শাসকদের কাছ থেকে এরকম 'সম্মান' গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।

সাভারকারের যন্ত্রণাকে কখনই গুরুত্বহীন করে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাঁর আত্মসমর্পণ এবং সমঝোতা কোনো অপরাধের কথাই বাদ দিলে চলবে না। আজ যারা তাঁকে বীর নায়ক হিসেবে গৌরবান্বিত করছেন, তাঁরা প্রথমটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলেন আর দ্বিতীয়টিকে যখন একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না, তখন সেটা ব্যাখ্যা করতে বসেন। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সমগ্র বিষয়টিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন।

> বিনায়ক দামোদর সাভারকার অবশ্যই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী।... অন্যান্য বীর বিপ্লবী যাঁরা চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের মতো তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করেননি কিংবা ভগৎ সিং এবং ক্ষুদিরামের মতো প্রকাশ্য বিরোধিতায় শহীদ হবার পথও বেছে নেননি।
>
> গত শতাব্দীর প্রথম দশকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর তাঁর তেজস্বিতা এমনভাবে ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি একাধিকবার দয়া ভিক্ষা করেছেন... আন্দামানের সেলুলার জেলে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ-করা আরো অনেক বিপ্লবীই ছিলেন। তাঁরা এইরকম দয়া প্রার্থনার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

বীর সাভারকার এ কাজ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক অত্যাচারীদের 'শক্তিমান এবং দয়াবতার' বলে সম্বোধন করে তিনি আর এস এস-এর ব্রিটিশ সহযোগিতার যে ঐতিহ্য তার সূচনা করেছিলেন। তাঁকে দিয়ে যার শুরু, উত্তাল চল্লিশের দশকে আরো অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক বক্তব্যে তার পরিসমাপ্তি। সাভারকারের স্তাবক, মুরলী মনোহর যোশীর পরিচালনাধীন ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণা কাউন্সিল (Indian Council of Historical Research–ICHR) প্রকাশিত 'টুওয়ার্ড্স্ ফ্রিডম সিরিজ'[৪]-এর দু'টি খণ্ডে অখণ্ডনীয় দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে পরবর্তী জটিলতার কাহিনী সর্বসমক্ষে উন্মোচিত হয়েছে। সে দু'টির প্রকাশনা যে কাউন্সিল বন্ধ করে দেবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

১৯১১-১৩ সময়পর্বে এই 'বিপ্লবী'-ই ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সঙ্ঘ পরিবারের সহযোগিতার বীজ বপন করেছিলেন। ভাইসরয় লিনলিথগো-র কাছে তাঁর ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৯ তারিখের প্রস্তাবে তো দেখাই গেছে যে কতটা নীচে নামতে তিনি প্রস্তুত। আর সেটা এমন একটা সময়ে যখন কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পুনরুজ্জীবিত করার উপক্রমণিকা হিসেবে প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'আমার যাবজ্জীবন দীপান্তরের কাহিনী'-র প্রথম মারাঠী সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। দীর্ঘদিন এটি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৪৭ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। বইটি সাম্প্রদায়িক ঘৃণায় টৈটুম্বুর। ১৮৫৭ সাল সম্পর্কিত তাঁর আগের বইটিতে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করার জন্য হিন্দু আর মুসলমানের পরস্পরের কাছাকাছি আসা উচিত। সাভারকারের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এল কখন, কোথায়?

একেবারে নিশ্চিতভাবে বিষয়টি স্থির করা কঠিন। কিন্তু যুক্তির বিচারে এ কথা বলতে পারা যায় যে, অতীতের সঙ্গে বস্তুত কোনো আকস্মিক ছেদ ছিল না। কারণ আগের অধ্যায়েই আমরা দেখেছি, ১৮৫৭ সম্পর্কিত তাঁর বইটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। একথা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, সাভারকার যখন আন্দামানে, গোটা বিশ্বের চোখে যখন তিনি বীর নায়ক, তখন বাস্তবে যে তিনি ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, সেকথা কারোর জানা ছিল না। এমনকী তাঁর সাম্প্রদায়িক বিশ্বদৃষ্টি এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষও সুবিদিত ছিল না। তাৎক্ষণিক আঘাতে নৈতিকতার অধঃপতনই তাঁর আত্মসমর্পণের কারণ। তাঁর মৃত্যুর পর যখন আর্কাইভ ঘেঁটে দেখা হলো, তখনি ১৯১১ এবং ১৯১৩-র আবেদনপত্রদু'টি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হলো। এর আগে সরকার তাঁর ১৯২৪-এর যে মুচলেকাটি প্রকাশ করেছিল, তাঁর এতদিনকার বিপ্লবী ভাবমূর্তির জন্য সাধারণ জনমানসে সেটির প্রতি একটু প্রশ্রয়ের ভাব ছিল। কিন্তু আপাতভাবে তখনো কোনো বাড়তি দলিল, যেমন অনুকূল বিচারের আশায় অতি উৎসাহে তিনি যে শংসাপত্র দিয়েছিলেন কিংবা সাম্প্রদায়িক প্রচারের জন্য হাতেনাতে ধরা পড়ার পর মরিয়া হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন— এর কোনোটিই প্রকাশিত হয়নি। কেবলমাত্র বিশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতে পারা গেল।

জেলে সাম্প্রদায়িক প্রচার

জেলে মুসলিম ওয়ার্ডারদের খারাপ ব্যবহারের কারণেই সাভারকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল, এমন কোনো ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সেটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। অন্যান্য সব বন্দীরাও যন্ত্রণা পেয়েছেন কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এরকম কোনো পরিবর্তন হলো না। বিশেষ করে যেখানে তিনি নিজেই দাবি করেছেন যে, 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডাররা ছিল মুসলমান' এবং 'হিন্দুরা দুরকমে কষ্ট পেতো। প্রথমক্ষেত্রে তাদের সহবন্দী মুসলিমদের থেকে আর দ্বিতীয়ত তাদের মুসলিম ওয়ার্ডারদের থেকে' (পৃ. ৯০-৯১)। বইটির গোটা দ্বিতীয় অধ্যায় 'আন্দামানে "শুদ্ধি" আন্দোলন '-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর ভাষাও অত্যন্ত কর্কশ।

> এই মাটিতেই যাদের জন্ম, তারা হতে পারে পাপী, অপরাধী বা সমাজের দুষ্কৃতিকারী, যাই হোক না কেন, তাদের এই হিন্দুস্থানে থাকতে যদি মূর্খের মতো সময় নষ্ট করা কিংবা শিশুসুলভ আবদার হয়, তবে হাজার বছর ধরে হিন্দু সমাজের এই চোর ছ্যাঁচড় অচ্ছুতদের ইসলামের নামে জিতে নেবার জন্য যে মুসলিম প্রচারাভিযান চলছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে কীভাবে? এরজন্য মুসলমানরা যুদ্ধও বাধিয়েছে, নারীপুরুষকে তলোয়ারের ডগায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, চলেছে লুটতরাজ। সংক্ষেপে এই গণ ধর্মান্তকরণের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্যেই তারা জেহাদ ঘোষণা করেছিল। (পাতা ২৮২-৮৩)

তিনি অভিযোগ করেন, 'অন্যেরা যে খেলা খেলেছে, তার সিকিভাগ খেলতে পারিনি বলে আমরা হিন্দু হিসাবে সাংঘাতিক রকমে হেরে গিয়েছি' (পাতা ২৮৬)। সাভারকার জেলের ভেতরে ও বাইরে একই 'খেলা' খেলেছিলেন। তাঁর দাবি, যে সব বন্দীদের বাইরে সাধারণ লোকজনের সঙ্গে কাজেকর্মে যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া ছিল, তাদের মাধ্যমেই তিনি জেলের মধ্যে এমনকী বাইরেও এ 'খেলা খেলেছিলেন'। 'জেলের ভেতর থেকে শুদ্ধি আন্দোলন বাইরে আন্দামানের স্বাধীন বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল' (পৃষ্ঠা ৩১২)। তিনি ওখানে পৌঁছোবার অল্প কিছুদিন পরেই এই প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল।

> ১৯১৩ সালে আমি আমার শুদ্ধির কাজ শুরু করেছিলাম এবং ঐ বছরেই এর সপক্ষে আমার প্রথম লড়াই লড়ি। সেই সময় থেকে ১৯২০-২১ পর্যন্ত আন্দামানেই ঐ কাজ করি, ১৯২১-২৪ ভারতবর্ষের অন্যত্র আমার কারাবাসের সময় কাজ চালিয়ে যাই এবং ১৯২৪ সালে ছাড়া পাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ঐ একই কাজে লেগে আছি। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, পক্ষপাতহীন বেঁচে-থাকার জন্যই এখনো এ কাজে লেগে রয়েছি। খ্রিস্টান, মুসলমান; ইহুদি কিংবা যাদের বেঁচে থাকার ধরনটাই আদিম, বর্বর— এদের কারোর প্রতিই আমার অন্তরে ঘৃণা নেই। এদের কোনো একজনকেও আমি অবজ্ঞায় বা অপমানে হেয় জ্ঞান করি না। এদের মধ্যে যে অংশটি হিংস্র, যারা অন্যদের প্রতি অত্যাচার করে, আমি কেবল তীব্রভাবে তাদের বিরোধিতা করি। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই শুদ্ধি আন্দোলনই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরস্থায়ী একতার সেতুবন্ধন করতে পারবে আর এতেই সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের স্থায়ী সুবিধা হবে।

এরমধ্যে, যদি সত্যিই কোনো যুক্তি থাকে তবে সেটি অত্যন্ত জটিল এবং প্যাঁচালো। এই তথাকথিত 'শুদ্ধি' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো অদৃশ্য উপায়ে 'স্থায়ী একতা' আনতে পারবে, তা আন্দাজ করা অসম্ভব।

আত্মসমর্পণ এবং সমঝোতা

১৯১৪ সালে শুরু-হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী জার্মানিকে সমর্থন করেছিল। সাভারকারের চোখে পরিস্থিতি ছিল এইরকম :

> ইংলন্ডের বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে তুর্কীর অবস্থানে আমার মনে প্যান-ইসলামীয়দের সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। এই পদক্ষেপে ভারতবর্ষের জন্য বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি। এই যুদ্ধে তুর্কী যে জার্মানির হাত ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত করার ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলতে পারবে এবং ভারতবর্ষের পক্ষে একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, সেটাই আমি আবিষ্কার করলাম। অবশ্য আমার ছকের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল। কারণ তখন ভারতবর্ষ যা যা অধিকার দাবি করবে; ইংলন্ড তার সবকিছু দিতে বাধ্য হবে। কিংবা ইংলন্ড ও জার্মানি যখন

পরস্পরের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন লড়াই-এ যোগ দিয়েছে, তখন দুই মদমত্ত হাতির মধ্যে লড়াই বাঁধলে যেমন হয় তেমনি হবে। এই দুই শক্তিধর পারস্পরিক সাংঘাতিক মোকাবিলায় দলিতমথিত হয়ে যাবে। আর ইংলন্ড এবং জার্মানির হতাবস্থার পরিণতিতে ভারতবর্ষ নিজেই তার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে। হতোদ্যম, ভগ্নপ্রাণ, রক্তাক্ত, দুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকবে। সমস্ত শক্তি যখন নিঃশেষিত, তখন কে জিতল, কে হারল তাতে কিছুই যায় আসে না। আর ঠিক তখনি, যারা এই পরিস্থিতির থেকে লাভের ফসল তুলে নিতে জানে তাদের সামনে আসবে সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু আমার এ ভয়ও আছে যে, দুই-মহাশক্তির মধ্যে এই নোংরা সংঘর্ষে ভারতবর্ষের মুসলিমরা শয়তানির সুযোগ পেয়ে যাবে। আমাদের উদ্যোগ বানচাল করার জন্য রাশিয়ার কূটকৌশলে উত্তর দিক থেকে তাতার মুসলিমদের ডেকে নিয়ে আসবে। (পৃষ্ঠা: ৩৩৯)

এই সবকিছুর মধ্যে সাভারকার তার নিজের জন্য সুযোগ দেখতে পাচ্ছেন :

যুদ্ধের আশু এবং দূরবর্তী সমস্ত ফলাফল বেশ ঠান্ডা মাথায় বিচারবিবেচনা করে আমি আমার নিজস্ব কর্মসূচী স্থির করেছি। একেবারে শুরুতেই এই বিষয়ে ভারত সরকারকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কী ধরনের কর্মসূচী অনুসরণ করবো বলে মনে মনে নিশ্চয় করেছি তার সবকথা পাঠকদের জানাতে পারবো না। সুপারিনটেন্ডেন্ট আমার চিঠি সুপারিশ করতে রাজী হয়েছেন এবং সে চিঠিতে আমি যা লিখেছি তা এরকম : আমি লিখেছি যে আমার মনে হচ্ছে এটা আমার কর্তব্য। ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে, ভারতবর্ষের তথা ইংলন্ড-জার্মানীর পারস্পরিক যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে আমরা যা ভাবি তা জানাতে চাই।

তাঁর আত্মোৎসর্গের শর্তাবলীর পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

সরকার একবার আমাদের আন্তরিকতা প্রমাণের সুযোগ দিক। আমাদের মুক্ত করা হোক যাতে সাধারণ মানুষকে আমরা বোঝাতে পারি, ভারতবর্ষ যে নিগূঢ় শিকলে আবদ্ধ তা ভেঙে ফেলতে ইংলন্ড উৎসুক। আমরা শপথ করছি যে, ভারতীয়রা যাতে বিপুল সংখ্যায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, আমরা তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো। তাহলে আফগানিস্তান এবং তুর্কী শক্তির সাহায্যে উত্তর দিক থেকে ভারতবর্ষে শত্রু প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তাদের প্রতিহত করার শক্তি সেনাবাহিনীর থাকবে। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে তাকে আঘাত করতে যুদ্ধক্ষেত্রের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তাদের এগিয়ে যেতে বলা যাবে। ইংলন্ডের বিজয়ের জন্য এবং ভারতবর্ষকে রক্ষার্থে আমরা এই সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেব। আমি বলছি, আমাদের মুক্তি দিন, ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে এখানকার মানুষের বিশ্বস্ততা আর ভালোবাসা জয় করে নিন। বর্তমান সঙ্কটে সাধারণ ভারতবাসীর

কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সবরকম সহযোগিতা পাওয়া যাবে এ আশ্বাস সরকারকে দেওয়া যাবে। আসুন, এই সুবর্ণ সুযোগ আমরা যেন নষ্ট না করি।

নিজের মুক্তির প্রসঙ্গে সাভারকার ১৪ই নভেম্বর ১৯১৩ যে হীন চিঠি লিখেছিলেন কেবল তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গেই যদি কেউ এই চিঠির তুলনা করে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, সাভারকার যা লিখেছিলেন এইটি তার সবটুকু হতে পারে না। ৩১শে অক্টোবর, ১৯১৪ অটোমান তুর্কী যুদ্ধ সহচর হিসেবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিল। এই খবর আন্দামানে পৌঁছতেই সাভারকার তাঁর পূর্বের প্রস্তাব আবার নতুন করে জানিয়ে দিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যুদ্ধের খবরের জন্য বন্দীদের মধ্যে ঔৎসুক্যের অন্ত নেই, 'যদিও আমি জানি যে, মুক্তি পাবার স্বার্থপর ইচ্ছা ছাড়া তাদের হৃদয়ে এই ঔৎসুক্যের কোনো গভীরতর মূল নেই (পৃষ্ঠা ৩৪৪-৪৫)'। এখানে তাঁর ভণ্ডামি লক্ষ্য করার মতো : সাভারকার নিজে তাঁর মুক্তির জন্য, একান্ত তা না হলে জেলেই একটু অন্তত ভালোভাবে থাকার জন্য (কেবল নিজের থাকা, সব বন্দীদের নয়) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লেনদেনে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু অন্যেরা যদি জেল থেকে মুক্তির চেষ্টা করে, তবে তাদের গায়ে ছাপ মেরে বলা হবে 'স্বার্থপর'।

সাভারকার একটু কায়দা করে নিজের জন্য একটু ভালো ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। তাঁকে ফোরম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হলো এবং মুসলিম বন্দীদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য তিনি একে কাজে লাগালেন।

> কাজেই মুসলমানরা বেশ ভালোকরেই জানতো যে, আমি যখন ফোরম্যান হয়েছি, তখন তাদের কাছ থেকে আমি কী চাই। বিশেষভাবে আমি যে হিন্দুরীতিতে অভিবাদন জানানোর ব্যাপারে খুবই গর্বিত এবং অভিবাদনের সময় যে সব শব্দ ব্যবহার হয় যেমন, 'রাম রাম', 'নমস্কার', 'বন্দে মাতরম' এইরকম আরো অনেক কিছু, তাতেও যে আমার গর্ব সে তাদের জানা ছিল। তেল বিভাগের প্রধান হিসেবে আমার নিযুক্তির খবরে মুসলমান অত্যন্ত সন্ত্রস্ত চিত্তে যে কোনো মূল্যে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যগ্র হয়ে রইল।' (পৃষ্ঠা ৪৯৬)

নিজের এই নিযুক্তিকে তিনি আরো বেশ লাভজনক প্রাপ্তিতে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি যাদের ছাঁটাই করেছিলেন 'তাদের জায়গায় হিন্দু ওয়ার্ডার' নিযুক্ত করলেন। 'তেল-বিভাগের ফোরম্যান হিসেবে শুদ্ধি, সংঘাতের আন্দোলন আরো বিস্তৃত করার জন্য আমার অফিসকে কাজে লাগানো গেল। আন্দামানের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার সূচনা হলো।' (পৃষ্ঠা ৪৯৯) তিনিও হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রচার করতে লাগলেন। গান্ধীজীর ঠিক বিপরীত ভাবনায়[৩] হিন্দীর প্রতি তাঁর ওকালতিতে উর্দুর প্রতি একটা ঘৃণা জড়িয়ে থাকতো।

> আমরা যেমন জার্মান শিখি তেমনি উর্দু শিখতে পারি। কিন্তু মাতৃভাষা হিসেবে, জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দু সংস্কৃতিতে এর কোনো স্থান নেই... যে আন্দামানের মুখে উর্দু ছাড়া আর কোনো ভাষাই ছিল না, যেখানে হিন্দু মেয়েরা বিয়ের

ইঙ্গিত দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'সাদি' শব্দটি উচ্চারণ করতো, হিন্দি বা সংস্কৃতে এর সমার্থক শব্দ জানতো না, এখন তার এই যে পরিবর্তন সেটি বস্তুত অলৌকিক। (পৃষ্ঠা : ৪৯২-৯৩)

তিনি উর্দুকে হিন্দির বিরুদ্ধে একটা হুমকি হিসেবে দেখতেন : কীর ১৯৫০ সালে লিখেছেন— 'গত চল্লিশ বছর ধরে', সাভারকার এই ভাবনা আঁকড়ে ধরেছিলেন যে, 'উর্দুকে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা উচিত।' এবিষয়ে এবং এরকম অনেক বিষয়ে সাভারকারের অজ্ঞতা খুবই বিস্ময়কর। উর্দু ভাষা হিন্দু লেখক এবং কবিদের হাতে যেভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা মুসলিমদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। 'হিন্দুস্তান বা হিন্দু-সংস্কৃতির আধিপত্য এবং নিরাপত্তার প্রসঙ্গে আন্দামানের ভবিষ্যৎ এবং তার গুরুত্ব যদি বাড়াতে হয় তবে আন্দামানে হিন্দি এবং নাগ্‌রিকে আবশ্যিক ভাষা করা উচিত, এইভাবেই সাভারকার এ ক্ষেত্রটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।'[৮] বস্তুত দেশভাগের সময়কাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে উর্দুই ছিল সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা। ভগৎ সিং তাঁর ভাইকে উর্দুতেই চিঠি লিখেছিলেন; গান্ধীহত্যার প্রাথমিক পুলিস রিপোর্ট (FIR) উর্দুতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আন্দামানের সেলুলার জেলের ঐতিহাসিক নথিপত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অন্য কোনো জাতীয়তাবাদীর কথাবার্তা কিংবা হিন্দু বন্দীদের ওপর মুসলিম ওয়ার্ডেনরা খারাপ ব্যবহার করছে এমন কোনো অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে সাভারকারের সাম্প্রদায়িক ভাবধারার পাশাপাশি যখন তাঁর এই 'কথাবার্তা'-র বিষয়টি পড়া হয় তখন অতীত থেকে বর্তমানে সামান্যই বদল বা ছেদ নজরে আসে। মতাদর্শের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাল্পনিক অভিযোগের বন্যা তাঁর এক ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য।

১৪ই নভেম্বর ১৯১৩ সালের চিঠিটি লেখার অল্প কিছুদিন পরেই সাভারকার ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডকের সঙ্গে ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে দেখা করেন। ভাই নারায়ণের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে কিন্তু এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে কোনো আলোকপাত করা হলো না। নারায়ণকে লেখা ৯ মার্চ, ১৯১৫ তারিখের চিঠিতে তাঁর মুক্তির জন্য গণ-আবেদন সংগঠিত করার জন্য আগ্রহ দেখা গেল। সেখানেও তাঁর ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসের চিঠির কথাটা উহ্যই রইল। ১৯১২ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের চিঠিতে তাঁর ১৯১১-র ক্ষমাভিক্ষার আবেদনপত্রটির কোনো উল্লেখ নেই। কিংবা ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪ তারিখে লেখা চিঠিতে ক্র্যাডকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গটি অনুক্ত। একমাত্র ৪ঠা আগস্ট, ১৯১৮ তারিখের চিঠিতে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ ভারতবর্ষের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসচিব এডউইন এস মন্টেগুকে লেখা তাঁর আবেদনপত্রটির উল্লেখ রয়েছে।

> মি. মন্টেগু এবং ভাইসরয়ের কাছে এই মামলার প্রসঙ্গে অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার মতো একটা খোলামেলা বক্তব্য পেশ করেছি। তার প্রধান কথাটা হলো, তাঁরা যখন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রশ্নটি বিচার বিবেচনা করছেন, তখন একটা বিষয়কে স্বীকৃতি না দিলে তাঁদের চলবে না। সেটা হলো,

এখানে যদি একটা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কথা তাঁরা ভাবেন, তবে আমাদের জেলে বন্দী করে রাখলে সে কাজ পুরোপুরি ব্যর্থ হবে এটা তাঁদের বেশ ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

কারার অন্তরালে আচার ব্যবহার

আর সি মজুমদারের 'পেনাল স্টেটমেন্ট ইন আন্দামানস্' বইটিতে আর্কাইভের ভিত্তিতে একটি পূর্ণ এবং তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মজুমদার কোনো সমালোচনা না করেই সাভারকারের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন।* একটিমাত্র ঘটনাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেখানে সাভারকারের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশিমাত্রায় প্রমাণিত। অধ্যাপক মুসিরুল হাসান আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে জানিয়েছেন, 'কে এম মুন্সি এবং আর সি মজুমদার, যারা ভারতীয় বিদ্যাভবনের ধারাবাহিক রচনাগুলির সম্পাদক তাঁরা প্রধানত উগ্র হিন্দু রাজনীতির উন্মত্ততার প্রতিধ্বনি করেছেন, কয়েক শতাব্দীর অত্যাচারী মুসলিম শাসনে ভারতের দুর্ভাগ্যের সন্ধানে ফিরেছেন। কোনো পূর্বসংস্কার ছাড়াই অন্যান্য সংস্কৃতি, তা ধর্মীয় বা আঞ্চলিক বা মতাদর্শগত বা অন্যকিছু যাই হোক না কেন, সেগুলিকে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অধ্যয়ন কিংবা বিশ্লেষণ করার বদলে অনেক সময় গবেষণামূলক উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা ব্যাপৃত থেকেছেন।'[১০]

মজুমদারের বর্ণনা যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাভারকারের ব্যাখ্যা থেকেই নেওয়া হয়েছে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। চরিত্রগতভাবে সাভারকার সংক্রান্ত বিবরণটি চটকদার (পৃষ্ঠা ২৪৭-৫০)। এমনকী সাভারকারের নিজস্ব বর্ণনাটিও কিছুটা সেইরকম :

> যাই হোক না কেন, আমি আপনাকে (ক্র্যাডক) বলছি যে, আমাকে বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা পুরোপুরি আপনার হাতে। এই সবেমাত্র ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে শ্রী গোখলে আবশ্যিক শিক্ষার বিষয়ে একটি প্রস্তাব এনেছেন। এটি যদি সরকার মেনে নেয়, প্রগতির এরকম নানান উদ্যোগে দেশের মানুষকে যদি এমন আশ্বাস দেওয়া যায় যে, তারা একটি জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, তবে কেবল আমিই নই, আমার আর যে সব বন্ধুর গায়ে বিপ্লবী মার্কা এঁটে দেওয়া হয়েছে, তারাও শান্তির পথে পা ফেলতে প্রস্তুত থাকবে। আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করছি যে এখন আমি আপনাকে যা যা বলছি, তাদের ভাবনাও ঠিক সেইরকম।

সাভারকার যে কোনো খড়কুটোই আঁকড়ে ধরতে প্রস্তুত ছিলেন। একজন 'বিপ্লবী'-র লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত একটা আইনের প্রসঙ্গিকতা মোটেই স্পষ্ট নয়। পাঁচ বছর পর, ১৯১৮ সালে, যে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার (রাষ্ট্র সচিব এবং ভাইসরয়ের নামানুসারে) কোনো বিপ্লবীই মেনে নিতে পারেনি, তারই স্তুতিগানে সাভারকার মুখর হলেন। তিনি এই সংস্কারের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

যদি এই সংস্কার পূর্ণাঙ্গকরণে কার্যকরী করা হয় এবং সরকার তার সব বন্দোবস্ত করে, তবে এমন অনেক কিছু ঘটবে, যার ফলে সাংবিধানিক কাঠামোয় ফাটল ধরাতে আর বিপ্লবের দরকার হবে না। তখন বিবর্তনই হয়ে উঠবে আমাদের নীতিবাক্য, মিছিলের স্লোগান। আর দেশের সেই কাজের একজন বিনীত সৈনিক হিসেবে আমি অত্যন্ত সততার সঙ্গে এই সংস্কার সফল করার কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এর অর্থ হলো, একে এমনভাবে কার্যকরী করার বন্দোবস্ত করা যাতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন, মহান এবং গৌরবময় করে তোলার মহান লক্ষ্যে যারা নিয়োজিত, তাদের অনুভবে এই সংস্কার অগ্রগতির সোপান হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আমরা নেতৃত্ব দিতে পারি কিংবা অন্যদের হাতে হাত রেখে আমাদের দেশবাসীর এই নির্ধারিত সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে চলতে পারি। (পৃষ্ঠা ৪৯০)

মজুমদার লিখছেন, 'সাভারকার তাঁর গ্রন্থের বেশ খানিকটা জায়গায় তাঁর সঙ্গে (ক্র্যাডক, ১৯১৩ সালে) কথাবার্তার একটা সারাংশ আবার নতুন করে লিখেছেন। এতে দেখা যায় যে, সাভারকার যখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছেন, তখনো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আগের মতোই রয়েছে।'[১১] দিল্লিতে ফিরে ক্র্যাডক নীচের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করেন :

> সাভারকারের আবেদনটি আসলে ক্ষমাভিক্ষা। তিনি যে কেবল দুঃখ প্রকাশ করেছেন বা অনুতাপ করেছেন এমন কথা বলতে পারা যাবে না। কিন্তু তাঁর আসল কথা হলো, তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছেন। ১৯০৬-১৯০৭ সময়কালে ভারতবাসীর অসহায়তাকেই তিনি তাঁর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ার অজুহাত হিসাবে খাড়া করেছেন। সেই সময়ের পর থেকে সরকার কাউন্সিল, শিক্ষা এবং আরো সব ব্যাপারে অনেক বেশি সহৃদয়তায় পরিচয় দিয়েছে। আর সেকারণেই বিপ্লবী কাজকর্মের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। এই তাঁর বক্তব্য। তিনি বলছেন যে, তাঁকে ক্ষমা করলে এখনো যারা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঠান্ডা করে দেওয়া যাবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে স্থানীয় কাগজে একটা খোলা চিঠি দিতে তিনি ইচ্ছুক এবং ব্যাকুল। এ-বিষয়ে তাঁর যে কোনো আইনী অধিকার নেই, সেটি কেবল আমাদের সদয় বিবেচনাধীন তাও তিনি স্বীকার করেছেন এবং এখান থেকে ভারতবর্ষ কিংবা বার্মার কোনো জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করার আবেদন জানিয়েছেন যাতে সেখান থেকে অন্তত চোদ্দ বছর পর তিনি ছাড়া পাবার নৈতিক অধিকার পান। তিনি আমার কাছ থেকে যে কোনো একটা প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন। তাঁর বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে এমন কোনো সত্য বা মিথ্যা যে কোনোরকম প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করে রাখবো এমন কোনো আশার বাণী তাঁকে শোনাতে বলেছেন। একটা বিষয় আমি পরিষ্কারভাবে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলের

একটা মামুলি বিবৃতিতে তাঁর আগের ইতিহাস মোটেই ধুয়েমুছে যেতে পারে না। তাঁর মামলার যে দিক পুরোপুরি রাষ্ট্রনৈতিক তা বাদ দিলেও, নাসিকে মি.জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডের সাহায্যকারী হিসেবেও তিনি অভিযুক্ত। কুড়িটি ব্রাউনিং পিস্তল পাঠানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। তাঁর ব্যাখ্যা হলো পিস্তলগুলি খুনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়নি। বৈপ্লবিক আন্দোলনকে আরো ব্যাপক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। আমি যখন তাঁকে দেখিয়ে দিলাম যে, পিস্তল দিয়ে বিপ্লব হয় না, পিস্তল দিয়ে কেবল খুনই করা যায়, তখন তিনি আর আমার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না... কাজেই আমি তাঁকে শুধু এই পরামর্শ দিলাম যে, জেলের শৃঙ্খলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেটুকু জীবনের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, তারই মধ্যে, যেসব বই পড়বার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়েছে সেসবের থেকে তিনি তাঁর যন্ত্রণার উপশমের সন্ধান করুন।[১২]

মুক্তি পাবার জন্য তাঁর নিজের এই পদক্ষেপ এবং ফোরম্যান হিসেবে কিছুটা বাড়তি ছাড় জিতে নেওয়া, এসব সত্ত্বেও, অত্যন্ত ঈর্ষাকাতরতায় অন্যান্য আরো যারা কিছুটা সুবিধা পেয়েছিল তাদের সম্পর্কে সাভারকার নানান কথা লিখেছেন। তাঁর দাবি হলো, এইসব রাজনৈতিক বন্দীরা 'তারা (কর্তৃপক্ষ) যা চাইত তাতেই হজুরে হাজির' ছিল আর 'এত অনুগত ছিল— আর স্থূলভাবে কর্তৃপক্ষকে তা দেখানোর দরকার ছিল না' (পৃ. ২৫৭)। মজুমদারের মতো একজন অনুরক্তের পক্ষেও এটা হজম করা সহজ ছিল না: 'এইসব রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে এ একটা গুরুতর বক্রোক্তি। সাভারকারের এই অনুমান কতদূর ন্যায্য তা স্থির করার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। কোনো প্রমাণ বা কোনো ব্যবহারিক উদাহরণ তিনি দেননি।'[১৩]

অন্য একটি ক্ষেত্রে, বন্দীদের ধর্মঘটের প্রশ্নে মজুমদার লিপিবদ্ধ করেছেন যে,

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী নামে একজন সাহসী বিপ্লবী নেতা, মহারাজ নামেই যিনি সাধারণভাবে পরিচিত, সম্প্রতি ৯ই আগস্ট, ১৯৭০ যিনি দিল্লিতে প্রয়াত হয়েছেন, ১৯১৬ থেকে ১৯২০ এই সময়কালে তাঁর দেওয়া সেলুলার জেলের বন্দীজীবনের একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ রয়েছে। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত তিনি আন্দামানে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'জেলে তিরিশ বছর' এই স্মৃতিচারণায় চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন যে, সাভারকার এবং তাঁর ভাই গণপত, তিনিও তখন জেলে ছিলেন, এঁরা গোপনে তাঁকে এবং অন্যান্যদের ধর্মঘটে উৎসাহ দিতেন কিন্তু নিজেরা কখনো যোগ দিতেন না।

মজুমদারের দৃষ্টিতে এটি 'অন্যায় কুবাক্য'। সাভারকারের ব্যাখ্যাকে তিনি পুনরায় উপস্থাপিত করেছেন।

আমি যদি তাদের নেতৃত্ব দিতাম, তাহলে মি. বারী এবং উপরতলার কর্তারা আমাকে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে যেগুলো ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ পেয়ে যাবে। জেলের নিয়ম অনুযায়ীই আমাকে এবং পুরোনো রাজনৈতিক বন্দীদের এরকম কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ওরা

আমাকে তখন নির্জন কারাবাসে পাঠিয়ে দেবে... কাজেই আমাদের মধ্যে অল্পবয়সী এবং উৎসাহী যারা আছেন, তাদের-ই এ ভার নিজেদের কাঁধে নেওয়া উচিত। এছাড়া শতাধিক অন্যান্য লোকজন অবশ্যই বিক্ষোভ এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য কার্যসূচীতে শামিল হবে। এর থেকে আমার সরে থাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, তাহলে আমাকে আর ভারতবর্ষে চিঠি পাঠাতে দেওয়া হবে না। গোটা বছরে যাকে কোনো শাস্তি দিতে হয়নি, কেবলমাত্র তাকেই বছরে একটা করে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়। এটাই নিয়ম। আমি যদি শাস্তি পাই কিংবা ধর্মঘটে যোগ দিই, তাহলে আমার সেই অধিকারও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। আর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া যে কেবল ধর্মঘটের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে তা নয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য কাজ করার সুযোগ আমি হারাবো।

এতেও মজুমদারে বিতৃষ্ণা হলো না। বরং, বিপরীতে এতে ঐতিহাসিকের ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে উঠল :

> এই ব্যাখ্যায় যে কেউ যা কিছু ভাবতে পারে, কিন্তু এই মহান দেশপ্রেমিক নেতার অকপটতা এবং আন্তরিকতায় গভীরভাবে অভিভূত না হওয়া খুব শক্ত। রাজনৈতিক বন্দীদের অপেক্ষাকৃত তরুণ অংশটি এই ব্যাখ্যায় কতটা প্রভাবিত হয়েছিল সেটা বলা শক্ত। তবে এদের একটা অংশ যে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিল না, চক্রবর্তীর মন্তব্যে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যাই হোক, তরুণতম গোষ্ঠী তাদের কর্মসূচীতেই লেগে রইল এবং সাধারণ ধর্মঘট চালিয়ে গেল।

সাভারকারের চেয়ে প্রবীণ এবং সাহসী বন্দীরাও যে কেমনভাবে অনশন ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সাভারকারের নিজস্ব প্রামাণিক তথ্য মজুমদার উদ্ধৃতি করেন :

> এদের মধ্যে একজন ছিলেন ষাট বছর বয়সী শিখ রাজনৈতিক বন্দী সর্দার মোহন সিং। আরেকজন পাঞ্জাব থেকে আগত অত্যন্ত উৎসাহী এক রাজপুত যুবক, নাম পৃথ্বী সিং। এককণা খাবার ছাড়াই বারো দিন তাঁরা জেলকুঠুরিতে বন্দী ছিলেন। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাঁদের লিখিত বিবৃতি নিতে এবং তা মানতে স্বীকৃত হলেন। এতে ধর্মঘটীদের সমস্ত দাবিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।... কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিবৃতি গ্রহণ করার পর শিখ মোহন সিং ধর্মঘট তুলে নিলেন, কিন্তু পৃথ্বী সিং আরো দু'সপ্তাহ চালিয়ে গেলেন।[১৫]

একজন সত্যিকারের বিপ্লবী আর একজন ভেকধারীর মধ্যে জাজ্বল্যমান বৈপরীত্য। সাভারকারের আন্দামানে অবস্থানের সমস্ত নথিপত্র অত্যন্ত অস্বস্তিকর। অবশ্য ঘটনাচক্রে যখন রত্নগিরি জেলে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হলো, তখন আরো— আরো খারাপ কিছু ঘটল। ৬ই জানুয়ারি, ১৯২৪ তারিখে সেই অসম্মানজনক মুচলেকাটি তিনি দিলেন। সাধারণের কাছে সেটি তখন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষণিক আভাস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। অনেক বছর পরে অতীত তথ্যানুসন্ধানী আবিষ্কার সেই গোপনীয়তা থেকে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিল।

৪. হিন্দুত্ব বনাম হিন্দুধর্ম

'বলতে পারো, খুঁজেপেতে যেমন সঙ্গী বাছো তার নেশাতেই বেহেড হয়ে থাকো'— এই বলে শুরু হয় বেঞ্জামিন বাট-এর একটি গান। শক্তিনেশায় মদমত্ত একটি রাজনৈতিক দল তাদের উন্মত্ততার মুহূর্তে কোন মানুষকে বীর নায়ক বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে, তা থেকেই দলটিকে বিচার করা যায়।

সাভারকার একেবারেই ধর্মীয় মৌলবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন এমন একজন যাঁকে বিপান চন্দ্র 'পেশাদার নাস্তিক' বলে অভিহিত করেছেন। ধর্ম বিষয়ে সাভারকারের কোনো আগ্রহ ছিল না। ধর্মীয় মৌলবাদীরা তাঁর ধর্মের অপব্যাখ্যা করেছে; তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শেষপর্বটি সুরক্ষিত করার জন্য এর বাণীকে বিকৃত করেছে।[১] সাভারকার কখনই হিন্দুধর্মের অপব্যাখ্যা করেননি। তিনি একে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর রাজনীতির শেষ পর্বে প্রয়োজনে তিনি কখনো ধর্মীয় বাণী বিকৃত করেননি। ঘৃণা এবং প্রতিশোধের উদ্দীপনা সঞ্চারিত করার জন্য মনগড়া অতীত ভুলের ভিত্তিতে তাঁর রাজনীতি। আর এই রাজনীতির কাজে ব্যবহারের জন্য তিনি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন।

হিন্দুত্বের জন্য স্বঘোষিত এক ধর্মযুদ্ধে ১৯৯০ সালে সাভারকারের ভক্ত এল কে আদবানি যে যাত্রা শুরু করলেন, সেটি অমোঘ পরিণতিতে ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে শেষ হলো। বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ ভূপালে ১৪ই এপ্রিল ২০০০-এ সমস্ত ভণ্ডামী দূরে সরিয়ে ফেলে স্বীকার করলেন যে, রাম জনমভূমি আন্দোলন 'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পুরোপুরি রাজনৈতিক, এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই'।[২]

হিন্দুত্ব বলতে সংক্ষেপে কী বোঝায়? আর ভারতবর্ষের মানুষের জন্য কী এমন সোনার খনি সে এনে দেবে? হিন্দুত্ব কেবল সংখ্যালঘুদের স্বার্থবিরোধী নয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং জীবনযাপন এটি ধ্বংস করে দেবে। নিশ্চিতরূপেই এটি হিন্দুধর্মের সমার্থক শব্দ নয়। বিজেপি-র ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে 'হিন্দুত্ব বা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর কথা বলা হয়েছে এর ফলে সাভারকার এবং গোলওয়ালকর যাকে 'অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই ধারণাটি বাতিল হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদ হিসেবে এটিই গোটা বিশ্বের পরিচিত। জন্মলগ্ন থেকে কংগ্রেস একেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে : ভারতবর্ষের এলাকার মধ্যে যে মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে, জন্মসূত্রেই সে ভারতীয়। গান্ধী এবং নেহরু এই

ধারণাকেই সমৃদ্ধ করেছেন। এর সঙ্গে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং 'মিশ্র সংস্কৃতির' ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা সকলেই নিজ নিজ অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্মিলনে একই জাতি, ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বস্ততার অটুট বন্ধনে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা পড়েছি।

একই অনুসঙ্গে 'অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ'-এর এই ধারণাটি বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি 'মিশ্র সংস্কৃতি'-র ধারণাটিও বাতিল করে দেয়। বিজেপি তার নির্বাচনী ইস্তাহারে (১৯৯৬ সেই সঙ্গে ১৯৯৮) ঘোষণা করেছিল, 'বিজেপি এক দেশ, এক জাতি এক সংস্কৃতি'-তে বিশ্বাসী। অতি আড়ম্বরে এই যে 'এক সংস্কৃতি'-র কথা বলা হলো, সেটিই 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের' প্রাণকেন্দ্র। পাঠক নিশ্চয়ই এখন এর আমদানির ব্যাপারটা বুঝে নিতে ভুল করবেন না— এটিই হলো হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ১৯৯৮ সালের ইস্তাহারের এই অংশটি আরো প্রাঞ্জল— 'আমাদের জাতীয় পরিচয়, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'। যথেষ্ট সোজা সরল ভাষায় বলা হচ্ছে যে, 'ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ... হিন্দুত্বের মর্মবস্তু।'

অযোধ্যা আন্দোলনকে যে এই মতাদর্শের সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 'মনের গভীরে এমনই এক সুপরিকল্পিত ভাবধারার কারণেই, অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দির স্থাপনার জন্য যে রাম জন্মভূমি আন্দোলন, তাতে বিজেপি যোগ দিয়েছিল... ভারতীয় চেতনার অন্তস্তলেই শ্রীরামের অধিষ্ঠান।'

১৯৮৪ সালের ১৯শে আগস্ট এই আন্দোলন শুরু করেছিল ভি এইচ পি (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ)। এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই মুম্বাই-তে আর এস এস এটির পরিকল্পনা করেছিল।[৫] 'রাম জন্মস্থান হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে হবে' এই দাবির ভিত্তিতে পালামপুরে জাতীয় কর্মসমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করার পরেই, বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ই জুন, ১৯৮৯ এই আন্দোলনে যোগ দিল। স্বাধীন ভারতে সম্ভবত এই প্রথম কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক পার্টি দলগতভাবে একটি সাম্প্রদায়িক পথ গ্রহণ করল। বিজেপি-র ক্ষেত্রে এটি তার অনুসৃত পথেরই উপযুক্ত।

আর কয়েক মাস পরেই লোকসভার নির্বাচন। এই বিশেষ দাবিতে ১৯৯০ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটান হলো। এল কে আদবানি তাঁর রক্তস্নাত রথযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তাঁর সোমনাথ-অযোধ্যা রথযাত্রার প্রাক্কালে তিনি বললেন, 'মতাদর্শভাবে একমাত্র এই বিষয়েই আমি অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছি। সব রাজনৈতিক দলই একই ভাবনার শরিক।' বিষয়টি বেশ পরিষ্কারভাবেই সংজ্ঞাত। রামজন্মভূমি কোনো বিষয় নয়। এটি ছিল 'হিন্দুত্বের সুরক্ষায় এবং মেকী-ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে ঘোষিত এক ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড)।' ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় এই আন্দোলন তার সাফল্যের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করল। যাইহোক, বিজেপি-র ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালের নির্বাচনী ইস্তাহার, তার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা আর. এস. এস-এর গর্বিত উচ্চারণ বিস্মৃত না হয়ে ঘোষণা করলে যে, অযোধ্যার প্রচারাভিযানেই তার প্রকৃত

উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ নেই। এর উদ্দেশ্য হলো ভারতের গোটা রাজনীতিকেই নতুন ছাঁচে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারা আর নৈতিকতার স্থলে হিন্দুত্বের একচেটিয়া ও বিষাক্ত বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপিত করা। কাজেই হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। সংবিধানের অন্তস্তল থেকে তার গণতান্ত্রিক উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িক বিষয়বস্তুকে অপসারিত করলে কেবল তার বাইরের খোলসটুকু পড়ে থাকবে। আর সেই মতাদর্শগত পথনির্দেশ অধিক মাত্রায় সাভারকারের কাছ থেকেই পাওয়া গেল।

স্বরাজ্য এবং হিন্দুত্ব

কয়েক দশক আগে কংগ্রেসের স্বাধীনতার ধারণায় বিপথগামী না হবার জন্য সাভারকার হিন্দুদের সাবধান করেছিলেন :

> একখণ্ড জমি যার নাম ভারতবর্ষ, তারই নিছক ভৌগোলিক স্বাধীনতার সঙ্গে কখনও প্রকৃত 'স্বরাজ্য'কে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলা উচিত নয়। হিন্দুদের কাছে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা কেবলমাত্র তখনি মূল্যবান হয়ে উঠবে যদি সেখানে 'তাদের হিন্দুত্ব'— তাদের ধর্মীয়, জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়-এর নিশ্চয়তা থাকে। হিন্দুদের কাছে স্বরাজ্যের অর্থ অবশ্যই কেবলমাত্র সেই রাজ্য যেখানে তাদের সত্য, তাদের হিন্দুত্ব নিজেদের অধিকারেই ফলে কায়েম রাখতে পারা যাবে; অ-হিন্দু জনগণ, তারা ভারতীয় ভূখণ্ডের বাসিন্দা হোক বা না হোক তাদের বাড়তি চাপ সইতে হবে না।[৫]
>
> তাঁর অনুগামীদের একজন বললেন যে, নিজেদের দেশ থেকে পালিয়ে এসে এদেশে আশ্রয় চেয়েছিল যারা কিংবা ভয়ে বা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নিজেদের মহান পথ পরিত্যাগ করে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশধর অথবা বর্বর অনুপ্রবেশকারীদের উত্তরসূরী যারা, যাদের পূর্বপুরুষ আমাদের পবিত্র ভূমিকে নষ্ট করেছে, পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছে, হিন্দুরা কখনোই সেইসব মানুষের সঙ্গে যৌথভাবে দেশের মালিকানা গ্রহণ করতে পারে না... এ দেশ কখনো তাঁদের দেশ হতে পারে না। যদি তাদের এ দেশে বাস করতে হয়, তবে হিন্দুস্তান যে শুধুমাত্র হিন্দুদের, আর কারোর নয়, এই কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েই তাদের থাকতে হবে।[৬]

আদবানি ও বাজপেয়ীর মতো সাভারকার-অনুগামীরা অতটা অকপট নন। তবে তাঁদের প্রতিজ্ঞায় কোনো কমতি নেই। নেহরুকে তাঁরা গালমন্দ করেন। কিন্তু তাঁদের আসল লক্ষ্য হলো গান্ধী। নেহরু ছিলেন তাঁর অনুগত শিষ্য। নেহরু হলেন সেই মানুষ যাঁকে গান্ধী নিজে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে অভিষিক্ত করেছিলেন। গডসের বুলেট গান্ধীকে হত্যা করল। গান্ধী দর্শনের যে ঐতিহ্যকে পরম ভালোবাসায় নেহরু লালন করেছিলেন, বছরের পর বছর যাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছিলেন, সাভারকার এবং সঙ্ঘ পরিবারের নানান শাখা সংগঠন সেই ঐতিহ্যকে পুরোপুরি সমাধিস্থ করতে চায়।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের নামে এখন বাস্তবিক 'সাংস্কৃতিক হত্যা'-র প্রচার চলছে, কারাবাস কালে একজন মারাঠা ছদ্মনামে রচিত এবং ১৯২৩ সালে প্রকাশিত সাভারকারের রচনা 'হিন্দুত্ব' থেকে ক্ষতিকর প্রচার উজ্জীবিত হলো।'[৭]

রাজনৈতিক ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই সাভারকার প্রয়াত হলেন। চল্লিশ দশকের প্রথমেই ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি এবং তাঁর হিন্দু মহাসভার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আর এস এস সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তাঁর মতাদর্শকে আত্মসাৎ করায় সেটি আবার নবজীবন লাভ করল। গোলওয়ালকরের 'আমরা অথবা আমাদের সংজ্ঞায়িত জাতিসত্তা' গ্রন্থটিতে (১৯৩৮) এটি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়। ৬ই মে, ২০০২ রাজ্যসভায় বাজপেয়ী যা বলেছিলেন তা ভুল। তিনি বলেছিলেন, বইটিতে গোলওয়ালকরের ব্যক্তিগত মতামত উপস্থাপিত হয়েছে।[৮]

১৯৭৮ সালে নাগপুরের জেলা জজের সামনে নথিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক আইনী দলিলে সংগঠন হিসেবে আর এস এস এই বইটি উদ্ধৃত করেছে।[৯] কীর লিপিবদ্ধ করেছেন, '১৫ই মে, ১৯৬৩ মুম্বাইতে এক বক্তৃতায় গোলওয়ালকর বলেন যে, সাভারকারের মহান রচনা 'হিন্দুত্ব'-এর মধ্যে তিনি জাতীয়তাবাদের নীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখতে পেয়েছেন। তাঁর কাছে, এটি ছিল একটি পাঠ্য, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।'[১০] এই উপলক্ষ্যেই গোলওয়ালকর সাভারকারে দাদা বাবারাও (জি.ডি.) সাভারকার রচিত 'রাষ্ট্র মীমাংসা' গ্রন্থটির কাছেও তাঁর ঋণের কথা স্বীকার করেন। গোলওয়ালকর রচিত 'চিন্তামালা'[১১] (Bunch of thought) হিন্দুত্বের গভীর ভাবনায় প্রতিফলিত। 'অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ'-এর নিন্দায় একটি সমগ্র অধ্যায় নিয়োজিত। আর এস এস ১৯৭৮-এর দলিল এই রচনাটির ওপরেও নির্ভরশীল। গোলওয়ালকর নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 'বীর সাভারকার 'হিন্দুত্ব' নামে একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করছিলেন এবং হিন্দু মহাসভা হিন্দু জাতীয়তাবাদের সেই বিশুদ্ধ দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।'[১২] ১৯৯৬ সালের পর থেকে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে এবং ১৯৯০ সালে আদবানি নিজে যে দর্শনের ওকালতি করেন, সংক্ষেপে তার চেহারা এইরকম। কিন্তু এই দর্শনের প্রকৃত উদ্গাতা সাভারকার এতদিন পরে এই সেদিন ২০০২ সালে সমাদৃত হলেন।

হিন্দুত্বের একজন ভক্ত স্বপন দাশগুপ্ত, তাঁর অতুলনীয় বোধের নিরিখে নিজেদের বৌদ্ধিক পথপ্রদর্শকের প্রতি সঙ্ঘ পরিবারের এই সুদীর্ঘ অবহেলার প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করেছেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঠিক পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তিনি যা লিখেছিলেন তা হলো এইরকম :

> আধুনিক হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে সাভারকারের ক্রমান্বয়ী প্রাসঙ্গিকতায় প্রকৃত রাজনৈতিক সাম্রাজ্যে তাঁর অগাধ ব্যর্থতার কেবল ক্ষতিপূরণ হয়নি, তার অতিরিক্ত কিছু ঘটেছে। বিজেপি বা আর এস এস— কেউ-ই বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, লোকমান্য তিলক এবং শ্রী অরবিন্দ থেকে শুরু করে গুরুজী গোলওয়ালকর এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের কাছ থেকে আহৃত যে বৌদ্ধিক পরম্পরা তার প্রতি বিশেষ জোর

দিতে না চাওয়ায়, এই বিষয়টি যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। অবশ্য ১৯২৩ সালে রচিত সাভারকারের বিখ্যাত ইস্তাহার 'হিন্দুত্ব' হিন্দুজাগরণের যে কোনো তাত্ত্বিক নির্মাণের সূচনাবিন্দু হয়ে রয়েছে। সাভারকারকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটিই তাঁর স্বকৃত ভাষ্য।

... আত্মিক বিমূর্ততার প্রতি হিন্দুদের যে বিশেষ দুর্বলতা, তার থেকে যেমন সাভারকার হিন্দুত্বকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিসত্তার সংজ্ঞা নিরূপণে অত্যন্ত নিরপেক্ষ রইলেন। একটি বিখ্যাত সংজ্ঞায় তিনি লিখলেন, 'একজন হিন্দু বলতে বোঝায় একজন মানুষ যিনি সিন্ধু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষের এই ভূমিকে তাঁর পিতৃভূমি হিসেবে শ্রদ্ধা করেন, সেই সঙ্গে এটি তাঁর পূণ্যভূমি অর্থাৎ তাঁর ধর্মের শৈশব-রঙ্গভূমি।'

সাভারকারের মতো একজন মানুষ যিনি তাঁর ভক্তিহীনতা এবং যুক্তিবাদিতা অত্যন্ত আড়ম্বরেই প্রকাশ করতেন, তিনিই আবার পূণ্যভূমির সংজ্ঞায় প্রথাগত ধর্মের সঙ্গে এমন গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেলেন, সত্যিই বিস্ময়কর। হিন্দুত্বের বিপরীতে তাঁর 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ। খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের এখানে জাতিসত্তা-সীমার বাইরে রাখা হয়েছে। তাদের সামনে এই জাতিগত পরিবর্তনকে আটকাবার একটাই রাস্তা হিন্দু গোষ্ঠীতে পুনর্ধর্মান্তকরণ— এমন বিশ্বাসের সঙ্গে সংজ্ঞাটি বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাতে যেটি প্রতিভাত হয় তা হলো, সাভারকার তাঁর সমসাময়িক হিন্দু জাতীয়তাবাদকে যথার্থ এবং অযথার্থ উভয় স্তরেই এক বিস্ময়কর মাত্রায় প্রভাবিত করেছিলেন।[১৩]

সাভারকারের হিন্দুত্ব থেকে আর এস এস-এর 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণাটি ভিন্ন— দাশগুপ্তের এই ভাবনাটি ভুল। বিজেপি নিজে এদের সমার্থক মনে করে। অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন যে, '৬ই ডিসেম্বরের পরেও যে বদ্ধমূল মুসলিম-বিরোধী প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেছে, এই পূণ্যভূমি বিষয়ে সাভারকারের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সেই প্রবণতাকে পরোক্ষে বৈধ প্রতিপন্ন করেছে।'

দাশগুপ্ত এক শ্রেণীর ঘৃণা বিবর্জিত 'সংস্কৃতিবান হিন্দুত্ব'-এর জন্য বিলাপ করেছেন। এরকমভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টায় তিনি একলা নন। বাজপেয়ীও এই প্রচেষ্টায় একেবারে দুঃসাহসিক, যাকে বলে মর্মস্পর্শী কর্মটি করে বসলেন। ২৭ শে মার্চ, ২০০২, তিনি বললেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দুত্বের কথা বলেন, তখন কেউ তাকে সাম্প্রদায়িক বলতে পারে না।' কিন্তু কেউ কেউ 'এমনভাবে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দেন যে মনে হয় এর থেকে দূরে থাকাই ভালো'।[১৪] তারপর আবার ৬ই মে, তিনি বললেন, 'আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্বকে মানি। কিন্তু আজকাল যে ধরনের হিন্দুত্বের প্রচার চলছে সেটি ভুল এবং এতে উদ্বিগ্ন হবারই কথা।'[১৫]

যে সত্যটি বাজপেয়ী নিঃসন্দেহে জানতেন তা হলো, স্বামী বিবেকানন্দ আদৌ হিন্দুত্বের

কথা বলেননি। হিন্দুধর্মের স্বাতন্ত্র্যতাই ছিল তাঁর আলোচ্য। ঘৃণাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবার জন্য ১৯২৩ সালে 'হিন্দুত্ব' শব্দটিকে যিনি 'উদ্ভাবন' করেছিলেন, তিনি সাভারকার।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেন যে, 'পূর্ববর্তী যেসব জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদগণ ইন্দো-ইসলামীয় অতীতকে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি অংশ বলে দাবি করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।' ঘৃণাভরে তিনি লেখেন যে, 'তাঁকে নিজেদের লোক বলে দাবি করার স্পর্ধা ভি এইচ পি-র হয় কী করে।' তিনি বিতর্কে অবতীর্ণ হন, 'একদল মানুষ যারা প্রতিশোধ স্পৃহায় এমন উন্মত্ত যে মূর্খের মতো অন্য একদলের আরাধনাস্থল ভেঙে ফেলতে পারে, তাদের মতাদর্শের পূর্বসূরী ছিলেন তিনি (বিবেকানন্দ) একথা কল্পনা করা কঠিন।'[১৬] এই হিন্দুত্ব পরিকল্পনাটি-র বৌদ্ধিক আদিপুরুষ মোটেই বিবেকানন্দ নন, তিনি হলেন সাভারকার। আন্ডারসন এবং দামলে লক্ষ্য করেন যে, 'তাঁর ভাবনায় (আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়ার) একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল... হিন্দুরা ছিল একটি জাতি এই গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সাভারকারের হিন্দুত্ব।'[১৭] আর কী লিপিবদ্ধ করেন যে, 'রত্নগিরিতে সাভারকারের কাছে প্রথমদিকে যে দর্শনপ্রার্থীরা এসেছিলেন, তাদের একজন ছিলেন আর এস এস-এর মহান প্রতিষ্ঠাতা ড. কে বি হেডগেওয়ার। রত্নগিরির শহরতলিতে অবস্থিত শিরগাঁও গ্রামে ১৯২৫ সালে তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল।' তখন সবেমাত্র 'হিন্দুত্ব' প্রকাশিত হয়েছে। আর এস এস-এর 'সূচনাপর্বের আগেই' হেডগেওয়ার 'এই সংগঠনের বিশ্বাস, গঠন এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে সাভারকারের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন।'[১৮]

শব্দটির উৎস সন্ধান

সাভারকারের চিন্তা সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য আমাদের তাঁর গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া উচিত। এর ফল যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তেমনটি কেন হলো তার একটা ব্যাখ্যা রয়েছে এখানে। 'হিন্দুত্ব' একটি সহজবোধ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘৃণার মতাদর্শ উপস্থাপিত করে। আপন দৃঢ়তায় এটি সমস্ত সন্দেহকে নিশ্চল করে দেয় এবং আত্মবিশ্বাস যোগায়।

এই রচনাটির প্রকাশক এস এস সাভারকার এর দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকায় ব্যক্ত করেন যে, ১৯০৬ থেকে ১৯১০ ইংলন্ডে থাকাকালীন সময়ে, কাকে সংক্ষেপে 'হিন্দু' বলা যেতে পারে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণতায় বীর সাভারকারজীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল (পৃ. i)। তাঁর সেই তরুণ বয়সে, সাভারকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আন্দামানেই তিনি প্রাথমিক লেখালেখি শুরু করেন। রত্নগিরি জেলে এটি চূড়ান্ত রূপ পায় এবং বাইরে প্রচার হয়ে যায়। 'একজন মারাঠা' এই ছদ্মনামে লেখা প্রথম সংস্করণ নাগপুরের এক আইনজীবী ভি ভি পেলকার প্রকাশ করেন। আমাদের বলা হয়েছে যে, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং আরও অনেকে একে 'হিন্দু মতাদর্শের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান হিসেবে' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। (পৃ. vii)

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক এস. এস. সাভারকার এই বিষয়টিতে জোর দিয়েছিলেন যে, রচয়িতা ভি ভি সাভারকার

> 'হিন্দুত্ব' (Hindutva), 'হিন্দুয়ানা' (Hinduness), 'হিন্দুরাজ' (Hindudom) এইরকম কিছু নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। জাতীয় ভাবনার মধ্যেই যেসব সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় অবস্থানে কেবলমাত্র হিন্দু জনগোষ্ঠীকে পুরোপুরি চিহ্নিত করা যায়, সেগুলিকে তাদের সমগ্রতায় প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই উদ্ভাবন। সুতরাং এই সংজ্ঞার অর্থ কখনোই হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নয়। এটি 'হিন্দুত্ব'-এর সংজ্ঞা, 'হিন্দুয়ানা'-র সংজ্ঞা। এটি বহির্দৃষ্টিতে অবশ্যই জাতীয় চরিত্রের এবং হিন্দু জনতাকে এটি একটি হিন্দু-রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য করে। একটি নতুন মতাদর্শ, 'হিন্দু-রাষ্ট্রে'র মতাদর্শ—তারই প্রয়োজনে এল একটি নতুন শব্দ 'হিন্দুত্ব'। (পৃ. iv)
>
> গ্রন্থটির একাংশে 'হিন্দুত্ব হিন্দুধর্মের থেকে পৃথক' এই শিরোনামে লিখিত নিবন্ধে লেখক প্রকাশকের অনুভূত জ্ঞানকে অনুমোদন করেন। সাভারকার লিখেছেন হিন্দুধর্ম বা হিন্দুবাদ (Hinduism) বলতে অস্পষ্টভাবে যা ইঙ্গিত করা হয়, হিন্দুত্ব তার সঙ্গে সদৃশ নয় এটুকু উল্লেখই যথেষ্ট। 'বাদ' বলতে সাধারণত কোনো আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় মতবাদ বা ব্যবস্থার ভিত্তিতে নির্মিত মোটামুটিভাবে কোনো একটি তত্ত্ব অথবা সংকেত বোঝায়। কিন্তু হিন্দুত্বের আবশ্যকীয় তাৎপর্যটি যখন অনুসন্ধান করি, তখন আমরা প্রাথমিকভাবে— এবং নিশ্চিতরূপে প্রধানত কোনো বিশেষ তাত্ত্বিক কিংবা ধর্মীয় গোঁড়া মতবাদ বা ধর্মমতের বিষয়ে বিচারবিবেচনা করি না। ভাষার এই গোলমেলে ব্যবহার যাতে না আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়, তাই হিন্দুধর্মের একেবারে গা-ঘেঁষা হিন্দুত্বের চেয়ে অবশ্যই অনেক ভালো একটি শব্দ হতে পারে হিন্দুয়ানা। (পৃ. ৪)

দ্বিজাতি তত্ত্ব :

'হিন্দু, একটি জাতি'— এই অংশটি সেই ১৯২৩ সালে সাভারকারকে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা করে তুলল। ঘৃণা আর বিদ্বেষে ভরা এই অনুচ্ছেদটি ধরা যাক :

> শত্রুর সঙ্গে যা কিছু আমাদের সাধারণ সাদৃশ্য, তার সবগুলিই আমাদের শত্রুর বিরোধিতা করার শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। যে শত্রুর সঙ্গে আমাদের কোথাও কোনোভাবে এতটুকু সাধারণ মিল নেই, তার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ঠিক যেমন, যে বন্ধুর প্রায় সবকিছুকেই আমরা মনে মনে প্রশংসা করি, মূল্য দিই, সেই বন্ধুকেই বোধহয় আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারি। অন্যায়ের একটি তিক্ত অনুভব গড়ে তোলা প্রয়োজন, প্রয়োজন চিরস্থায়ী প্রতিরোধের শক্তি জাগিয়ে তোলা। বিশেষত এই ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদ আর অহিংসার অহিফেনে আচ্ছন্ন হয়ে এমনকী অন্যায়, পাপ আর অত্যাচারের প্রতিরোধ করার গুণও আমাদের হারিয়ে গেছে সেখানে

> এই উজ্জীবনের কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারা যাবে, যদি সাধারণ চার্চের সঙ্গে যেসব সাধারণ উপাসনালয়ের সাদৃশ্য আছে তাদের ছেঁটে ফেলা যায়। কেননা যে হাত এক জাতি হিসাবে ভারতবর্ষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, এদের হাতও সেই একই হাত। আর ভারতবর্ষকে সহধর্মাবলম্বী হিসেবে সেই হাতেই হাত রাখতে হচ্ছে।

শত্রুর সনাক্তকরণ একেবারে সুনিশ্চিত।

সাম্প্রতিক কালে সিন্ধুর জন্য আদবানির উপচে পড়া আবেগ এবং ঠিক সাভারকারের মতো ভারতবর্ষের বিভাজনকে বাতিল করে দেবার আবেদন— 'সিন্ধু' এবং 'সিন্ধুস্তান' (পৃ. ৩০-৩১) প্রসঙ্গে সাভারকারের বারংবার উল্লেখেই এর ব্যাখ্যা মেলে।[১১] সাভারকারের হিন্দুত্ব নিয়ে আরেকটু নাড়াচাড়া করতে গিয়ে লেখক খুঁজে পেলেন 'প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আমাদের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্যের পতনকাল পর্যন্ত সময়ের পরিসরে হিন্দু এবং হিন্দুস্তান শব্দগুলির ইতিহাস সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ... হিন্দুত্বের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্ণয়ের প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে এখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছেছি'। (পৃ. ৭০) একেবারে শুরুতেই, 'অঞ্চলগত জাতীয়তাবাদ' পুরোপুরি পরিত্যাজ্য, 'যদিও অন্তর্গত অর্থে ভগ্নীসমা হিন্দি নামটির মতো হিন্দু বলতে কেবলমাত্র ভারতীয়কেই বোঝায় তবুও শব্দগুলিকে যেমন আমরা অনেক সময় একটু বেশি ব্যাপক অর্থে ভেঙেচুরে ব্যবহার করতে থাকি— তেমনি কোনো ভাঙনের মুহূর্তে আমরা পাছে ভারতবর্ষের নাগরিক হওয়ার সুবাদে কোনো মহামেডানকে হিন্দু বলে ডেকে ফেলি এই ভয় হয়।' (পৃ. ৮৩) আবার,

> একজন আমেরিকান ভারতবর্ষের নাগরিক হতে পারে। আইন মোতাবেক অবশ্যই সে ভারতীয় বা হিন্দি বলে পরিগণিত হতে পারে। সে একজন দেশবাসী, আমাদের সহ-নাগরিক। কিন্তু আমাদের দেশের একজন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের ইতিহাসকে আপনার বলে গ্রহণ করছে, রক্তের উত্তরাধিকার অর্জন করছে, আমাদের দেশকে কেবলমাত্র তার ভালোবাসার দেশ বলে নয়, তার পূজ্যভূমি বলে ভাবতে পারছে, ততক্ষণ সে কিছুতেই হিন্দু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। কেননা হিন্দুত্বের প্রথম আবশ্যক বৈশিষ্ট্য যদিও এই যে, তাকে নিজের কিংবা পিতৃপুরুষের সুবাদে ভারতবর্ষের নাগরিক হতে হবে; তবু এটাই এর একমাত্র আবশ্যিক যোগ্যতা নয়। হিন্দু শব্দটি তার ভৌগোলিক তাৎপর্যের চেয়েও অনেক অনেক বেশি অর্থ প্রকাশ করে।
>
> হিন্দু শব্দটি কেন ভারতীয় বা হিন্দিশব্দের সমার্থক নয় এবং কেনই বা এতে একজন ভারতীয়কেই বোঝায়, এগুলি যে যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়, তাতে স্বভাবতই শব্দটির জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় আবশ্যিকের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় ঘটে যায়। হিন্দুরা নিছকই ভারতীয় রাষ্ট্রের একজন নাগরিক নয়। কেননা একটি সাধারণ মাতৃভূমির সঙ্গে তাদের যে ভালোবাসার বন্ধন,

কেবলমাত্র সেই বাঁধনের জোরেই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়নি। রক্তের একটি সাধারণ বন্ধনসূত্রেই তারা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। (পৃ. ৮৪)

'অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ'-কে বাতিল করে তিনি এখন 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর দিকে এগিয়ে চললেন,

আমাদের একই পিতৃভূমির সঙ্গে যে ভালোবাসার বন্ধন কেবল সেই বন্ধনেই আমরা হিন্দুরা একসাথে বাঁধা নই। শিরায় শিরায় একই রক্তের যে প্রবাহে আমাদের হৃদপিণ্ড সচল, আমাদের স্নেহাবেগ উষ্ণ, একমাত্র তাই আমাদের বন্ধন নয়। আমাদের মহান সভ্যতার প্রতি যে একই শ্রদ্ধায় আমরা অবনত সেই হিন্দু সংস্কৃতি-ই আমাদের বন্ধন। সংস্কৃতি এই বিশেষ শব্দটি ছাড়া আর কোনোভাবেই এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না। কেননা আমাদের জাতির ইতিহাসে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মূল্যবান যেগুলি সংরক্ষণ করার কথা, সেই সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তার অভিব্যক্তির জন্য যে মাধ্যমটি বেছে নেওয়া হয়েছে, সে হলো সংস্কৃত। আমরা এক কেননা আমরা এক দেশ-একজাতি এবং একটি সাধারণ সংস্কৃতির (সভ্যতা) অধিকারী। (পৃ. ৯১-৩২)

কাজেই 'হিন্দুত্ব' এবং 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' পরস্পর সমার্থক—বিজেপি-র এই যুক্তিবিন্যাস সম্পূর্ণ সঠিক।

পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমি

সাভারকার অভিযোগ করেন যে, মুসলিম এবং খ্রিস্টানরা 'একত্রে হিন্দুদের থেকে আলাদা একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কিংবা এরকমই তাদের অনুভব' (পৃ. ১০১)। এই মারাত্মক পরীক্ষাটি দ্বিস্তরীয়। পিতৃভূমি এবং পুণ্যভূমিকে অবশ্যই এক হতে হবে :

'সাঁওতাল থেকে শুরু করে সাধু পর্যন্ত প্রত্যেকটি হিন্দুর কাছে এই ভারতভূমি, এই সিন্ধুস্থান হলো পিতৃভূ এবং পুণ্যভূ পিতৃভূমি, একটি পবিত্র স্থান।

সে কারণেই মুসলিম এবং খ্রিস্টান দেশবাসীর কেউ কেউ, বলপ্রয়োগে যাদের প্রকারান্তরে একটি অহিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, এবং ঘটনাচক্রে যারা হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে একটি সাধারণ পিতৃভূমি এবং একটি সাধারণ সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্যরাশির বৃহদাংশ যেমন, ভাষা, আইন, রীতিনীতি, লোকগাথা এবং ইতিহাস— সবকিছুর উত্তরাধিকারী, তাদেরও কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই হিন্দু হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ যে কোনো হিন্দুর মতো হিন্দুস্থান যদিও তার পিতৃভূমি কিন্তু তার পুণ্যভূমি নয়। তাদের পুণ্যস্থান অনেক দূরে কোথাও— আরব কিংবা প্যালেস্তাইনে। তাদের পৌরাণিক গাথা আর ঈশ্বরকুল, মতাদর্শ আর বীর নায়ক কোনোকিছুই এই মাটির সন্তান নয়। ঘটনাচক্রে তাদের নাম এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদেশী উৎসের আভাস রয়ে গেছে। (পৃষ্ঠা : ১১৩)

মুসলিম আর খ্রিস্টানরা যদি হিন্দু বিশ্বাস গ্রহণ করে তবে তারা হিন্দু হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, যারা জাতিতে, রক্তে, জাতীয়তায় হিন্দুত্বের প্রায় সবকটি আবশ্যকীয় গুণাগুণের অধিকারী এবং কেবলমাত্র হিংসার প্রচণ্ডতায় যাদের প্রাচীন আশ্রয় থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— হ্যাঁ একমাত্র তারা যদি সমগ্রচিত্তে আমাদের সকলের মাকে ভালোবাসতে পারে, এবং তাকে কেবল পিতৃভূমি নয় পূণ্যভূমি বলে মেনে নিতে পারে, তাহলে, হ্যাঁ তাহলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা স্বাগত।

আমাদের স্বদেশবাসী এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বোরা, খোজা, যেমন এবং অন্যান্য মহম্মদীয় এবং খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী একেবারে স্বাধীনভাবে একমাত্র একেই বেছে নিতে পারে। এ পছন্দ অবশ্যই ভালোবাসার নির্বাচন হতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মনের মধ্যে এ ভাব জাগছে ততদিন তাদের হিন্দু বলে মেনে নেওয়া যাবে না।

এ হলো হিন্দুত্বের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য— একটি সাধারণ রাষ্ট্র, একটি সাধারণ জাতি এবং একটি সাধারণ সংস্কৃতি। এই সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়কে একসাথে খুব ভালোভাবে প্রকাশ করতে গেলে সংক্ষেপে বলতে হয় যে, সে এমন একজন হিন্দু যার কাছে সিন্ধুস্তান কেবল পিতৃভূ নয় এ পূণ্যভূও বটে। হিন্দুত্বের প্রথম দু'টি আবশ্যকীয়ের মধ্যে। রাষ্ট্র এবং জাতি— স্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং উচ্চারিত হয়েছে পিতৃভূ শব্দের মধ্যে। আর পূণ্যভূ শব্দটি সংক্ষিপ্তাকারে হলো সংস্কৃতি৷ এর মধ্যে রয়েছে আমাদের সংস্কার অর্থাৎ রীতিনীতি এবং আচার-বিচার, উৎসব এবং ধর্মানুষ্ঠান। আর এসবের মধ্যেই এ ভূমি পূণ্যভূমি হয়ে উঠেছে। (পৃ. ১১৬)

অতএব সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে, তাদের বিশ্বাস এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় রাখার সুযোগ ছেঁটে দেওয়া হলো। আর একইসঙ্গে এদু'টি হিন্দুত্বের ভিত্তিতে গড়া হিন্দুরাষ্ট্রের এই হলো বাস্তবতা।

প্রাচীন দর্শন এবং হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের পুনরুক্তি নয় এটি। এ হলো ঘৃণার এক নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শ— হিন্দুত্বের সূত্রায়ন। অন্য সকলের চেয়ে সাভারকার নিজে তাঁর এই মতাদর্শগত অভিযানের অভিনবত্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। কাজেই তাঁর রচনার শেষাংশে, শুরুতে যা বলেছিলেন সেই কথাগুলির তিনি পুনরাবৃত্তি করেন যে, একটি নতুন শব্দ 'হিন্দুত্ব'-এর 'আবির্ভাব' ঘটেছে।

'হিন্দুত্ব'-এর সাংস্কৃতিক দিকটির বিরুদ্ধে কোনো গুরুতর অভিযোগ থাকার কথা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু দুভার্গ্যজনক ভুলবোঝাবুঝি রয়ে গেছে। হিন্দুত্ব এবং হিন্দুবাদ (Hinduism) এই দু'টি শব্দের বিভ্রান্তিকর সাদৃশ্যই এর জন্য দায়ী। আমরা ইতিমধ্যেই দু'টি ধারণার মধ্যে পরিষ্কার একটা বিভাজন রেখা টানতে চেষ্টা করেছি। কেবলমাত্র সনাতন ধর্মকে চিহ্নিত করার জন্য হিন্দুবাদ শব্দটির ভুল ব্যবহারের থেকে একে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। হিন্দুত্ব যেমন হিন্দুধর্মের সদৃশ নয়, তেমনি হিন্দুধর্মও হিন্দুবাদের সদৃশ নয়। (পৃ. ১২১)

স্নাতকস্তরের একজন ছাত্র যদি হিন্দুত্ব বিষয়ক একটি রচনা লিখতে বসে এ প্রসঙ্গে যত উপাদান রয়েছে তাদের উপেক্ষা করে এবং যদি এ কথা ঘোষণা করে যে, 'সাধারণভাবে হিন্দুত্বকে একধরনের জীবনচর্চা বা মানসিক অবস্থা হিসেবে বুঝতে হবে, কোনোভাবেই এটিকে হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে একই সমীকরণে বসানো যাবে না বা সেভাবে একে বোঝা যাবে না', তাহলে সেই ছাত্রটি যথার্থই কড়া ভর্ৎসনার সম্মুখীন হবে। কিন্তু যে কথাটি এখানে উদ্ধৃত হলো সেই কথাটি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জিএস ভার্মার একটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক রায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক আইনের ১২৩ (৩) নং যে ধারাটিতে 'ধর্মীয় ভিত্তিতে' ভোটদাতাদের কাছে আবেদন করার জন্য দণ্ড দেওয়া হয়, সেটি শিবসেনার বাল থ্যাকারে বা তাঁর সহকর্মী মনোহর যোশী কেউ-ই উল্লঙ্ঘন করেননি, এমন কথা ঐ রায়ে রয়েছে। হিন্দুত্ব সম্পর্কিত জাস্টিস ভার্মার রায়টি এ বিষয়ক সাভারকারের রচনাকে উপেক্ষা করল, এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় এই রায়ে হিন্দুত্ব এবং হিন্দুবাদকে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুত্বকে বাদ দিয়েও যে লক্ষ লক্ষ নিষ্ঠাবান হিন্দু রয়েছেন, জাস্টিস ভার্মা অবশ্যই তাদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একটি আইনী ঘোষণায় এমনভাবে হিন্দুত্বের সঙ্গে হিন্দুবাদকে মিলিয়ে দেবার অধিকার অবশ্যই জাস্টিস ভার্মার নেই। তিনি এ বিষয়ে এতদূর এগিয়ে গেলেন যে ফতোয়া দিয়ে বললেন, 'হিন্দুত্ব' শব্দটি 'ভারতীয়করণ'-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে ধরা হয় এবং সেভাবেই ব্যবহৃত হয়। এটি জনসঙ্ঘের স্লোগান এবং যেহেতু এ ধরনের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হলেও ঐ মামলার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, কাজেই এর থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ বুঝতে পারা যায়। এস আর বোম্বাই মামলা (১৯৯৪) এস এস সি— এই মামলায় জাস্টিস ভার্মা কঠোর পরিশ্রমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে যাতে সংবিধানের 'মূল বৈশিষ্ট্য' হিসেবে ঘোষণা করতে না হয় সেই প্রচেষ্টা করেছিলেন। অযোধ্যা মামলায় তাঁর রায়টি কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।[২১]

বিজেপি তার রাষ্ট্র বিষয়ক মতাদর্শের আইনী দোষক্ষালন হওয়ায় এই রায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, তা বোঝাই যায়। কিন্তু আদালত যে সামগ্রিকভাবে জাস্টিস ভার্মার মতামতের অংশীদার নয়, একথা খুব অল্প মানুষই জানেন। গোটা বিষয়টি আরো একটু ব্যাপক বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল। কিন্তু আদালত যে সেই সুপারিশ শোনার মতো সময় করে উঠতে পারেনি সেটাই দুর্ভাগ্যজনক। জাস্টিস ভার্মার রায়ের ফসল হলো গভীর সামাজিক দুষ্কর্ম। আর সে কারণেই পুনর্মূল্যায়নে এটি বাতিলযোগ্য।

বিজেপি-র ১৯৯৯ সালের ইস্তাহার অত্যন্ত অসৎভাবে দাবি করেছিল যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ এবং সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুপ্রিম কোর্ট শেষপর্যন্ত হিন্দুত্বের সত্য অর্থ এবং বিষয়বস্তুকে স্বীকৃতি দিল।' এটি সর্বৈব মিথ্যা। আদালতের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা এখনো বাকি এবং আর পাঁচজনের মতো বিজেপি সে কথা খুব ভালোভাবেই জানে। ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে জাস্টিস জে এস ভার্মা তাঁর নিজের

এবং জাস্টিস এন. পি. সিং ও কে ভেঙ্কটস্বামীর পক্ষে যে চূড়ান্ত অসন্তোষজনক রায় দিয়েছিলেন, সেটি ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে জাস্টিস কে রামস্বামী, এস পি. ভারুচা এবং কে এস পরিপূর্ণন এই তিন সদস্য সম্বলিত আদালতের একটি বিচারকমণ্ডলী পাঁচ সদস্যের আর একটি বিচারকমণ্ডলীর কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য পেশ করেন।[২২] অতএব হিন্দুত্বের বিষয়ে এটি চূড়ান্ত রায় নয়।[২৩]

এর পশ্চাদপটটি গুরুত্বপূর্ণ। এর পূর্বতর একটি মামলা, ১৪ জুলাই, ১৯৯৫ জাস্টিস জি এন রায় এবং ফৈজানুদ্দীন যার নিষ্পত্তি করেন, সেখানে সুপ্রিম কোর্ট বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে :

> আবেদনকারীর সপক্ষে অবতীর্ণ মাননীয় কৌসুলি অত্যন্ত অধ্যবসায়ে এই বলে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন যে, কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় যেমন, হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হবার জন্যই ভোট এর সঙ্গে 'হিন্দুত্ব'-এর নামে ভোটদানের আবেদনকে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না। হিন্দুদের প্রতি শাসক কংগ্রেস দলের পক্ষপাতমূলক আচরণের সমালোচনা কিংবা কোনো একটি সম্প্রদায়ের সপক্ষে তোষণ নীতি কিংবা একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের হাতে জাতীয় একতা বিপন্ন হয়ে পড়া— এইসব ঘটনার সঙ্গে কেবল একটি বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে ভোটদানের আবেদনকে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। হিন্দুদের প্রতি যেরকম অসম ব্যবহার করা হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে যেরকম হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করা হচ্ছে তাতে দেশের মধ্যে বিভাজনের শক্তি আর দেশদ্রোহী উপাদানগুলিই উৎসাহিত হচ্ছে; যাঁর হাতে দেশের অখণ্ডতা এবং একতা সুরক্ষিত থাকবে এমন একজন যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করে এইসব দেশবিভাগকারী এবং দেশদ্রোহী শক্তিসমূহের সম্পর্কে হিন্দুদের সচেতন থাকা উচিত— বক্তব্যের মধ্যে কেবল এই শ্লেষটুকু ছিল একথাই বোঝানো হয়েছে। আমাদের মতে, হিন্দুধর্মের অনুগামীদের প্রচারিত বাণী এবং বহির্জীবনের অভ্যাসের থেকে এই 'হিন্দুত্ব' পুরোপুরি আলাদা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের সপক্ষে যে আবেদন করা হয়েছে তার তারিফ করতে হিন্দুধর্মের দর্শন, বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতি তার শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতা এসব বিচার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আমরা ইতিমধ্যেই আভাস দিয়েছি যে, এক্সিবিট ০-২০ পোস্টারটি প্রদর্শন করে আবেদনকারী জনসমক্ষে যে বিষয়টি প্রচার করেছেন তা আইন মোতাবেক চূড়ান্ত আপত্তিকর এবং প্রচ্ছন্নভাবে সংঘাত সৃষ্টিকারী, হিন্দু এবং মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ফলে ঘৃণা এবং ভুলবোঝাবুঝি আসতে পারে। আমাদের মতে, এই পোস্টারে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে 'মুসলিমদের শিক্ষা দেবার জন্য' ভোটদানের যে আবেদন, সেটিকে কোনো প্রকারেই এমনকী নির্বাচনী বক্তব্যের যৌক্তিক বিন্যাসেও ন্যায়সংগত বলতে পারা যায় না।[২৪]

এই পোস্টারের জন্যই আবেদনকারীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে থাকতে হয়েছিল।

জাস্টিস ভার্মার নেতৃত্বে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল, ঐ বিচারকমণ্ডলীর গৃহীত অবস্থান তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভার্মা এই আগের মামলাটির উল্লেখ মাত্র করেননি। তার চেয়েও খারাপ হলো, তিনি একটি উদ্ধৃতিকে বিকৃত করেছিলেন। তাঁর এই তত্ত্বটিকে পুরোপুরি খণ্ডন করতে পারে এমন একটি অংশ তিনি বাদ দিয়েছিলেন। বারে বারে সুপ্রিম কোর্ট এই অধ্যাদেশ জারি করেছে যে পূর্বের যে কোনো উদাহরণকে সেই বিশেষ ক্ষেত্রের সত্যাসত্যের আলোকেই অনুধাবন করতে হবে। হিন্দুবাদের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হতে পারে। কিন্তু হিন্দুত্ব তা নয়। অবশ্যই যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ একে হিন্দুবাদের সমার্থক করে না দেয় তবেই। জাস্টিস ভার্মা ঠিক সেটাই করেছেন : 'হিন্দুত্বকে সাধারণভাবে জীবনযাপনের একটা পদ্ধতি কিংবা মনের কোনো বিশেষ অবস্থা এরকম ভাবা হয়। হিন্দু ধর্মীয় মৌলবাদ হিসেবে এটিকে দেখা কিংবা তার সঙ্গে একে একাকার করে দেওয়া ঠিক নয়।'

এই উদ্ভট সিদ্ধান্তের সপক্ষে জাস্টিস ভার্মা কোনো উদাহরণ দিয়েছেন কি? হ্যাঁ দিয়েছেন। তাঁর উদ্ধৃতি এবং উদাহরণ দু'টিই পুরোপুরি উপস্থাপনযোগ্য।

> মৌলানা ওয়াহিদুদ্দীন খান-এর In Indian Muslims— The Need for a Positive Outlook— (১৯৯৪) এতে বলা হয়েছে : 'সংখ্যালঘু সমস্যাটি-র সমাধানের জন্য প্রস্তুত কৌশলটি হলো হিন্দুত্ব বা ভারতীয়করণ। অবশ্য শব্দগুলি একটু আলাদা রকমের। সংক্ষেপে বললে, কৌশলটির উদ্দেশ্য, দেশের অভ্যন্তরে সহাবস্থানকারী সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে যে পার্থক্য, সমরূপ একটি সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে সেই পার্থক্যগুলি বিলুপ্ত করা। এটিই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যের পথ বলে মনে করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু সমস্যা এতে একেবারে চিরতরে শেষ হবে বলে ভাবা হচ্ছে।'

এর থেকে জাস্টিস ভার্মা সিদ্ধান্ত নিলেন, 'উপরের মতামতটি ইঙ্গিত করে যে, 'হিন্দুত্ব' শব্দটিকে 'ভারতীয়করণ' অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে সহাবস্থানকারী সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যগুলি বিলুপ্ত করার জন্য একটি সমরূপ সংস্কৃতির বিকাশের সমার্থক বলে মনে করা হয় এবং সেইভাবেই এটি ব্যবহৃত হয়।" এরকম একটি অখ্যাত বই বেছে নেবার প্রয়োজন কোথায় ছিল? মৌলানা হলেন বিতর্কবাদী। পণ্ডিতদের আরো অনেক রচনা রয়েছে যেগুলি সত্যই প্রামাণ্য। এই ধরনের একটি বিচারে সেই লেখাগুলিও নিশ্চয়ই উদ্ধৃত করা উচিত।

যাইহোক, এমনকী যদি মৌলানাকেও উদ্ধৃত করতে হয়, তবে নিশ্চিতরূপে তাঁর রচনার উদ্ধৃতি সঠিক হওয়া এবং ঠিকমতো অনুধাবন করাও উচিত। কেউ যদি সেইভাবে কাজটি করেন তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে, জাস্টিস ভার্মার সিদ্ধান্ত সমর্থন করা তো দূরের কথা, মৌলানা সেটিকে সবিস্তারে খণ্ডন করেছেন। 'হিন্দুত্ব' কিংবা পরোক্ষে আর একটু গ্রহণযোগ্য 'ভারতীয়করণ'-এর প্রশংসায় নয়, বরং মৌলানা তার কঠোর সমালোচনা করেই একথা লিখেছিলেন। ঠিক এর আগের অনুচ্ছেদে গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে যে, হিন্দুরা দেশ বিভাগকে 'কেবলমাত্র বিগত ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা'

বলে মনে করে না। 'হিন্দুত্ব' বা 'ভারতীয়করণ' -এর মাধ্যমে 'সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের' পরবর্তী কৌশল 'দেশের অভ্যন্তরে সহাবস্থানকারী সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যগুলি বিলুপ্ত করে, একটি সমরূপ সংস্কৃতি' চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা। এই প্রক্রিয়ার সপক্ষে অনুমোদন আদায়ের জন্য যিনি এটি উদ্ধৃত করেছিলেন, সেই জাস্টিস ভার্মার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে ছিলেন মৌলানা। তিনি এটিকে মোটেই অনুমোদন করেননি। আমাদের এই বৈচিত্র্যময় দেশে 'সমস্ত সংস্কৃতি'-র সহাবস্থানের পক্ষেই তিনি রয়েছেন। কিন্তু বিজেপি এবং আর এস এস তা নয়। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অবলুপ্তিই সংখ্যালঘু সমস্যার অবসান ঘটাবে বলে মনে করা হয়— এই মন্তব্যের অব্যবহিত পরে লিখিত মৌলানার একটি বিশেষ বাক্যেই এই বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়। বাক্যটি এইরকম অবশ্য 'এই প্রস্তাব যতই সুন্দর মনে হোক না কেন, নিশ্চিতরূপে এটি অসাধ্য।' জাস্টিস ভার্মা এই বাক্যটি আদৌ লক্ষ্য করেননি।

'ভারতীয়করণ'-এর প্রসঙ্গে, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৯ এন আই সি-র স্টান্ডিং কমিটি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল, যাতে বলা হয়েছিল : 'কোনো একটি গোষ্ঠীকে ভারতীয় করে তুলতে হবে এমন ধারণার প্রসারকে আমরা নিন্দা করি।' কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় ৩রা নভেম্বর,১৯৬৯, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরিচালনায় একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। সেখানে ভারতীয়করণকে প্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল। একা জনসঙ্ঘ এর বিরুদ্ধে ছিল। বলা হয়েছিল যে, ভারতীয়করণ হিন্দুত্বের একটি অসৎ পন্থা।[২৫]

অবশ্য এটি লক্ষণীয় যে, পার্টি নেতৃত্বের বিভিন্ন বক্তৃতা সম্পর্কে একজন প্রার্থীর দায়িত্ব থাকে, বৃহত্তর বিচারকমণ্ডলীর কাছে পরামর্শ চাওয়ার বিষয়টি সেরকম কোনো সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইন, ১৯৫১-এর ১২৩(৩) এবং এ ধারার (সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্যের শাস্তিমূলক) 'বিষয়বস্তু এবং সম্ভাবনা'-র প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাদিও বৃহত্তর বিচারকমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল : বলা হয়েছিল ''অন্যথায় 'দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের' তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বিচারের ভুল সিদ্ধান্ত... প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে (পৃষ্ঠা ৬৭১, ১২ নং অনুচ্ছেদ)। জাস্টিস ভার্মার রায় সম্পর্কে বিচারকমণ্ডলীর উদ্বেগ এবং অসন্তোষ সুস্পষ্ট।

গোলওয়ালকর প্রসঙ্গে

হিন্দুত্বের রচয়িতা সাভারকারের দৃষ্টিতে বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে ভারতীয়দের সহিষ্ণুতা অভাবনীয় :

> আমাদের সংখ্যালঘুদের একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক যে, একমাত্র একত্রিত হবার মধ্যেই যদি প্রকৃত শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে হিন্দুত্বের অভ্যন্তরে সেই দৃঢ়তম এমনকী প্রিয়তম বন্ধন রয়েছে যেটি আমাদের দেশবাসীর মধ্যে স্থায়ী, বাস্তব এবং শক্তিশালী এক সম্মিলনী গড়ে তুলতে পারে। কোনোমতে চোখকান বুজে বর্তমান সময়টা কাটিয়ে দেবার ভাবনা তোমাদের মনে আসতে

পারে। কিন্তু এতে যে কেবল আমাদের প্রাচীন জাতি এবং সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তা-ই নয়, বিশেষভাবে ক্ষতি হবে তোমাদেরই।

এখন এটা বিচার করা যাক :

> আজকাল আমরা প্রায়ই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মুখে 'জাতীয় সংহতি' এবং আরো অনেক কিছু কথা শুনি। কিন্তু যাকে ভিত্তি করে আমরা সবাই একত্রিত হতে পারবো সেই 'সাধারণ আবেগ'টা কী? আমাদের জাতীয় জীবনের যেসব চিরন্তন জীবনপ্রবাহ একে একত্রিত পুনরুজ্জীবিত আর মহিমময় করে তুলেছে সেগুলো কী? প্রথমত, স্মরণাতীত কাল থেকে যে ভূমিকে আমরা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি হিসেবে মেনে এসেছি সেই মাটির প্রতি প্রজ্জ্বলিত নিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, আমরা যে সেই একই মহিমময়ী জননীর সন্তান এই অনুভবে উৎসারিত সৌহার্দ আর বন্ধুত্বের আবেগ। তৃতীয়ত, একই সংস্কৃতি এবং উত্তরাধিকার, একই ইতিহাস এবং রীতিনীতি, একই আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষা এই ত্রয়ী মূল্যবোধে ভূমিষ্ঠ এক সাধারণ জাতীয় জীবনের জন্য তীব্র সচেতনতা। অথবা এককথায় বলতে গেলে, হিন্দু জাতীয়তাবাদই আমাদের জাতীয় সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর।'[২৬]

এ কথাগুলো সাভারকারের নয়। একথা লিখেছেন এম এম গোলওয়ালকর। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি অদ্ভুতভাবে একইরকম। সাভারকারের হিন্দুত্ব-এর প্রতিটি ওঠাপড়া গোলওয়ালকরের চিন্তায় জন্মমুহূর্ত থেকেই। উপস্থিত বেশিরভাগই রচনায় যা প্রকাশিত হয়, সে হলো অন্যদের প্রতি ঘৃণা আর অবজ্ঞা। এইরকম একটা উদাহরণ :

> বর্তমানে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ আমাদের বলেছে যে, মানুষ নাকি হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান হয়ে জন্মায় না, সে স্রেফ মানুষ হয়ে জন্মায়। অন্যদের ক্ষেত্রে একথা সত্য হতে পারে। কিন্তু একজন হিন্দু, যখন সে মাতৃগর্ভে তখনি সে তার প্রথম সংস্কার পেয়ে যায় আর শেষতমটি পায় যখন তার শরীর চিতার আগুনে ছাই হয়ে যায়। হিন্দুর ষোলটি সংস্কার রয়েছে যেগুলি তাকে হিন্দু করে তোলে। বস্তুত মাতৃগর্ভ থেকে বাইরের পৃথিবীতে আসবার আগেই আমরা হিন্দু হয়ে যাই। কাজেই আমরা হিন্দু হয়েই জন্মগ্রহণ করি। অন্যদের ক্ষেত্রে তারা এ পৃথিবীতে প্রথমে একজন সাধারণ নামহীন গোত্রহীন মানুষ হয়ে জন্মায়। পরে সুন্নত করে কিংবা বাপ্টাইজ করে তারা মুসলিম বা খ্রিস্টান হয়। (পৃ. ১১৮)

'অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ'কে নস্যাৎ করার জন্য গোলওয়ালকর, গোটা একটা অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন (অধ্যায় দশম, পৃ. ১৩৬-৫৭)। তিনি জানাচ্ছেন যে,

> এখানে ইতিমধ্যেই হিন্দুদের একটি পূর্ণ বিকশিত প্রাচীন রাষ্ট্র ছিল। অন্যান্য যেসব গোষ্ঠী এই দেশে বাস করছে, তারা তখন হয় ইহুদী, পার্শীদের মতো অতিথি কিংবা মুসলিম, খ্রিস্টানদের মতো আক্রমণকারী ছিল। তারা সকলেই এখন যে এক সাধারণ শত্রুর শাসনাধীনে একটি সাধারণ অঞ্চলিক সীমার মধ্যে বাস করে এ এক দুর্ঘটনা। কেবলমাত্র এই কারণেই এই সব বিভিন্ন

গোষ্ঠী সমূহকে কেমন করে একই মাটির সন্তান বলা যাবে, সে প্রশ্নের মুখোমুখি তারা কখনো হয়নি ... যে অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণ বিপদের তত্ত্বে আজ আমাদের রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে উঠেছে, তাতে আমাদের প্রকৃত হিন্দু জাতীয়তাবাদের যথার্থ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়বস্তু থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর স্বাধীনতা আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হচ্ছে। দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধিতা সমার্থক হয়ে পড়ছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, এর নেতৃত্ব, সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের ওপর এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ছে। (পৃষ্ঠা ১৪২)

গোলওয়ালকরের গান্ধী-নিন্দা সাভারকারের মতোই কর্কশ :

এমন সব নেতা আমাদের, যেন মনে হয় আমাদের দেশবাসীদের পৌরুষহীন করতেই তাদের যত আবেদন-নিবেদন। অবশ্য আমাদের ইতিহাসে এ কোনো নিছক দুর্ঘটনা নয়।আমাদের কত অসংখ্য পূর্বপুরুষের জঘন্য গোষ্ঠী জীবনে এই সব নেতৃত্ব চূড়ান্ত তিক্ততার মুহূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের জাতীয় গৌরব, আমাদের স্বাধীনতা তারা বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে; নিজেদের ব্যক্তিগত আত্মগরিমা, স্বার্থপরতা আর শত্রুতা চরিতার্থ করতে নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের বলি দিয়েছে; আমাদের দেশের, ধর্মের মেরুদণ্ডহীন ক্লীব শত্রুদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে তারা। এমন আত্মবিনাশের মধ্যেই এইসব লোক যে তাদের অন্যায়ের সমুচিত প্রতিফলন পাবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। (পৃ. ১৫৩)

গোলওয়ালকর ব্যাখ্যা করলেন,

আজকাল 'ভারতীয়' শব্দটি বিষয়ে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। যে 'Indian' শব্দটির মধ্যে এ দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্শী ইত্যাদি সকলকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়, সাধারণভাবে এই শব্দটির অনুবাদ হিসেবে 'ভারতীয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কাজেই আমরা যখন আমাদের বিশেষ সমাজের কথা বলতে চাই তখন 'জাতীয়' শব্দটি সম্ভবত আমাদের বিভ্রান্ত করে। এর যে অর্থটি আমরা সর্বসমক্ষে জ্ঞাপন করতে চাই, তার সম্পূর্ণ এবং সঠিক ব্যঞ্জনা 'হিন্দু' শব্দের মধ্যেই রয়েছে।' (পৃষ্ঠা ৯৮)

সাভারকারের মতো গোলওয়ালকরও উপসংহারে বললেন, এইভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গঠনের যা কিছু আবশ্যিকতা সবই এই মহান হিন্দু জনগণের জীবনপ্রবাহের মধ্যেই পরিপূর্ণ হবে। সেকারণেই, আমরা বলি, হিন্দু জনগণের জীবনই আমাদের এই দেশ 'ভারতের' জাতীয় জীবন। সংক্ষেপে, এ হলো হিন্দু রাষ্ট্র' (পৃ.১২৬)। গোলওয়ালকর পুণ্যভূমি এবং পিতৃভূমির এই দ্বৈত বিশ্লেষণ অনুমোদন করেন। 'তারা (মুসলিম এবং খ্রিস্টান) কোনো এক বিদেশী ভূখণ্ডকে তাদের পুণ্যভূমি বলে মনে করে।' (পৃ ১২৮)

গোলওয়ালকর উপদেশ বর্ষণ করেন,

> একটি রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের যদি উত্থিত হতে হয়, তাহলে জাতীয়তাবাদের এই যে নতুন এক ধোঁয়াটে ধারণা আমরা ইতিমধ্যেই স্বীকার করে বসেছি, আমাদের সেই প্রাথমিক ভুলটি সংশোধন করতেই হবে। আমাদের অভিজ্ঞতাই এই ধারণাকে চূড়ান্ত মিথ্যে এবং ক্ষতিকর বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের শঠ প্রচারে আমরা কখনোই ভুল পথে পরিচালিত হব না। আমরা নাকি হিন্দু; মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ, আধ্যাত্মিক উদারতা আরো কত কিছু সব মহান দর্শন রয়েছে আমাদের; হিন্দু জাতীয়তাবাদ আর এই সব 'সাম্প্রদায়িক', 'মধ্যযুগীয়' এবং 'প্রতিক্রিয়াশীল' ধারণার কথা বলে নিজেদের সংকীর্ণ করে তোলা উচিত নয় আমাদের— ওঁদের এইসব উপদেশবাণীতে আজ অবধি যথেষ্ট বোকা বনেছি আমরা। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হলেই নিজের চোখেই সবকিছু দেখতে পাওয়া যাবে। প্রাচীন এক যথার্থতায় আমাদের জাতীয়তাবাদের সত্য অর্থে, হিন্দুরাই ভারতের জাতীয় সমাজ— এই প্রকৃত অবস্থানে ফিরে আসবো আবার। আমাদের সংগঠনের ক্ষেত্রে [রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ RSS] 'রাষ্ট্রীয়' শব্দটির বিষয়ে আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন আমাদের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় এই কথাগুলিই পুনর্বিশ্লেষণ করেছিলেন। (পৃষ্ঠা ১৫৬-৫৭)

ইনিই হলেন সেই মানুষ যাঁকে আদবানি-বাজপেয়ী অ্যান্ড কোম্পানি এতদিন যাবৎ 'গুরুজী' বলে জয়ধ্বনি দিয়ে এসেছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গারের জন্য কোনো বিজেপি নেতা এখনো পর্যন্ত গোলওয়ালকরের সমালোচনা করেননি।

> তাদের বিরুদ্ধতা যে নিছকই রাজনৈতিক নয়, ইতিহাসে সে কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই যদি হতো, তাহলে এত অল্প সময়ে আমাদের জিতে নিতে পারতো না। কিন্তু এর শিকড় এত গভীরে যে আমাদের যাতেই বিশ্বাস, তার সবকিছুর বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিদ্বেষ। আমরা যদি মন্দিরে পুজো করি তবে সে তাকে অপবিত্র করে দেয়। আমরা যদি বন্দনাগান গাই, রথযাত্রা করি, তবে সেসবেই সে উত্যক্ত হয়ে উঠে। আমরা যদি গো-পূজা করি তবে সে তাকে কেটে উদরস্থ করে। আমরা যদি পবিত্র মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে নারীদের বন্দনা করি, তবে সে তাকে চরম লাঞ্ছনা করে। ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এমনি সব বিষয়ে সে আগাগোড়া আমাদের জীবনযাপনের বিরুদ্ধ অবস্থানে। জীবনের মর্মমূলে এই শত্রুতায় আকণ্ঠ পূর্ণ সে। (পৃ. ১৪৮)

বিজেপি তার নির্বাচনী ইস্তাহারে যে প্রস্তাব দিয়েছিল এবার তার বিচার করা যাক :

> কেন্দ্রে একটি বিজেপি সরকার গড়তে পারলে, পরবর্তী পাঁচটি বছর সুরক্ষা, শুচিতা, স্বদেশী এবং সমরসতা এই চারটি আদর্শের আধারে রচিত আমাদের ইস্তাহার কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে হবে। হিন্দুত্ব অথবা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ হলো রামধনু, এটি আমাদের গৌরবময় অতীতের

সঙ্গে বর্তমানের সেতু বন্ধন করে, একইরকম গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ প্রসারিত করে; স্বরাজ্য থেকে সুরাজ্যে উত্তরণের পথনির্দেশ করে।

ভারতের নিছক ভৌগোলিক কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের গণ্ডিতে আমাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমাদের কালাতীত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এতে উল্লেখিত। সমস্ত অঞ্চল, ধর্ম এবং ভাষার কেন্দ্রে রয়েছে এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এই হলো আমাদের সভ্যতার পরিচয়; হিন্দুত্বের মর্মবাণী ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের রূপকার। আমাদের বিশ্বাসে এটিই হলো আমাদের প্রাচীন রাষ্ট্র 'ভারতবর্ষ'-এর পরিচয়... বিজেপি এই বিশ্বাসে দৃঢ় যে, হিন্দুত্বের মধ্যে এই রাষ্ট্রে নবজীবন সঞ্চার, জাতি-গঠনের কঠিন কাজ সম্পাদন, একে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং শক্তিশালী করার সুবিপুল শক্তি রয়েছে। এক উচ্চতর স্তরে দেশাত্মবোধের বিস্ফোরণে এ কাজ করা যায়, করতে পারা যায়। এই দেশাত্মবোধ দক্ষতা এবং কর্মসম্পাদনের উচ্চতর মাত্রায় দেশকে উন্নীত করতে পারে। মনের মধ্যে এমনি এক অখণ্ড ধারণা সম্বল করেই, বিজেপি অযোধ্যায় শ্রী রামমন্দির নির্মাণের জন্য রামজন্মভূমি আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। এই মহত্তর গণ আন্দোলন স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাসে ভারতের লক্ষ্যহীন নীতিকে পুনরায় নির্দিষ্ট লক্ষে নিবদ্ধ করেছে এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে।

এক অবিচ্ছেদ্য মতাদর্শে সাভারকার, গোলওয়ালকর এবং বিজেপি একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে। মুসলিমদের সম্পর্কে সাভারকারের মন্তব্যগুলি বিস্তৃতাকারে উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকার জন্য এই লেখককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি যে এ বিষয়ে গোলওয়ালকরের চেয়েও অনেক বেশি কর্কশ, এ জন্যেই অনেক কথা বলা হলো। লাম্পট্য এবং নীতিহীনতার এমন কোনো রূপ নেই যা সাভারকার, বিশেষত 'হিন্দু ইতিহাসের ছটি যুগ'-এ মুসলিমদের ওপর করতে বাকি রেখেছেন। এই মানুষকে 'জাতীয় নায়ক' হিসেবে সম্মান করার জন্য বিজেপি আহ্বান করছে সেই দেশকে, যেখানে নিঃসন্দেহে রয়েছে মুসলিম, রয়েছে খ্রিস্টান।

হিন্দু মহাসভা

১৯১৫ সালের ৯ই এপ্রিল হরিদ্বারে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'এর প্রাথমিক দশায় ... এটি একটি সমাজ-ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে কাজকর্ম করতো। হিন্দু সমাজে পশ্চিমী স্বাধীনতার প্রভাব, বিশেষত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা মারফত যখন এটি ক্রিয়াশীল, তখন এই প্রভাবকে ঠেকাবার জন্য এই সংগঠনের পরিকল্পনা। কিন্তু রাজনীতি অনুপস্থিত ছিল না। এর প্রথম সভাপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ভারতে 'হিন্দুরা এমনকী সংখ্যালঘুতে পর্যবসিত হতে পারে এমন ভীতি ব্যক্ত করেন।'[২৭]

মদনমোহন মালব্যের হাতে ১৯২৩ সালে আগস্টে বারাণসীতে পুনরুজ্জীবিত হবার পর ভারতীয় রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে এই সংগঠন মাথা তুলে

দাঁড়াল। ১৯২৫ সালে এর অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি হলেন লালা লাজপত রায়।[২৮] আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা: হেডগেওয়ার এই সংগঠন এবং সাভারকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতেন। অনেকেই আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা দু'টিরই সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে আর এস এস-এর বিধিনিষেধ থেকে রেহাই পাবার জন্য এর অনেক সদস্য যখন আর এস এস ত্যাগ করলেন তখন বিতর্ক দেখা দিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাথুরাম গডসে, আধা-সামরিক হিন্দুরাষ্ট্র দল তারই হাতে গড়া।[২৯] একেবারে শেষ দিন পর্যন্ত যে আর এস এস-এর প্রতি গডসের আনুগত্য অক্ষয় ছিল, তা আমরা দেখেছি। কেবলমাত্র কৌশলের প্রশ্নেই পার্থক্য ছিল।

মুক্তি পাবার পর, ১৯৩৭ সালে সাভারকার হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায়, দল আরো জঙ্গী, আরো উন্মত্ত হয়ে উঠল। হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন-এ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তার সমস্ত সভাপতির ভাষণের সংগ্রহ পাওয়া যায়। তাঁর ১৯২৩ সালের বইটির তুলনায় এখন তিনি হিন্দুত্বের প্রচারে আরো অনেক বেশি অগ্রণী। এই ধারণার মধ্যে যে সুক্ষ্ম খুঁটিনাটি সেগুলিকে এখন স্ফীতকায় করে তুললেন।[৩০] অবশ্য সাভারকার এমনভাবে কথা বললেন যে মনে হলো তিনি যেন তাঁর ঐ বইটি থেকেই এদের তুলে আনছেন, আর বিশদ ব্যাখ্যা করছেন :

> প্রধানত সংজ্ঞাটি অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে মানানসই হবে। হিন্দুত্বের প্রথম আবশ্যকীয় হিসেবে একটি সাধারণ পূণ্যভূমির অধিকার— ভারতীয় মুসলিম, ইহুদি, পার্শী ইত্যাদি হিন্দুস্তানকে পিতৃভূমি হিসেবে স্বীকার করলেও নিজেদের হিন্দু বলার দাবি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অবশ্য বাস্তবে তারা তা নয়-ও। তেমনি অন্য দিকে সংজ্ঞার দ্বিতীয় আবশ্যকীয় অনুসারে, আমাদের সঙ্গে একত্রে একটি পূণ্যভূমি থাকলেও, চীনা, জাপানী এবং অন্যান্যদের হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাইরে থাকতে হবে কেননা তাদের একটি সাধারণ পিতৃভূমি নেই। (পৃ. ৬)

হিন্দুত্ব যে আসলে একটি নব্য ধারণা একথা ব্যাখ্যা করতেও তাঁকে বিস্তর কষ্ট করতে হয়েছে :

> হিন্দুবাদের চেয়ে হিন্দুত্ব-হিন্দুয়ানা অনেক বেশি বোধগম্য। এই পার্থক্যের প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য, 'হিন্দু' শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণের সময় আমি 'হিন্দুত্ব' 'প্যান-হিন্দু' ও 'হিন্দুরাজ' শব্দগুলো তৈরি করেছিলাম। হিন্দুদের ব্যবস্থাদি, তার তত্ত্ব বা ধর্মমত নিয়ে হিন্দুরাজের কারবার। কিন্তু সংক্ষেপে এটি এমন এক বিষয়, যাকে হিন্দু মহাসভা পুরোপুরি একজন ব্যক্তি বা এক দল মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস আর বিবেকের বিষয় বলে মনে করে। কোনো ধর্মমত কিংবা দর্শনের কোনো বই বা তত্ত্ব তা সেটি সর্বেশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ বা নাস্তিক্য যাইহোক না কেন এদের কোনোটির ভিত্তিতেই মহাসভা প্রতিষ্ঠিত নয়...
>
> প্রধান কথা হলো, মহাসভা কোনো হিন্দু ধর্মসভা নয়, একটি হিন্দুরাষ্ট্র-

সভা। এটি সমস্ত হিন্দুর সপক্ষে গড়ে ওঠা একটি সংগঠন। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে একটি হিন্দু-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার এটি রূপকার। হিন্দু মহাসভাকে কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় সংগঠন বলে ভেবে যারা চরম ভুল করছে, এই পার্থক্যটি তাদের সম্যক স্মরণে রাখতে হবে। (পৃ. ৮-৯)

১৯৩৭ সালে তিনি ঘোষণা করলেন, 'সামগ্রিকভাবে হিন্দুস্থানের সর্বোত্তম স্বার্থের মধ্যেই হিন্দুরাজের সর্বোত্তম স্বার্থটি সনাক্ত করা যায়। সে কারণে হিন্দুদের প্রসঙ্গ বিচার করতে গেলেই, আমাদের সাম্প্রদায়িক এবং জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য কিংবা কোনো দ্বন্দ্বের অস্তিত্বই থাকতে পারে না' (পৃ. ১)। অর্ধ শতাব্দী পর, এই একই চিন্তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল বাজপেয়ীর কণ্ঠে। বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতিতে, ১৯৮৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি বললেন যে, হিন্দু আবেগ আর জাতীয় স্বার্থ সমার্থক।

নিখুঁত গোয়েবলসীয় ঢঙে, সাভারকার গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক আক্রমণ শানিত করলেন :

> আমি এই বলে হিন্দুদের সতর্ক করছি, এমনকী ইংলন্ড যদি কখনো এদেশ থেকে চলেও যায়, তখনো মহম্মদীয়রা আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র এবং একটি সাধারণ ভারতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হবে। তারা যে সম্প্রদায় হিসেবে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করার উন্মত্ত পরিকল্পনা এখনো লালনপালন করে চলেছে, আসুন এ বিষয়ে আর আমরা অন্ধ হয়ে থাকবো না।... আমরা হিন্দু, এই সৌরজগতে আমাদের একটি পৃথক দেশ থাকতেই হবে। সেখানে আমরা হিন্দু হিসেবে— একদল শক্তিবান মানবগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের অবশ্যই বিকশিত করবো। অতএব শুদ্ধির কেবল একটি ধর্মীয় অর্থ আছে তা নয়, এর একটি রাজনৈতিক অভিক্ষেপও রয়েছে। সেই শুদ্ধিকে নির্ভর করে মাথা তুলে দাঁড়াও। সংগঠনের পতাকাতলে মাথা তুলে দাঁড়াও। সংগঠনের চরমতম বিকাশের জন্য বর্তমান সংস্কার আইনে, নিজেদের ভ্রান্ত উদ্যোগে যা কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তাতীত হয়ে গেছে, তাদের পুনরাধিকারই আমাদের হিন্দুদের পক্ষে অনুশাসন হয়ে ওঠা উচিত। (পৃ. ২৭)

মহাসভা এবং ব্রিটিশ

কংগ্রেসের বিপরীত ভাবনায়, ব্রিটিশ ক্ষমতার যেটুকু ছিটেফোঁটা প্রসাদ ভারতীয়দের দিতে চেয়েছিল, কেবলমাত্র সাভারকারই তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত ছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৭, এই 'বিপ্লবী' এবং 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' এই যুক্তিতেই স্থির ছিলেন। ১৯৩৮ সালেও তিনি আবার এই বিষয়ে কথা বলেছেন। 'বর্তমান সংবিধানের আওতাধীন পৌরসভা, বোর্ড এবং সংসদে হিন্দুদের জন্য নির্দিস্ট আসনগুলি যদি হিন্দু সঙ্ঘাবলম্বী মানুষজন দখল করে নিতে পারে, তবেই হিন্দু আন্দোলনে আকস্মিক সজীবতার সঞ্চার

নজরে পড়বে। তখনি তোমার বর্তমানের সর্বগ্রাসী অসহায়তার নিরিখে এই আন্দোলনকে অদৃষ্টপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী করে তোলা যাবে।' (পৃষ্ঠা ৭১)

কেন যে সাভারকারের অন্ধ সমর্থক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন এবং হিন্দু মহাসভাপন্থীরা যোগ দিলেন সিন্ধের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায়, এটাই তার কারণ। কংগ্রেসী ইতিহাসবিদ পট্টবি সীতারামইয়া লিপিবদ্ধ করেন : এটা লক্ষণীয় যে, সিন্ধের হিন্দু (মহা) সভার মন্ত্রীরা সিন্ধু বিধানসভায় পাকিস্তানের পক্ষে নেওয়া প্রস্তাবে নীরব দর্শক হয়ে রইলেন এবং যেটুকু প্রতিবাদ করে তারা সন্তুষ্ট রইলেন সে নিতান্তই... মামুলী।'[৩২] তারা নিজেদের দপ্তর থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত করলেন না।

মুখার্জি কেবলমাত্র যে 'আমার নেতার প্রতি বিশ্বস্ততা'-য় মুক্তকণ্ঠ হলেন তা-ই নয়, বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্টকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে কেমন করে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে দমন করা যায় সে পরামর্শও দিলেন। যেন তাঁর মতো একজনের কাছ থেকে গভর্নরের কোনো পরামর্শ দরকার ছিলো! মুখার্জি লিখলেন :

> এইরকম একটি কঠিন সময়ে গভর্নর হিসেবে আপনার সঙ্গে আপনার সহকর্মীদের সম্পূর্ণ বোঝাপড়া থাকা উচিত। এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।... কংগ্রেসের ডাকা সারা ভারত ব্যাপী আন্দোলনের ফলে এই প্রদেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্ট হতে পারে আমাকে এখন তার উল্লেখ করতে হবে। যুদ্ধের সময়কালে যদি কেউ গণ-অনুভবকে এমনভাবে নাড়া দেবার পরিকল্পনা করে যাতে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তাহীনতা ঘটতে পারে, তবে যে কোনো সরকার, তার কার্যক্রমের মেয়াদ যদি স্বল্পকালীনও হয়, তবু সে অবশ্যই এই আন্দোলনকে প্রতিহত করবে। কিন্তু নিছক নিপীড়নই এর সমাধান হতে পারে না। কেননা এই আন্দোলনের প্রচারকেরা একটা বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিচ্ছেন এবং মানুষকে বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে তাঁরাও শত্রুর এই বিঘ্ন উৎপাদকারী আক্রমণকে প্রতিহত করতে চান। কিন্তু একটি ক্রীতদাস দেশ হিসেবে নয়। এক মুক্ত দেশের মানুষ হিসেবেই এ কাজে যোগ দিতে চান তাঁরা। অথচ শাসক সম্প্রদায় এ দেশের সন্তানদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতার হস্তান্তর না করার বিষয়ে একেবারে স্থির প্রতিজ্ঞ...
>
> ইংলন্ডের প্রতি ভারতবর্ষের মনোভাবের প্রসঙ্গে বলা যায়, পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো লড়াই-ও থাকে, এই সন্ধিক্ষণে সেটা ঘটতে দেওয়া অনুচিত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে বর্তমানের এই যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত পুরোনো ধারণাকে এখন মাটির নিচে সমাধিস্থ করতে হবে। বর্তমান যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, কবর খুঁড়ে তাকে আর পুনরায় বাঁচিয়ে তোলা চলবে না...
>
> আপনার অনেকদিনের পুরোনো আধিকারিকবৃন্দ এবং আমার বিশ্বাস আপনিও আন্দোলনকারীদের মতামতে প্রভাবিত। আপনারা সকলেই

দেশপ্রেমিক বাঙালিদের সহযোগিতা স্বীকার করার ভাবনাতেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। কেননা খুব খারাপ পরিস্থিতির কথা ভাবলে ধরে নেওয়া যায় যে, এইসব বাঙালিরা এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নীতির প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন। আপনি যদি এই পরিস্থিতিতে আপনার দপ্তরে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করার আশা করেন, তবে এখানেই আপনার কূটনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ-প্রয়োগের জন্য আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাকে যদি আমার নিজের রাস্তায় তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে দেন, তবে এই মুহূর্তেই আমি তাদের সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ করতে পারি এবং তাদের সদিচ্ছাপূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাব দিতে পারি।'[৩৩]

সবই বেশ স্পষ্ট। কংগ্রেস এবং তার ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য মুখার্জি ব্রিটিশের দিকে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করছেন। ব্রিটিশ যদি সম্মত হয়, তবে মুখার্জি অত্যন্ত উৎসাহে ব্রিটিশের আজ্ঞাবাহক হিসেবে তাদের সেবায় নিয়োজিত হতেন। ১৯৩৯ সালের ৯ই অক্টোবর মুম্বাই-এ তাঁদের নেতা যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারই অনুসরণে এটি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মহাসভা-ব্রিটিশ জোট হয়ে উঠতে পারতো। মুখার্জি এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই রাখেননি।

'প্রশ্ন হলো, বাংলায় এই আন্দোলনের বিরোধিতা কীভাবে করা যায়? প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে কংগ্রেসের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রদেশের কোথাও এই আন্দোলন দানা বাঁধতে ব্যর্থ হয়। আমাদের পক্ষেই এটা করা সম্ভব। বিশেষত আমরা যারা দায়িত্বশীল মন্ত্রী তারাই মানুষকে বলতে পারি, যে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস এই আন্দোলন শুরু করেছে, সেটি ইতিমধ্যেই এই গণ-প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই বিরাজমান।'[৩৪]

ব্রিটিশ জানত যে, গুরুত্ব দিতে হলে কংগ্রেসকেই দিতে হবে, মহাসভাকে নয়। মুখার্জির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হলো। নিজের বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে ১৯৪২ সালের ১৬ই নভেম্বর তিনি পদত্যাগ করলেন। কিন্তু পদত্যাগের সময় এমন সব প্রসঙ্গ আনলেন যার একটিও তাঁর প্রস্তাবে ছিল না।

১৯৪৬ সালের ৬ই জানুয়ারি তাঁর ডায়েরির একটি লেখায় তাঁর উত্তরসূরী বিজেপি-র নীতিসমূহের পূর্বসূত্র পাওয়া যায়। 'পঁচাত্তর শতাংশ জনসমষ্টি যেহেতু হিন্দু, কাজেই ভারতবর্ষকে যদি সরকারের গণতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ করতে হয়, তবে হিন্দুরা আপনা থেকেই সেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।'[৩৫] গান্ধীজী এবং নেহরু ধারাবাহিকভাবে এই মনোভাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। হিন্দুরাই ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অন্যেরা সংখ্যালঘু, একথাই অবশ্যই সত্য। কিন্তু এটি সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠর বিষয় নয়। এ হলো রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে ভারতবাসী হিসেবে সহ-নাগরিকদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগবাটোয়ারা করেই দেশ শাসন করতে হবে।

বিখ্যাত পণ্ডিত জয়া চ্যাটার্জির প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণায় দেখতে পাওয়া যায় যে, মুখার্জি কেবল যে সাভারকারের দ্বিজাতি-তত্ত্বকে অনুমোদন করেছেন তা নয়,

এছাড়াও সাভারকারের মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গেও তিনি সুর মিলিয়েছিলেন। 'অনেক হিন্দু ভদ্রলোকের (এর মধ্যে মুখার্জিও রয়েছেন) মুসলিমদের প্রসঙ্গে উচ্চমন্যতার যে ধারণা সেটি এই বিশ্বাসে পুষ্ট ছিল যে, বাঙালি মুসলিমরা কমবেশি হিন্দুসমাজের একেবারে পতিত শ্রেণী থেকে আসা 'একদল ধর্মান্তরিত'।[৩৬] সাভারকার, গোলওয়ালকর এবং মুখার্জির কাছে হিন্দু এবং মুসলিম, দু'টি জাতিসত্তার সদস্য হওয়ায় পরস্পরের থেকে কেবল আলাদাই নয়, মুসলিমরা মানবগোষ্ঠীতে ইতরযোনিজ। তাঁদের যুক্তিবোধের বিকৃতিতে তারা শ্বাসরুদ্ধ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠন এবং ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনাকে সাভারকার কীভাবে দেখতেন সেটা বিচার করা যাক :

> ভারতবর্ষ যেহেতু বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত একটি স্থান কাজেই একে যদি একটি দেশ হিসাবে কল্পনা করতে হয় তবে তার যেমন একটি জাতীয় সীমারেখা থাকতে হবে, তেমনি এরই সঙ্গে নিজেদের হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্টান বা পার্শী বলে না ভেবে অবশ্যই ভারতীয় বলে ভাবতে হবে। সেকারণেই তারা, আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষজনের নেতারা, যাদের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু, তাঁরা প্রাণপণে নিজেদের হিন্দু না ভাববার চেষ্টা করতেন। তাঁদের চিন্তায়, হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের যে কোনোরকম স্বীকৃতিই তাঁদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর ছিল। রাতারাতিই তাঁরা 'সকলেই কেবলমাত্র ভারতীয় দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন... তাই ব্রিটিশ সরকার যে এই আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এবং একজন ভাইসরয় এতে যোগও দিয়েছিলেন, একথা মনে রাখতে হবে। মি. হিউম, ওয়েডারবার্ন এবং আরো অন্যান্য অনেক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী দীর্ঘকাল এই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। জন-উন্মাদনী উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মহান হিন্দু নেতারাও একে লালনপালন করেছেন। অবশেষে এটি ভারতীয় দেশপ্রেমের নতুন ঘরানার সংগঠিত এবং কর্তৃত্বকারী মুখপত্র হয়ে উঠল। (HRD, পৃ. ৪৮-৪৯)

অতএব, কংগ্রেস হলো ব্রিটিশের সৃষ্টি। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উচ্চপথ থেকে সরে এসে সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্ধকার পঙ্কিল সংকীর্ণ-পথে প্রবেশ করার জন্য তিনি হিন্দুদের প্ররোচিত করেছিলেন।

> হিন্দু সঙ্ঘাবলম্বীরা, আসুন আমরা সেই মৌলিক ভুলটি সংশোধন করি। সেই আদিম রাজনৈতিক পাপ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসী আন্দোলনের সূচনাতেই আমাদের হিন্দু কংগ্রেসীরা যে ভুলটি করেছিলেন। আর অঞ্চলগত ভারতীয় রাষ্ট্রের মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়িয়ে আজ তাঁরা সেই একই ভুল করে চলেছেন। একটি সজীব হিন্দু রাষ্ট্রের জন্ম ও বিকাশের সম্ভাবনাকে এই ভুলের কারণেই তাঁরা অঙ্কুরে বিনাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। (পৃষ্ঠা ৬৩)

এই হলেন সাভারকার। তাঁর আজকের একান্ত অনুগামী আদবানি আর বাজপেয়ী উচ্চকণ্ঠে যাঁর গরিমা প্রচার শুরু করেছেন।

নিজের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় সাভারকার জাতীয় পতাকা হিসেবে ত্রিবর্ণরঞ্জিত

পতাকাটিতে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'গেরুয়া পতাকা-ই হবে ভারতের জাতীয় পতাকা। বৈদিক যুগ থেকেই আমাদের জাতিগোষ্ঠী যে ভাবাবেগের জয়গান গেয়ে এসেছে, ওম, স্বস্তিক এবং তরবারি লাঞ্ছিত এই পতাকা সেই ভাবাবেগের কাছেই তার আবেদন জানাবে। (পৃ. ১০৬)

শিশুসুলভ মিথ্যা আর গুজব হলো পুরোনো সাম্প্রদায়িক চাল। এরও একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং সাভারকারের কাছে তারই চিহ্নের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে সাভারকার গান্ধী কিংবা নেহরুর প্রস্তাবনাকে এই বলে দোষারোপ করেছেন যে, তাঁরা কখনো সামনে দিকে এগোননি। উদাহরণ হিসেবে, এরকম চারটি মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত করা হলো, যার প্রত্যেকটাই নির্জলা মিথ্যা।

> মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যিনি হিন্দুস্থানীকে উর্দুর তুল্যমূল্য বলে আমাদের আশ্বস্ত করে তবে এর স্বপক্ষে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই আজাদকেও পেছনে ফেলে পণ্ডিত নেহরু ভাবছেন, ভারতবর্ষ, যেখানে প্রায় আটশ কোটি বা ঐরকম সংখ্যক হিন্দু রয়েছেন, সেখানে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে আলিগড় কিংবা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরানার উর্দুই জাতীয় ভাষা। (পৃ. ১১০)
>
> একজন মুসলিম পিছু তিনটি ভোট এই দাবি তুলে মুসলিম লীগ একেবারে খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে। তেমনি সেই দাবির প্রতি সমর্থন এবং তিনজন হিন্দু পিছু একটি ভোট এই প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য হিন্দুদের আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস কাপুরুষের মতো সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছে। (পৃ. ১২১)
>
> যে তথ্যটি লক্ষ্য করে সবচেয়ে বিস্মিত হতে হয় তা হলো, এইসব হিন্দু নেতারা, অন্য সব মুসলিম নেতাকেও এমনকী আলি ভ্রাতৃদ্বয়, 'জাতীয়তাবাদী' মৌলানা আজাদকেও ছাড়িয়ে গেছেন। আমির যদি দিল্লি দখল করতে পারে তাহলে আমরা স্বরাজ জয় করে নিতে পারবো এমন ধারা কথাই তাঁরা বলে চলেছেন।— অর্থাৎ আফগানদের শাসনই হলো আসলে স্বরাজ এই কথাটিই নির্দিষ্টভাবে তাঁরা বললেন। (পৃ. ১২৭)
>
> (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) সময়কালে, প্রাক্তন আমির আমানুল্লা খানকে ভারতে ইসলামের ভাগ্যনির্ধারিত উদ্ধারকর্তার ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। আর গান্ধীজীর পরোক্ষ বিশ্বাসঘাতী সম্মতির সহায়তায়, দুই মহান 'জাতীয়তাবাদী' নেতা, আলি ভ্রাতৃ-দ্বয় ভারতের সম্ভাব্য অভিষিক্ত সম্রাট হিসেবে তাঁকে দিল্লি নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র করলেন। (পৃ. ২৩৭)

নাৎসিদের সঙ্গে যোগাযোগ

সাম্প্রতিক নানান গবেষণায় একটি বিষয় প্রকাশ্য আলোয় উন্মোচিত হয়ে গেছে যে, আর এস এস-মহাসভা নেতৃত্ব যে কেবল হিটলার এবং মুসোলিনীর প্রতি সপ্রশংস ছিল তাই

নয়, বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে তাঁদের সুদৃঢ় গোপন আঁতাত ছিল। নাজি জার্মানির প্রতি সাভারকার এবং সেই সঙ্গে গোলওয়ালকরের মোহাবিষ্ট সংযোগের তথ্যভিত্তিক সযত্ন অনুসন্ধান করেছেন মার্জিয়া কাসোলারি।[৩৭]

হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল এবং অস্ট্রিয়া দখলকে সাভারকার সমর্থন করেছিলেন। গোলওয়ালকর, আরেকজন জাতিগত বিশুদ্ধবাদী, হিটলারের পাশবিক ইহুদী বিনাশকে প্রশংসা করেছিলেন। (পৃষ্ঠা ২২৩-২৪)। কিন্তু প্রাচীন তথ্য গবেষণা কালে মার্জিয়া কাসোলারি কেবল যে 'মুসোলিনী এবং হিন্দু মহাসভা সহ বিশ্বের সমস্ত ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ'-এর প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন তাই নয়, আর এস এস এবং হিন্দুমহাসভার মধ্যে সম্পর্কের যে ঘনিষ্ঠতার কথা আজ প্রথম সংগঠনটি কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না, তার চেয়েও তারা যে অনেক বেশি কাছাকাছি ছিল তার প্রমাণও তিনি পেয়েছিলেন। এই ঘটনা এক দিকে সাভারকারের সঙ্গে গডসের এবং অন্যদিকে গডসের সঙ্গে আর এস এস-এর সম্পর্কের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ প্রসঙ্গে আরো বিশদ আলোচনা করবো।

মার্জিয়া কাসোরালি সরাসরি মহাসভা আর এস এস-এর সম্পর্কের বিষয়ে তথ্য পেশ করেছিলেন :

> সাধারণ্যে স্বীকৃত এবং জঙ্গী হিন্দুবাদী সংগঠনের দ্বারা সমর্থিত মতামত অনুসারে, আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা কখনো তেমনভাবে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ছিল না এবং সাভারকারের সভাপতিত্বকালে এদের মধ্যে যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়। যাই হোক বাস্তবে বিষয়টি কিছুটা আলাদা। বস্তুত প্রাপ্ত-তথ্যপ্রমাণাদি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এদের মধ্যে কখনো এমন বিচ্ছেদ তো ঘটেইনি, বরং দু'টি সংগঠনের মধ্যে সর্বদাই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ (কাসোরালির রচনার ১৩ নং. টীকা) হেডগেওয়ার যে হিন্দু মহাসভার সম্পাদক ছিলেন, সে কথা আমরা ভুলতে পারি না। হিন্দুমহাসভাকে আর এস এস সমর্থন করতো বলেই মনে হয়। কেননা সাভারকারের মুক্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভাগুলিতে আর এস এস জঙ্গীরা দলে দলে যোগ দিত (ক্যাসোলারির রচনার ১৪নং টীকা)।

১৩ এবং ১৪নং পাদটীকা একটু বিশদভাবে পুনরায় লিখিত হয়েছে :

> ১৩ : তদুপরি, এটা মনে হয় যে, সাভারকারের হিন্দুত্বে যে ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে, হেডগেওয়ার তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেডগেওয়ার যখন তার সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি সাভারকারের পরামর্শ এবং উপদেশ পাওয়ার জন্য রত্নগিরিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে, সাভারকার রত্নগিরিতে অন্তরীণ থাকাকালীন, হেডগেওয়ার সবসময় বাবারাও সাভারকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। নাগপুরে হেডগেওয়ারের কাগজপত্রের মধ্যে, বাবারাও সাভারকার, যিনি আর এস

এস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং হেডগেওয়ার এদের পরস্পরকে লিখিত অনেক চিঠিপত্র আমি পেয়েছি।

১৪ : মুক্তি পাওয়ার পর বিভিন্ন প্রসঙ্গে সাভারকার 'নাগপুরের ড. হেডগেওয়ারের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকে তাদের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলার জন্য' অভিনন্দিত করেছেন। ১৯৩৯ সালের ২৯শে জুলাই আর এস এস উদ্যাপিত 'গুরুপূর্ণিমা' উৎসবে প্রায় ৫০০০ মানুষের সমানে সাভারকার ভাষণ দিয়েছিলেন। আবার কয়েক বছর পরে, আর এস এস-এর অফিসার প্রশিক্ষণ শিবির যেটি ১৯৪৩ সালের ২৭শে মে থেকে ২৯শে মে পুনেতে সংগঠিত করা হয়েছিল, সেখানে শিবির চলাকালীন গোলওয়ালকর, বাবারাও সাভারকার, বি এস মুঞ্জে এবং প্রায় ৫০০০ মানুষের উপস্থিতিতে হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি অধিকসংখ্যক স্বয়ং সেবকদের শারীরিক কৌশল প্রদর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, হিন্দুবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সংগঠনে এত বিপুল সংখ্যক হিন্দু যুবক যুবতীকে যোগদান করতে দেখে তিনি গর্ব অনুভব করছেন। তাঁদের নেতার জন্য অর্থ সংগ্রহের অভ্যাস জঙ্গীদের ছিল। পুনেতে ১৯৩৭ সালের আগস্টে, স্থানীয় জঙ্গী এবং সহমর্মীরা তাঁকে ২৫০ টাকা দিয়েছিলেন। কয়েকবছর পরে, সাভারকারের একষট্টি বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট যেসব হিন্দু সংগঠনে সাভারকার তার প্রচারাভিযানে গিয়েছিলেন, তার একটিতে সেই সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বেশ ভালো পরিমাণ অর্থসংগৃহীত হয়েছিল। উপরিল্লিখিত অফিসার প্রশিক্ষণ শিবিরে, যেখানে সাভারকার তাঁর জন্মদিন উদ্যাপন করেছিলেন, সেখানে হিন্দু সংগঠনগুলি, পুনে পৌরসভা এবং ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকেরা ১,৮০,০০০ টাকা অনুদান সংগ্রহ করেছিল।[৩৯]

আর এস এস এবং মহাসভা : বন্ধু না শত্রু?

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'Towards Freedom Series'-এর খণ্ডগুলির একটিতে অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণাকর্মে মার্জিয়া কাসোলারির সিদ্ধান্তটি দৃঢ়তর হয়।[৪০] এই পর্যায়ে প্রফেসর কে এন পানিক্কর এবং সুমিত সরকারের সম্পাদিত অন্যান্য খণ্ডগুলির প্রকাশনা কেন ভারত সরকার বন্ধ করে দিলেন, এতেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর এস এস এবং মহাসভার গোপন আঁতাতের গোটা গোয়েন্দা রিপোর্ট গুপ্তা পুনরায় প্রকাশ করেন। নিচের তিনটি টুকরো অংশ বিশেষভাবে সত্য উদঘাটনী :

১) ১৯৪২ সালে আর এস এস সংক্রান্ত একটি টীকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে : হিন্দু মহাসভার ঘোষিত নেতা ড. বি এস মুঞ্জে প্রায়শই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন এবং বারবার তাদের বলতেন যে, হিন্দুস্তান হিন্দুদেরই এবং তাকে ব্রিটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

২) আর এস এস প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে একটি টীকায় লেখা রয়েছে : আর এস এস-এর আন্দোলন সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার সহানুভূতি ও সমর্থন বিষয়ে আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভি ডি সাভারকারের পুনে শিবির পরিদর্শনের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ১লা আগস্ট তিনি আরাওটিতে সংঘ এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সমিতির ৫০০ সদস্যকে পরিদর্শন করেন এবং হিন্দু একতার পক্ষে লড়াই চালানোর জন্য তাদের আহ্বান জানান। সঙ্ঘের আরো বিকাশের স্বার্থেই যে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাদাউনে সংঘের রিলিফ সংগ্রহ এমন কথা বলা হয়েছে। এটিও বেশ তাৎপর্যময়। (অন্য দিকে, আগস্টের শেষে রিপোর্ট পাওয়া গেল যে, নানান কারণে দিল্লি শাখা যেহেতু মহাসভার সঙ্গে একত্রে পরিচিত হতে চায়নি, সেকারণে শেষোক্ত সংগঠনটি সংঘের প্রতি একধরনের বৈরি মনোভাব পোষণ করত এবং তারা মহাসভা ভবনে প্রাত্যহিক কুচকাওয়াজের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল।)[৪২]

দু'টিই পরস্পর বিবাদমান পক্ষ এটা দেখাবার জন্য এইরকম কিছু বিচ্ছিন্ন পার্থক্যের উদাহরণ এখন আনা হচ্ছে। কাজেই সাভারকার আর আর এস এস-এর মধ্যে মতবিরোধ ছিল আর গডসে আর.এস.এস-এ ছিলোই না। প্রেমিকযুগলের ঝগড়ার মতো এই... যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী ছিল।

৩) ১৮ই মে, ১৯৪২ তারিখে আর এস এস সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তরের টীকায় বলা হলো: এর (আর এস এস) আসল উদ্দেশ্য হলো 'হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান' দখল করা। আর এই উদ্দেশ্যে এর আকাঙ্ক্ষা হলো— সমস্ত হিন্দুদের একত্র করা, তাদের সামরিক উদ্যমে উদ্দীপ্ত করতে সামরিক শিক্ষণে শিক্ষিত করা, তাদের শরীর, তাদের চরিত্র গঠন করা এবং সর্বোপরি একটি শক্তিশালী হিন্দু সামরিক বাহিনী গঠন করা। শেষাবধি ব্রিটিশ এবং মুসলিম উভয়ের শাসন থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন ভারতবর্ষ পাওয়াই এর লক্ষ্য। সংঘে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রত্যেকটি প্রার্থীকে সংগঠনের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নলিখিত গোপন শপথ অবশ্য নিতে হয় :

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং আমার পূর্বপুরুষদের সামনে একান্ত ভক্তিভরে আমি এই শপথ করছি যে আমার পবিত্র হিন্দু, হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সদস্য হচ্ছি। সততায় এবং ব্যক্তিস্বার্থহীনভাবে আমরা কায়মনোবাক্যে সংঘের কাজ সম্পাদন করবো এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই শপথের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো।

'জয় বজরং-বলি-বলভীম-কি-জয়'...

কয়েকদিন পরে, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৯ ভি ডি সাভারকারের ভাই ড. এন ডি সাভারকার নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ৩০০ স্বেচ্ছাসেবককে

বলেন যে, হিন্দুবাদের শত্রু ব্রিটিশ সরকার, মুসলিম এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আর্য সমাজ এবং হিন্দুসভার সহযোগী মিত্র তারা। গোটা ১৯৪০ সাল, বক্তারা অনবরত সংঘের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'স্বরাজ' পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশিত মুসলিম আক্রমণের মোকাবিলা করতে একটি কার্যকর সম্ভাবনাময় শক্তি গড়ে তোলা এবং হিন্দুবাদকে রক্ষার লক্ষ্যটিতে বার বার গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪০ সালের নভেম্বরে বোম্বাই প্রদেশে একটি সভাকে সম্বোধিত করে সংঘের বর্তমান প্রধান সংগঠক, প্রফেসর এম এস গোলওয়ালকর মহাসভার হিন্দু শাসনাধীনে একটি অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্যান-হিন্দু তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেন...

নীতি : হিন্দু মহাসভার সংস্পর্শে সঙ্ঘের নীতি বেশ লক্ষণীয় মাত্রায় প্রভাবিত হয়। কোনো সংগঠনের নেতারাই যেহেতু প্রকাশ্যে তাদের পারস্পরিক সাহচর্যের কোনো উল্লেখ কখনো করেননি, তাই হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস পরস্পরের কতটা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত সেটা সঠিকভাবে জানা নেই। যাইহোক, ভি ডি সাভারকার, ড. বি এস মুঞ্জের মতো হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গ সংঘের কাছ থেকে যেরকম শ্রদ্ধাসম্মান পেয়ে থাকেন, আর সংঘ সম্পর্কে জনসমক্ষে ঐসব নেতৃবৃন্দ যেমন ঘোষণা করেন, তাতেই এটা বেশ পরিষ্কার। ড. হেডগেওয়ার যখন মারা যান, তখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে ভি ডি সাভারকার ৩০শে জুন, ১৯৪২ তারিখটি তাঁর সম্মানে শোকদিবস হিসেবে পালনের জন্য গোটা ভারতবর্ষের হিন্দু সভাগুলিকে নির্দেশ দিলেন। এটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দু মহাসভার কোনো ঘোষিত নীতি সম্ভবত সংঘের নীতিকেও প্রভাবিত করবে।

১৯৩৯ সালে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনে বলা হলো যে, সংঘের নেতৃবৃন্দ কয়েক বছরের জন্য প্রকাশ্যে কোনোরকমের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের পক্ষে নয়। কেননা সময় আসার আগেই এ-ধরনের কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার অর্থ হলো সংগঠনের সমাপ্তি ডেকে আনা। গণতন্ত্রে তাদের কোনো বিশ্বাস নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, কেবলমাত্র হিংসার পথেই স্বাধীনতা আনা সম্ভব...

যদি ভবিষ্যৎ-এ কোনো সময় সংঘ অথবা তার রাজনৈতিক সঙ্গী হিন্দু মহাসভা এমন কোনো নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ডেকে আনতে পারে, সে সময়ের জন্য সংঘের নেতাদের হাতে কাজে লাগবার মতো বিপুল সংখ্যক সুশৃঙ্খলিত এবং সুশিক্ষিত সেনা অফিসার এবং সক্ষম মানুষের মজুত ভাণ্ডার থাকবে। কেননা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত নতুন নতুন মুখের সংখ্যা ব্যাপকহারেই বেড়ে চলেছে। ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ এবং ইউনিফর্মের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞার

প্রতি উপর্যুপরি অশ্রদ্ধা এবং মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক ঝঞ্ঝাটে নেমে-পড়া ছাড়া সংঘের কাজকর্মের বিষয়ে বিশেষ আপত্তিকর কিছুই নেই। কিন্তু তার মধ্যে সাংঘাতিক কিছু ঘটাবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে এটা নিশ্চিত। কয়েকটি জায়গা থেকে এই মর্মে মতামত পাঠানো হয়েছে যে, সংঘের জাপান-ঘেঁষা প্রবণতা রয়েছে। এর পক্ষে নেহাতই অল্প কয়েকটি যুক্তি আছে এবং কোনোভাবেই তাতে বিশ্বাস করা যায় না। সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগসূত্রের সুবাদেই সংঘকে জাপানপন্থী বলে ধরা হচ্ছে, এই মুহূর্তে খুব বেশি হলে এই কথা বলা যেতে পারে। অবশ্য শেষোক্ত দলটি অর্থাৎ মহাসভা যদি এরকম কোনো কাজকর্মের উদ্যোগ নেয় কিংবা তাদের বিকশিত করে তোলে তবেই এমন হওয়া সম্ভব।[৪৩]

রাজনৈতিক অসংলগ্নতা

রাজনৈতিকভাবে, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়েই সাভারকার একজন দম ফুরিয়ে-যাওয়া শক্তি হয়ে উঠলো। ১৯৪৪ সালের ১লা আগস্ট ভারত সরকারের দপ্তরে রাজনৈতিক বিভাগের বড় কর্তা জন পার্সিভাল গিবসন খাতায় লিপিবদ্ধ করলেন যে, ২৬শে জুলাই, ১৯৪৪ ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রসচিব লিওপোল্ড এস আর্নিকে পাঠানো সাভারকারের কেবল্‌টির 'প্রাপ্তি স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ তিনি করেননি'। ঐ কেবলটিতে দাবি করা হয়েছিল যে, মহাসভা হলো 'হিন্দুদের সর্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংস্থা।'[৪৪] প্রভাব হারাতে-বসা রাজনীতিকদের পাদপ্রদীপের আলোয় আবার ফিরে আসার যে সাধারণ উপায়— নিয়মিতভাবে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে যাওয়া— সাভারকার মরিয়া হয়ে সেই পথটি গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাভারকার একটার পর একটা দ্রুত বিবৃতি দিয়ে চলেছেন, এটাই নজরে আসে। ১৯৪৪ সালের ১৪ই মে তারিখে এমনি এক বিবৃতিতে তিনি 'হিন্দু সংঘাবলম্বীদের' কস্তুরবা গান্ধী মেমোরিয়াল ফান্ডে কোনো অর্থ না দিতে বলেছেন। তাঁর আত্মত্যাগকে তিনি ছোট করে দেখেন, সে কারণে নয়। কারণ একটাই, তাঁর স্বামীকে তিনি ঘৃণা করেন :

> এক অর্থে প্রস্তাবটি নির্দিষ্ট, যে কোনোভাবেই সংগৃহীত অর্থ গান্ধীজীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। ফলত, নতুন কংগ্রেসী তহবিলের শূন্য পূরণ করা ছাড়া এর আর কোনো কাজই নেই। ঠিক যেমন তিলক তহবিলের সংগ্রহে তহবিল উপচে পড়েছিল। এই তহবিলে কিংবা পছন্দমতো যে কোনো তহবিলে টাকা দেবার জন্য কংগ্রেসীদের স্বাগত জানাই। কিন্তু এর গায়ে একটা মিথ্যে তকমা এঁটে একে জাতীয় তহবিল বলে ঘোষণা করে, তারপর সব টাকা কংগ্রেসের কাজকর্ম প্রচারের জন্য খরচ করা এইভাবে জনগণকে বোকা বানাবার অধিকার তাদের নেই, বিশেষত যে কাজকে হিন্দু সংঘাবলম্বীরা হিন্দু স্বার্থের ক্ষতিকারক বলে মনে করে,... গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসা, চরকা, হিন্দু-মুসলিম

একতা, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া— এসব আসলে বড়ো সড়ো একটা জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে তিনি চান যে, মেয়েরাও সংগঠনের মধ্যে কাজ করবে। এই নীতিতে পরিচালিত এখনকার আশ্রমগুলিতেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। তিলক-স্বরাজ ছাপ লাগানো তহবিলের জমা-পড়া বিপুল টাকার অর্ধেক যেমন তিলকের নীতি এবং তাঁর মতানুসারী দলগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা করার জন্য, তাদের শেষ করে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যে 'খিলাফত' হিন্দু সংঘাবলম্বীদের অনুমান মতোই হিন্দুদের পক্ষে একটি সত্যিকারের 'আফত' হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই খিলাফতের প্রচার চালাবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদের পকেট বোঝাই করতে যেমন তহবিলের প্রায় বাকি অর্ধেক খরচ করা হলো, ঠিক তেমনি কস্তুরবা জাতীয় তহবিলের নির্দোষ তকমা আঁটা এই তহবিলটির জন্য সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ তিলকপন্থী এবং হিন্দু সংঘাবলম্বীরা ভবিষ্যৎ-এ যে দিনে তাঁরা টাকা দিয়েছেন সেই দিনটিকে অভিসম্পাত দেবেন।[৫৫]

প্রত্যাশিতভাবে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠায় সাভারকার জয়ধ্বনি করলেন। কারণ এই নয় যে, তিনি ইহুদীদের ভালোবাসতেন, কিংবা আরবদের ঘৃণা করেন এমনও নয়। কারণ, আরবের বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম। আরবের স্বার্থে বিশেষত প্যালেস্তাইনের জন্য আরবদের যেসব বিচক্ষণ মুখপাত্র রয়েছেন, যেমন চার্লস এইচ মালিক, এডওয়ার্ড সঈদ এবং হাসান আশরাঈ, এঁরা সকলেই যে আরবের খ্রিস্টান তাতে কিছু যায় আসে না। সাভারকারের আরব মানে হলো মুসলিম। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সালে তিনি বললেন;

> এটা লক্ষ্য করে আমি আনন্দিত যে, বিশ্বের সামনের সারির দেশগুলির বিস্ময়কর সংখ্যাধিক্য সমর্থনে ইহুদী জনগণের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্যালেস্তাইনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং একে বাস্তবে ঘটিয়ে তুলতে সশস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের পর ইহুদীরা খুব শীঘ্রই প্যালেস্তাইনে তাদের জাতীয় আশ্রয় ফিরে পাবে; সন্দেহাতীতভাবে এটি তাদের পিতৃভূমি এবং পবিত্রভূমি। ভালোই হলো। সম্ভবত তারা এই ঘটনাকে তাদের ইতিহাসের আর একটি গৌরবোজ্জ্বল দিনের সঙ্গে তুলনা করবে, যেদিন মোজেস তাদের ইজিপ্টের দাসত্ব আর মরুভূমি থেকে উদ্ধার পাবার পথে পরিচালিত করলেন; দুধ আর মধুতে ধোওয়া সেই প্রতিশ্রুত ভূমি যেদিন তাদের দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল...
>
> কাজেই, ন্যায়বিচারে সমগ্র প্যালেস্তাইনই ইহুদীদের অধিকারে থাকা উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জে শক্তিশালী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সে কথা বিবেচনা করে বলা যায়, যেকোনো মূল্যে প্যালেস্তাইনের একটি অংশে যেখানে ঘটনাচক্রে ইহুদীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থান যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানে ইহুদী রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়

> এই দেশগুলির সমর্থন, এটাই ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।
>
> সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে আমাদের হিন্দুস্থান সরকারের যে প্রতিনিধি রয়েছেন, এই ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে তাঁদের ভোট দেওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী তাঁর ভাষণে যখন অতিনাটকীয় ভঙ্গিমায় ঘোষণা করেন যে, একটি পৃথক ইহুদী রাষ্ট্র তৈরি করে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের একতা ও সংহতিকে ভারত সরকার পেছন থেকে ছুরি মারতে পারেন না, বিশেষত তখনি তাঁর ভাষণগুলি হাস্যকর হয়ে ওঠে।[৪৬]

ক্রমাগত রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা এবং অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার ফলে সাভারকারের তিক্ততার পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই তিনি বিদ্বেষে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। ঐ একটা আবেগই তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হতো। সর্বক্ষণের জন্য গান্ধীই ছিলেন তাঁর ঘৃণার প্রধান বিষয়বস্তু। ৬ই জুন, ১৯৪৪ ভারত বিভাগের অল্প কিছুদিন আগে তিনি গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগের তকমা এঁটে দিলেন :

> আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গান্ধীজী কি নিজেই ভারতে পাঠান আক্রমণ ডেকে আনেননি, ভারত সম্রাট হিসেবে আফগানিস্তানের আমীরকে সিংহাসনে বসাতে চাননি? ১৯৪০ সালে তিনি কি নিজেই আবার কালিকলমে একথা ঘোষণা করেননি? বার বার এখানে ওখানে বলে বেড়াননি যে, হিন্দু রাজাদের খাটো করে নিজাম যদি সীমান্তবর্তী আদিম জনজাতিদের সমর্থন নিয়ে দিল্লি দখল করেন এবং ভারতের শাসক হয়ে ওঠেন, তবেই সেটা হলো সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, একশ শতাংশ স্বরাজ? অতএব, একটি পাঠানী বা নিজামী মুসলিম-রাজ গান্ধীজির কাছে একশ শতাংশ স্বরাজ।[৪৭]

দেশবিভাগের পর সাভারকার তাঁর সমস্ত বোধবুদ্ধি যে একেবারেই খুইয়ে বসলেন, তা বেশ ভালোই বোঝা যায়।

৫. গান্ধী-হত্যা

রেক্স বনাম নাথুরাম গডসে এবং বিনায়ক ডি সাভারকার সহ অন্যান্যরা— এই মামলায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে, নতুন দিল্লির বিড়লা ভবনের মাঠে প্রার্থনাসভায় গডসে গান্ধীকে লক্ষ্য করে খুব নিকট দূরত্বে পিস্তল থেকে পর পর তিনটি গুলি ছোঁড়েন। 'হায় রাম' শব্দটি উচ্চারণ করে গান্ধী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এমন ঘটনার কথা কেউ ভাবেনি। অনেকেই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। না হলে ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়তে পারে, এমন অনেক মানুষই হয়ত সেখানে ছিল। গান্ধীকে বিড়লা ভবনে তাঁর ঘরে নিয়ে যাবার পর গুলির আঘাতে জর্জর শরীরে তিনি শীঘ্রই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গডসে ধরা পড়ে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নন্দলাল মেহতা, যিনি ঘটনাচক্রে সেদিনের উপাসনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাঁর দেওয়া প্রথম সংবাদ-প্রতিবেদনটি তুঘলক রোড পুলিস স্টেশনে জমা পড়ে। এটি উর্দুতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুলিস স্টেশনে গডসে তার বয়েস পঁচিশ বছর বলেছিল। বস্তুত তার বয়স ছিল সাঁইত্রিশ।

গডসের সঙ্গে সাভারকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এই অপরাধের ষড়যন্ত্রের সন্দেহ সাভারকারের ওপর এসে পড়ে। গডসের ভাই গোপাল গডসে ১৩মে, ১৯৬৯ একটি সাক্ষাৎকারে একথা ওয়াল্টার অ্যান্ডারসনকে বলেছিলেন।[১] সাভারকার এবং গডসে ১৯২৯ সাল থেকে পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। ঘটনার ঠিক পরের দিন সাভারকারের বাড়ির খানাতল্লাশি হয়। তাঁর জীবনীকার যেমন লিখেছেন : 'অধঃস্তন নাথুরাম গডসের অগ্রগামিতা সাভারকারকেও রেহাই দিল না। তাঁকেও এরসঙ্গে জড়িয়ে ফেলল।'

ফেব্রুয়ারি ৫ তারিখের ভোরে সাভারকারকে বোম্বের জন-নিরাপত্তা রক্ষা আইন-১৯৪৭ অনুসারে আটক করা হয়। ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে তিনি সরকারের কাছে মুচলেকা দেবার প্রস্তাব করে পুলিস কমিশনারকে লিখলেন যে, আমাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয় তবে তার শর্ত হিসেবে সরকার যতদিন চাইবেন ততদিন আমি যে কোনো সাম্প্রদায়িক কিংবা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব।[৩] এতেও তিনি মামলা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। তিনি নিজেও নিশ্চিতরূপে জানতেন যে এটি আসন্ন। সরকারের যদি কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতো তাহলেই এরকম অপমানজনক এবং স্পষ্টত খোলামেলা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু

সরকার তা করেনি। হত্যার পরেই পুলিস কমিশনার জে এস ভারুচা সাভারকারের সঙ্গে নিজে দেখা করেন। গান্ধীহত্যার সঙ্গে যে তাঁর বিন্দুমাত্র যোগ আছে, এ কথা সাভারকার একেবারে সোজাসুজি অস্বীকার করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুলিস অফিসারের কাছে সমগ্র ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয়। কুড়ি বছর পর 'মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন'-এর কাছে তাঁর দেওয়া জবানবন্দী অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস জীবন লাল কাপুর লিপিবদ্ধ করেন,

> এর থেকে মি. ভারুচার মনে হয় কোথাও একটা গোলমাল রয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রী মোরারজী দেশাই-এর (বোম্বের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন যে তিনি সাভারকারকে সন্দেহ করেন। সেইসঙ্গে সাভারকার তাঁকে যা বলেছিলেন তা-ও তিনি বললেন। শ্রী মোরারজী দেশাই ভারুচাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি কেন?' সেসময়ে সাভারকার সত্যিই অসুস্থ ছিলেন এবং মি. ভারুচা এ বিষয়ে সব কথাই শ্রী মোরারজী দেশাইকে বললেন। তখন পর্যন্ত মি. ভারুচা জানতেন না যে, সাভারকারের বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এখানে সম্ভবত এই মন্তব্য করা হয়েছিল, মি. নাগরওয়ালা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সাভারকার অসুস্থতার ভান করছেন।[8]

আগাম সংবাদ

মাত্র ৩২ বছর বয়সে জামসেদ ডি নাগরওয়ালা বোম্বের ডেপুটি পুলিস কমিশনার হন। তিনি বোম্বের অপরাধ তদন্তকারী দপ্তরের ১ এবং ২নং বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজনৈতিক গোপন খবর সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল এবং তিনি মোরারজী দেশাই-এর যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছিলেন। ২১শে জানুয়ারি মন্ত্রী মহোদয় তাঁকে বোম্বে সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে ডেকে পাঠান কেননা তাঁকে দেবার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ছিল। খবরটি তিনি বোম্বের রুইয়া কলেজের হিন্দি এবং আধামগধি-র অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র জৈনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর 'আমি বাপুকে বাঁচাতে পারিনি'[৫] শীর্ষক বইটিতে তিনি পুরো গল্পটা বলেছেন। সংক্ষেপে ঘটনাটি হলো, পাঞ্জাব থেকে আগত একজন তরুণ শরণার্থী মদনলাল পাহওয়াকে জৈন সাহায্য করেন এবং তার বিশ্বাস অর্জন করেন। সে গান্ধী হত্যার একটি পরিকল্পনা জৈনকে বলে ফেলে। বিষ্ণু আর কারকারে ছিল তার শেঠ (মালিক)। মদনলালের মতো সে-ও থাকতো আহমেদনগরে। তার কাজকর্ম বিষয়ে সাভারকার অবহিত ছিলেন। 'সাভারকার আমার পিঠ চাপড়ে যে কাজ করছি তা করে যেতে বললেন।' জৈন অত্যন্ত অস্বস্তি পড়লেন। 'অল্পবয়সী ছেলেটিকে অন্যরা যেভাবে উত্তেজিত করছে, তাতে ও যে কোনোরকম হিংসাত্মক কাজ করে বসবে। তার ওপর সে সাভারকারকে দেখেছে, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছে।' (পৃ. ১৫)

একেবারে নিশ্চিত হয়ে ২০শে জানুয়ারি মদনলাল বিড়লা ভবনের পেছন দিকে

Gun Cotton Slab (একটি দেশি বিস্ফোরক) জ্বালাল। তাতে ভবনের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গে সে ধরা পড়ল এবং গ্রেপ্তার হলো। তার পরামর্শদাতা নাথুরাম গডসে, নারায়ণ ডি আপ্তে, গডসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিষ্ণু কারকারে, দিগম্বর আর ব্যাজ এবং ব্যাজ-এর চাকর শঙ্কর কিস্তাইয়া সকলেই সেখান থেকে পালাল।

জৈন যখন পরের দিন সংবাদপত্রে ঘটনার বিবরণ পড়লেন তখন তাঁর সর্বনাশা আতঙ্ক নিশ্চিত প্রমাণিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর যা যা জানা ছিল সবকিছু মোরারজী দেশাই এবং প্রধানমন্ত্রী বি জি খেরকে জানালেন (পৃ. ৪২)[৬]। জৈন এবং দেশাই দুজনেই হত্যা-মামলার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ২১শে জানুয়ারি মন্ত্রী মহোদয় নাগরওয়ালাকে সাভারকারের বাড়ির ওপর নজর রাখা, তৎক্ষণাৎ কারকারেকে গ্রেপ্তার করা আর 'এই পরিকল্পনার সঙ্গে কারা যুক্ত ছিল সেটি খুঁজে বার করার' নির্দেশ দিলেন (পৃ. ৮০)। নাগরওয়ালা নিজেই কাপুর কমিশনে স্বীকার করেছেন যে, 'নজরদারিতে দক্ষতা ছিল না।'

এই কাপুরুষোচিত অপরাধের অন্তত একসপ্তাহ আগে একটা আগাম খবর পাওয়া গেল। পরের কদিনে সে খবর আরো নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এসব সত্ত্বেও কেন যে গান্ধীর জীবন বাঁচানো গেল না, তাঁকে রক্ষা করা গেল না সে বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের আলোচ্যসূচীর মধ্যে পড়ে না। এখানে কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে, মামলার মাননীয় বিচারক জাস্টিস আত্মাচরণ, আই সি এস কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে তিরস্কার করেছিলেন যে, পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টের তিনজন বিচারক, জাস্টিস এ এন ভাণ্ডারী, আচুরাম এবং জি ডি খোসলা যারা এই শুনানী-আবেদন শুনেছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত অজ্ঞতায়, দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো এদের দোষ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। জাস্টিস কাপুর আরো অর্বাচীন অপরাধও দেখতে পেরেছিলেন।[৭] বোম্বে পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দিল্লি পুলিস প্রস্তুত ছিল না। ৩১শে জানুয়ারি, নাগরওয়ালাকে তাঁর অন্যান্য কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির পুলিস-সুপার নিযুক্ত করা হলো। তদন্তে সমস্ত শাখাপ্রশাখা সমেত সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হলো। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় আর গোপন রইল না। ১১ই মার্চ গান্ধীহত্যা ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার হবার অপরাধে দিল্লির প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেটের থেকে আসা একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে দিল্লি পুলিস সাভারকারকে গ্রেপ্তার করল।

মে মাসের ৪ তারিখে কানপুরের জেলা এবং সেশন জজ আত্মাচরণ আই সি এস-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ আদালত গঠিত হলো। ১৩ই মে রেক্স বনাম নাথুরাম গডসে এবং অন্য আটজনের মামলাটি শুনানীর জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হলো। তালিকায় সাভারকার ছিলেন সাত নম্বর অভিযুক্ত। আরেকজন দিগম্বর রামচন্দ্র ব্যাজ সরকারী সাক্ষী হয়ে গেল এবং ২১শে জুন আদালত তাকে ক্ষমা করল। সে আইনজীবী নিতে অস্বীকার করেছিল এবং সমস্ত ঘটনার সত্য বিবৃতি দেবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেই এগিয়ে এসেছিল। এক সপ্তাহ ধরে তাকে জেরা করা হলো। অবশেষে তার সাক্ষ্যের সত্যতা আদালত স্বীকার করল।

যে দিন দিল্লির লালকেল্লায় এই মামলায় শুনানী শুরু হলো, সেই ২৭শে মে

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তৈরি করা অভিযোগপত্র বা চার্জশিট আদালতের সামনে পেশ করা হলো।

অভিযোগপত্র বা চার্জশিট

আদালতে বোম্বের অ্যাডভোকেট জেনারেল সি কে দপ্তরী সরকারী পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন। সরকারী পক্ষের প্রধান উকিল অন্য কেউ নন, স্বয়ং সহ-প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল। তদন্তের কাজ যতই এগোল, ততই মোরারজী দেশাই এবং বল্লভভাই প্যাটেল দুজনেই এই অপরাধে সাভারকারের যোগসাজশের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। বোম্বের সংসদীয় কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৮ দেশাই অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে বললেন যে, সাভারকারের অতীতের সমস্ত সুকৃতি তার বর্তমান দুষ্কৃতিতে একেবারে ম্লান হয়ে মুছে গেছে।[৮]

প্যাটেল যদি সাভারকারের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত না হতেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ করা যেত না। তাঁর সমকালে তিনি ছিলেন একজন দুঁদে ফৌজদারী উকিল। তাঁর দক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসিত ছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ প্যাটেল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে লিখলেন, 'বাপু হত্যা সংক্রান্ত তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে আমি প্রায় প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে যুক্ত রেখেছি। সারা দিনে কি কি অগ্রগতি হলো সে বিষয়ে সন্ধ্যাবেলার বেশিরভাগ সময়টাই সঞ্জেভি-র সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত থাকি। যে-সমস্ত যুক্তি সামনে আসছে সে সম্পর্কে তাঁকে নির্দেশ দিই।' যেমন সুস্পষ্ট তাঁর চরিত্র তেমনি পরিষ্কার তাঁর সিদ্ধান্ত :

> সাভারকারের নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভার উগ্র গোষ্ঠী এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছে এবং আগাগোড়া এটির তদারকি রেখেছে। ...অবশ্য ভাবধারা এবং নীতির কট্টর বিরোধী ছিল যারা, সেই আর এস এস এবং মহাসভার অনেকেই তাঁর হত্যাকাণ্ডে অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সামনে যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, তাতে এই প্রতিক্রিয়াটুকু ছাড়া আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভার অন্য কোনো সদস্যের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।[৯]
>
> জনসমক্ষে প্রচারিত সাক্ষ্য প্রমাণ সত্ত্বেও, রাজনীতি ছাড়ার মুচলেকা দেবার জন্য সাভারকারের হীন প্রস্তাব বিস্মৃত না হয়েও, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সাভারকারকে এই ফাঁদ থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশেষ আদালত যেদিন তৈরি হলো, সেইদিনই ৪ঠা মে তিনি প্যাটেলকে লিখলেন :
>
> এই সূত্রে সাভারকারের নামটি উল্লেখিত হয়েছে সেকথা জানতে পারলাম। তাঁর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ পাওয়া গেছে আমি জানি না। নিশ্চয় এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না যাতে পরে এমন কথা উঠতে পারে যে, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনি যে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আশা করি কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র আপনার সামনে পেশ করা হয়। তাঁর অতীতের যন্ত্রণা এবং আত্মত্যাগ সুবিপুল। যতক্ষণ না তাঁর বিরুদ্ধে কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এই বয়সে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা উচিত নয়। সমগ্র বিষয়টি আপনার সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দিলাম।[১০]

সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেল ৬ই মে, ১৯৪৮ উত্তর দিলেন :

সাভারকারের প্রসঙ্গে বলি, এখানে আসার আগে দিল্লিতে একটি সম্মেলনে এই মামলার ভারপ্রাপ্ত বোম্বের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং অন্যান্য আইনী উপদেষ্টা ও তদন্তকারী অফিসারেরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বেশ স্পষ্ট-ভাষায় আমি তাদের বলেছি যে, সাভারকারের নাম অন্তর্ভুক্তিকালে গোটা বিষয়টি পুরোপুরি আইন এবং আদালতের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে দেখতে হবে। কোনো রাজনৈতিক বিষয় এর মধ্যে আমদানি করা চলবে না। আমার নির্দেশ যথেষ্ট এবং তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। তাঁরা সেভাবেই কাজ করবেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি তাঁদের একথাও বলেছি, তাঁরা যদি এমন অভিমতে পৌঁছোন যে সাভারকারকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সমস্ত নথিপত্র যেন আমার কাছে অবশ্যই পেশ করা হয়। অপরাধের প্রশ্নটি নিশ্চয়ই আইন এবং আদালতের দৃষ্টি থেকেই বিচার করতে হবে। নীতিগতভাবে কারোর বিশ্বাস অন্যরকম হতেই পারে আর এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।[১১]

আমরা আগেই দেখেছি যে, প্যাটেল ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন ফৌজদারী উকিল। তিনি নিজে আইন জানতেন এবং সমস্ত নথিপত্র সযত্নে পড়েছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের স্বীকৃত সহযোগী দিগম্বর ব্যাজ-এর স্বীকারোক্তির প্রমাণের ওপরেই যে সাভারকারের বিরুদ্ধে মামলাটি ঝুলে রয়েছে একথা তিনি জানতেন। সে পুলিসকে বলেছে এবং আদালতে শপথ নিয়ে বারবার একই কথা বলেছে যে, দুবার, ১৪ই এবং ১৭ই জানুয়ারি গডসে আর আপ্তের সঙ্গে সে বোম্বের সাভারকার সদনে গিয়েছিল। ২০শে জানুয়ারি পাহওয়ার জ্বালানো এবং ৩০শে জানুয়ারি গডসের গান্ধী হত্যার অল্প কদিন আগের ঘটনা এগুলো। দ্বিতীয়বারে ১৭ই জানুয়ারি তাদের শেষ বিদায় জানাবার সময় সাভারকারকে সে 'যশস্বী হৌন ইয়া' (সফল হয়ে ফিরে এস) বলে শুভেচ্ছা জানাতে শুনেছিল। ফেরার পথে আপ্তে ব্যাজকে বলেছিল, সাভারকার অনুমান করেছেন যে 'গান্ধীজীর শতক শেষ। কাজটা যে সফলভাবে শেষ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

প্যাটেল অবশ্য জানতেন যে, কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারি করার পক্ষে বিবৃতি কোনোমতেই যথেষ্ট নয়। এর সমর্থন প্রয়োজন। সমর্থনযোগ্য কাগজপত্র অবশ্যই তাঁর সামনে ছিল। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে আদালত এ বিষয়ে কী ভাববে তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছিল। নেহরুকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায়, নৈতিকভাবে সাভারকারের অপরাধ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। এমনকী

বিচারকও নিশ্চিতরূপে জানতেন যে ব্যাজ একজন সত্যনিষ্ঠ সাক্ষী, কেননা কোনো জেরাতেই তাকে টলানো যায়নি।

আইনের শাসন, বিচক্ষণতার শাসন

দুষ্কর্মের সহযোগী যদি রাজসাক্ষী হয় তবে তার সাক্ষ্য সমর্থনে যে প্রমাণ প্রয়োজন হয় সে বিষয়টিতে আইনের নিয়মকানুন অত কড়া নয়। বরং এটিকে বিচক্ষণতার কানুন বলা যেতে পারে। তবু সুদীর্ঘ বছরকাল ধরে এটি পাকাপোক্তভাবে আইনের নিয়মকানুন হয়ে উঠেছে। এই নিয়মের ভিত্তি হলো যে, দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিচারকের রায় যেখানে সম্ভাবনার ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, ফৌজদারী মামলার সেই অপরাধকে অবশ্যই যৌক্তিক সন্দেহের উর্ধ্বে প্রমাণিত হতে হয়। চলতি কথায় বলা হয় যে, একজন নির্দোষীকে সাজা দেবার চেয়ে দশজন দোষীর অব্যাহতি পেয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন স্যার জেমস ফিজামেস স্টিফেন। সরল, মার্জিত আইনগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই আইনটির ১১৪নং ধারায় বলছে :

> একটি নির্দিষ্ট মামলায় প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে স্বাভাবিক ঘটনাবলী, মানুষের আচার ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্মের যে সাধারণ ধারা তার সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রেখে, যা কিছু ঘটা সম্ভব বলে আদালতের মনে হবে, সেই তথ্যের অস্তিত্বই আদালত অনুমান করে নিতে পারে।

কিছুটা অসাধারণ ভঙ্গিতে লিখিত আইনে আর একটু এগিয়ে এই ধারায় নয়টি ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে :

> আদালত অনুমান করতে পারে... (খ) যে কোনো দুষ্কর্মের সহযোগী কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদি না বাস্তব তথ্যপ্রমাণে তার কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়... কিন্তু আদালতের সামনে উপস্থাপিত কোনো একটি বিশেষ মামলার ক্ষেত্রে, নিচে যে তথ্যগুলি দেওয়া হলো সেরকম কোনো তথ্য সর্বোচ্চস্তরে প্রযুক্ত হতে পারে কি পারে না সে কথা বিবেচনা করে আদালত এই সমস্ত তথ্যকে অবশ্যই যথাযোগ্য মর্যাদা দেবে... যেমন, উদাহরণস্বরূপ (খ) A–খুবই সৎ চরিত্রের মানুষ, কিছু কলাকৌশল করতে গিয়ে চূড়ান্ত গাফিলতিতে একজন মানুষের মৃত্যুর কারণ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলা চলছে। B—একই রকমের সৎ চরিত্রের মানুষ, এই ব্যবস্থাপনার সে-ও অংশীদার ছিল, বিশদভাবে কী করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিচ্ছে, A ও তার নিজের সাধারণ গাফিলতি মেনে নিচ্ছে এবং তার ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এই ব্যাখ্যাই সব নয়। আইনে আরও যোগ করা হয়েছে, '(খ) নং উদাহরণ মতো কয়েকজন ব্যক্তি একত্রে একটা অপরাধ করেছে। ধরা যাক তিনজন আসামী, A, B ও C ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েছে এবং তাদের সবাইকে পরস্পরের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। D-এর ওপর সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে প্রত্যেকেই একটা বিবরণ দিয়েছে। সেই সব বিবরণে পরস্পরের বক্তব্যের সত্যতা এমনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যাতে তাদের, পূর্ব যোগাযোগ একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এইভাবে দু'টি মামলার সাহায্যে (খ)-এর উদাহরণটির বিষয়ে সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে। সঠিক পদক্ষেপ নেবার জন্য, ১৩৩নং বিভাগে লেখা হয়েছে যে, 'একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার সহযোগী অবশ্যই যোগ্য সাক্ষী হতে পারে এবং সহযোগীর অসমর্থিত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মামলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নিছক এই কারণেই তাকে বিশ্বাস করাটা আইনত অসিদ্ধ হতে পারে না।'

এই হলো আইনের কথা। প্রিভি কাউন্সিল এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনী ব্যাখ্যায় এমন একটি নমুনা মামলার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যেখানে বাস্তব নথিপত্রগুলি স্বাধীনভাবে সমর্থিত হওয়া জরুরী হলেও প্রতিটি বাস্তব নথিপত্রের ক্ষেত্রে তা জরুরী নয়। টেপটা যদি না থাকত, তাহলে রিচার্ড নিক্সন বেমালুম ছাড়া পেয়ে যেত। বেকেট-হত্যার বিষয়ে প্ররোচিত করার অভিযোগে ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরিকে অভিযুক্ত করা যায়নি। অথচ প্ররোচনা যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল : এরকম হাঙ্গামাবাজ পুরুতের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দেবে কে?' এবং আরো বেশি প্ররোচনামূলক, 'কীরকম একদল বোকা আর কাপুরুষদের আমি পুষছি বাড়িতে যাদের একজনও এরকম একটা দুর্বিনীত কেরানীর ওপর আমার হয়ে, শোধ তুলতে পারে না?'

বিচারক আত্মাচরণ তাঁর ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ তারিখের রায়ে সাভারকারকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন। তাঁর অনুসন্ধানে সাক্ষী হিসেবে ব্যাজ সত্যনিষ্ঠ কিন্তু তার সমর্থনে যে সাক্ষ্য প্রমাণ সেগুলি অস্পষ্ট এবং অপর্যাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে কোনো 'শাস্তিদান' 'নিরাপদ নয়' বলে তিনি রায় দেন। কুড়ি বছর পর তদন্ত কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে জাস্টিস জীবনলাল কানপুর সাক্ষ্যপ্রমাণের অত্যন্ত বিশদ বিশ্লেষণের পর ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ তাঁর প্রতিবেদনে বেশ জোরালো ভাষায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'সমস্ত তথ্যপ্রমাণ একত্রিত করলে এই ষড়যন্ত্র যে সাভারকার আর তাঁর সঙ্গীদেরই কর্ম এছাড়া আর কোনো তত্ত্বই ধোপে টেঁকে না।'[১২] প্যাটেলের ধারণাই সমর্থিত হলো। বিষয়টা এখানেই শেষ হলো না। কমিশনের কাছে এমন সব প্রমাণ ছিল যেগুলো আদালতে উপস্থাপিতই হয়নি। সম্ভবত তখন তা করা সম্ভব ছিল না। সাভারকারের মৃত্যুর পর তাঁর সাহায্যকারীদের দেওয়া প্রমাণও এর অন্তর্ভুক্ত। অতীতে তারা গডসে এবং আপ্তের যাতায়াতের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ফলে আদালতের কাছে সাক্ষ্যের পক্ষে সমর্থন দুর্বল এবং অস্পষ্ট মনে হয়েছিল। এইসব সঙ্গীসাথীরা যদি আদালতে সাক্ষ্য দিত তবে সাভারকার এই অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পেতেন না। বর্তমানে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

পথপ্রদর্শককে রক্ষা করা

এমনকী ১৯৪৮ সালেও সত্যানুসারী মানুষজনের দৃষ্টিতে সাভারকারকে হীন প্রতিপন্ন করতে দু'টি অবিতর্কিত তথ্যই যথেষ্ট ছিল। যে কোনো ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যেকার সম্পর্ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের আচার আচরণ।

অভিযুক্তদের প্রত্যেকে সাভারকারকে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। গডসে পুলিস স্টেশনে তার বয়স সম্পর্কে যেরকম করেছিল, আদালতেও সেরকম মুক্তকণ্ঠে মিথ্যা বলেছিল। কোনো ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বকেই সে অস্বীকার করেছিল। সে বলেছিল যে ২০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই স্বাধীনভাবে ঘটেছিল এবং ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে এবং তার পরে যা যা ঘটেছে তার সঙ্গে আগের ঘটনার কোনো সম্পর্ক ছিল না।'[১৩] গডসে বলেছিল :

> অনেক বছর আমি আর এস এস-এ কাজ করেছি। তারপর হিন্দুমহাসভায় যোগ দিই এবং মহাসভার হিন্দুবাদী পতাকার নিচে একজন সৈনিক হিসেবে লড়াই করার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করি। প্রায় সেই সময়েই বীর সাভারকার হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। তাঁর চুম্বকীয় নেতৃত্বে এবং ঘূর্ণি-ঝড় তোলা প্রচারে হিন্দু সংগঠন আন্দোলন এমনভাবে উদ্দীপ্ত এবং আবেগদীপ্ত হয়ে ওঠে যেমনটি আগে কখনও হয়নি। হিন্দুদের স্বার্থবাহী একজন যোগ্যতম এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রচারক হিসেবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু সংগঠনপন্থী তাঁকেই তাদের পছন্দসই নায়ক হিসেবে দেখতো। আমি তাদেরই একজন ছিলাম। অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে আমি মহাসভার কাজকর্মে যোগ দিতাম এবং সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সাভারকারজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম... কিন্তু এ-কথা অবশ্যই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, উপরোক্ত কারণে আমাদের সাধারণ যাতায়াত সাভারকার ভবনের একতলায় অবস্থিত হিন্দু মহাসভার দপ্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। বীর সাভারকার ঐ বাড়ির দোতলায় থাকতেন। ব্যক্তিগতভাবে সাভারকারের সঙ্গে আমাদের খুবই অল্প কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তা-ও বিশেষরূপে বন্দোবস্ত-করা সাক্ষাৎকার।

এটা মিথ্যা। সাভারকারের কাছে গডসে এবং আপ্তের যে অবারিত যাতায়াত ছিল ভূরি ভূরি সাক্ষ্যপ্রমাণে সেটি দেখা গিয়েছিল। গডসে আরো বলেছিল, 'আমরা আমাদের অন্তরে এ কথা অনুভব করেছিলাম যে, বীর সাভারকারের নেতৃত্বের আচ্ছাদন থেকে আমাদের বিদায় নেবার সময় এসে গেছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মসূচী বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা আমাদের বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে তাঁর ওপর আর আমাদের আস্থা রাখা উচিত হচ্ছে না' (পৃ. ২০-২১)। সাভারকারকে বাঁচানোর জন্য এই মিথ্যা বারবার অত্যন্ত জোরাল কণ্ঠে ঘোষিত হলো 'বীর সাভারকার সহ ওদের কাউকেই আমাদের নতুন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশ্বাস করবো না, এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম... আমি আবারও একবার নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, আমার এই সমস্ত কাজকর্ম যার শেষ পরিণতিতে আমাকে গান্ধীজীর ওপর পাঁচটি গুলি চালাতে হয়েছিল সে-সম্পর্কে সাভারকার কোনো কিছু জানতেন এমন কথা সত্যি নয়' (পৃষ্ঠা ২৪)।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরোচিত অবস্থানের বিপরীত তুলনায় বিচার চলাকালীন জি ডি সাভারকারের মর্যাদাহানিকর আচার আচরণ এবং আর জয়করের বিরাগ আমরা

আপ্তের প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি। কেবল বীরত্বই বা কেন, আদালতে সাভারকারের লিখিত বিবৃতিতে সত্যের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যায় না। রবার্ট পাইন সঠিকভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সাভারকার

> এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর যে লেশমাত্র যোগাযোগ ছিল সে কথা অস্বীকার করতে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলে গেছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তিনি কখনই দেখা করেননি, আর যদি করেও থাকেন তবে সেই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের কোনোরকম সম্পর্কই ছিল না; তিনি কখনোই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেননি; যদি এসেও থাকেন, যদি শেষের কথায় বলেও থাকেন 'সফল হও এবং ফিরে এসো', তবে তিনি এমন কোনো বিষয়ে কথাটা বলেছিলেন যেমন হিন্দু রাষ্ট্রের শেয়ার বিক্রি কিংবা হায়দরাবাদের নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে অসামরিক প্রতিরোধ কিংবা এমন একশটা বৈধ বিষয় যার সঙ্গে ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গ যোগাযোগ নেই, এইভাবেই ব্যাপারটা দেখতে হবে। সুতরাং তিনি বলেই চললেন। যেহেতু এইসব দ্বন্দ্ব থেকে তিনি দূরেই থাকতেন, তাই প্রতিটি শব্দ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বোঝাতে চাইলেন যে, সব কথাই আইন মোতাবেক বলা হয়েছে। অবস্থাগত প্রমাণ সবই বেশ মর্মস্পর্শী ছিল, ব্যাজ-এর কথিত কাহিনীও বেশ বিশ্বাসযোগ্য ছিল। কিন্তু সাভারকার এর প্রতিটি বাক্যকে ধরলেন এবং দেখিয়ে ছিলেন যে, এদের কোনো নির্দিষ্ট অর্থই নেই।[১৪]

এই নির্লজ্জ মিথ্যাচারিতায় তিনি একেবারে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন যখন গডসে আর আপ্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বর্ণনা করতে নিজেকে ভীষণ ছোট করে ফেললেন। এই প্রসঙ্গে সাভারকারের বিবৃতি বিস্তৃতাকারে উদ্ধৃত হলো :

> সাংগঠনিক কারণে চিঠিপত্র, বাইরে-যাওয়া, লেখালেখি, বক্তৃতা এসবের মাধ্যমে সারা ভারত জুড়ে মহাসভার হাজার হাজার সদস্য, কর্মী এবং নেতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়েছিল।
>
> এইসব অসংখ্য হিন্দু মহাসভার কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকের একজন হিসেবে পণ্ডিত নাথুরাম গডসে নিজেই আমার সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ করেন। আপ্তেও একটা চিঠির মাধ্যমে নিজেই আমার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি নাগরের একজন হিন্দু সভা কর্মী এবং সেখানে একটি রাইফেল ক্লাব শুরু করতে চলেছেন। কালেক্টর ক্লাবটি শুরু করার অনুমতি দিয়েছেন। তেমনি ড. পার্চার ও একইভাবে গোয়ালিয়রের হিন্দু সভার একজন নেতা নিজেই আমার সঙ্গে পরিচিত হন। ব্যাজ হিন্দু সংগঠনের একজন কর্মী এবং আইনানুসারে যেসমস্ত অস্ত্র বিনা লাইসেন্সে বিক্রি করা যায় সেগুলো তিনি বিক্রি করেন, এই মর্মে আমাকে তিনি চিঠি লেখার আগেই আমি তাঁর কথা শুনেছিলাম। বাকি অভিযুক্ত শঙ্কর, গোপাল গডসে এবং মদনলালের সঙ্গে কোনোদিনই আমার পরিচয় ছিল না। এমনকী তাদের

বিষয়ে আমি কখনো কিছু শুনিওনি... মি. আপ্তে এবং পণ্ডিত নাথুরাম গডসে নাগর এবং পুনার হিন্দু সভার সদস্য এই পরিচয়ে নিজেরাই আমার সঙ্গে আলাপ করেন। পরে তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জানাশোনা হয়েছিল।[১৫]

সহকারী

সাভারকারের মৃত্যুর পর গডসের ভাই গোপাল ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর মারাঠী গ্রন্থ 'Gandhi Hatya, An Me' (গান্ধীহত্যা এবং আমি)-তে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ করেছিলেন। পরে এর ইংরাজি অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।[১৬] তাঁদের সম্পর্কের প্রসঙ্গে গোপাল গডসের প্রকাশিত তথ্যে সাভারকারের বয়ান মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সাধারণ 'জানাশোনা'-র চেয়েও এটা বেশি কিছু। মন্ত্রগুরু ও ভাবশিষ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক, এ ছিল তাই। গড্‌সের বাবা যখন সাভারকার যেখানে থাকতেন সেই রত্নগিরিতে ১৯২৯ সালে বদলি হয়ে এলেন তখনি তাঁদের প্রথম দেখা হয়। 'আমরা রত্নগিরিতে আসার মাত্র তিনদিনের মধ্যে নাথুরাম সেই প্রথমবার সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। তারপর থেকে প্রায়ই সে ওখানে যেতো (পৃষ্ঠা ১০৯)। গডসে সাভারকারের প্রয়োজনেই তাঁর লেখাগুলো নকল করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল।

> নাথুরাম আর এস এস-এর অবস্থানের সঙ্গে একমত ছিল। রত্নগিরির পতিতপাবন মন্দিরের কাঠামোটি ছিল ইট আর পাথরের। এর প্রভাব মন্দিরের চতুর্পাশে এবং আশেপাশে সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে আটকা পড়েছিল। অবশ্য আর এস এস নিজেই একটি কাঠামোবিহীন মন্দির। তাই যেখানে যত হিন্দু অছে, যেখানেই তারা থাকুক না কেন তাদের সকলেরই আর এস এস-এ স্থান ছিল। সমগ্র ভারতই তার প্রস্তাবিত কর্মক্ষেত্র। এই সংগঠন যেহেতু ভারতকে শক্তসমর্থ করে তোলার কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, কাজেই তার শপথের একটি অংশ জুড়ে ছিল স্বাধীনতা-অর্জন। যাঁর গতিতে আর এস এস-এর শাখা যে সংখ্যায় বাড়ছে তাও তাঁর চোখে পড়েছিল।
>
> শ্রী কাশীনাথপন্থ লিমায়ের নেতৃত্বে সংলিতে আর এস এস-এর একটি শাখা খোলা হয়। অত্যন্ত অধ্যবসায়ে নাথুরাম সংঘের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। খুব শীঘ্র সে এর তাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান (বৌদ্ধিক কার্যাবহ) হয়ে ওঠে।
>
> সেই সময় হিন্দু সমাজের অসংলগ্ন, সংকীর্ণমনা এবং ক্ষতিকর ঐতিহ্যের সমালোচনা করে সাভারকার 'কির্লোস্কর' পত্রিকায় নানান নিবন্ধ লিখছেন। বীর সাভারকারের সঙ্গে প্রতিদিনকার ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, নাথুরাম যে কোনো সমস্যায় তাঁর কঠোর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে পড়েন। কাজেই এইসব নিবন্ধ তাঁকে আরো অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল। (পাতা ১১৪)

সাধারণ 'পরিচিত হওয়ার' মিথ্যা অজুহাতের পক্ষে এ অনেক বেশি কিছু ঘটে-যাওয়া।

সাভারকার যখন ১৯৩৭ সালে একবার মুক্তি পান, তখন 'নাথুরাম বীর সাভারকারের সঙ্গে সর্বত্র যাতায়াত করতে শুরু করে' (পৃষ্ঠা-১৬)। সে 'অগ্রণী' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা বের করে। পরে এর নাম হয় 'হিন্দু রাষ্ট্র'। কীর লিপিবদ্ধ করেন :

> প্রথম যৌবনে গডসে আর এস এস-এর একজন কর্মী ছিল এবং পরে হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় কমিটির একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হয়ে ওঠেন। তিনি মহারাষ্ট্রের একজন সুপরিচিত সাংবাদিক 'মারাঠা ডেইলি অগ্রণীর সম্পাদক— নেতা— পরে এটি নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম নেয় হিন্দুরাষ্ট্র। পণ্ডিত নাথুরাম গডসে হিসেবেই অধিক পরিচিত এই সম্পাদক একজন গোঁড়া সাভারকারপন্থী এবং সাভারকারের অগ্রণী বাহিনী ও সেনানায়ক হিসেবেই সুপরিচিত।[১৮]

গডসের বিদ্রোহের মিথ্যা কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করার জন্য তিনি এইভাবে তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন।

কলিনস এবং লাপিয়ের, যাঁরা ইচ্ছেমতো পুলিসী নথিপত্র দেখতে পেতেন, তাঁরা লিখছেন, 'এখনো পর্যন্ত কোনো নেতা এর চেয়ে বেশি একনিষ্ঠ কোনো সহযোগী পাননি। গডসে ভারতের সর্বত্র সাভারকারকে অনুসরণ করতেন।'[১৯] তাঁরা আরো লেখেন: কটা মাত্র সিঁড়ি ভেঙে ঘরটা (রক্ষী) অতিক্রম করে হিন্দু রাষ্ট্রদলের একনায়কের ব্যক্তিগত অফিসে পৌঁছোবার অধিকার খুব হাতে-গোনা কয়েকজনের ছিল। নাথুরাম গডসে আর নারায়ণ আপ্তে ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। দিগম্বর ব্যাজ তা ছিলেন না এবং সেকারণে... তাঁরা ওঁকে ছাড়াই ওপরতলায় যেতেন।'[২০]

'বীর' সাভারকার ?

সাভারকারের নামের আগে সাধারণভাবে 'বীর', 'সাহসী' এইসব বিশেষণ লাগানো হয়। অথচ, মানুষটা সত্যি কতটা সাহসী ছিল, ভারতে কিংবা ভারতের বাইরে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কোনো বীরের সঙ্গে সাভারকারের আচার আচরণের তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়— রাষ্ট্র যতদিন চাইবে ততদিন, দরকার হলে বাকি জীবন রাজনীতি পরিত্যাগ করার হীন মুচলেকা; মিথ্যা, নির্লজ্জ ব্যবহার; কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাধারণ অপরাধীর মতো নিজেকে বাঁচানোর বিকল্প ব্যবস্থার লিখিত বিবৃতি। প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোথায় গেল সাহসিকতা? কখনই এর প্রমাণ মেলেনি— ১৯১১, ১৯১৭, ১৯২৫, ১৯৪৮ কিংবা ১৯৫০ কখনোই নয়। আমরা আবার বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফিরে আসবো।

মামলার বিচার চলাকালীন যে কোনো লোকের কী ধারণা হতে পারে, তা আর একজন মুগ্ধের প্রকাশিত তথ্যে স্পষ্টও হয়ে যায়। পি এন ইনামদার ট্রায়াল কোর্টে এবং আপিলের সময় দত্তাত্রেয় সদাশিব পার্চুর এবং গোপাল গডসের সপক্ষে ছিলেন। তিনি একজন সুযোগ্য আইনজীবীও বটে। হাইকোর্টে তিনি পার্চুরের জন্য মামলা জিতে তাকে 'নির্দোষ' প্রমাণ করেছিলেন। এরকম রচনায় যে নম্রতা বিরল, তাঁর স্মৃতিকথনে সেই

নম্রতাই প্রতিফলিত। ইনামদার সাভারকারের একজন অত্যুৎসাহী গুণগ্রাহী ছিলেন। তাই তথ্যের বিবরণ দেবার সময় তিনি সতর্ক ছিলেন। সে কারণে তাঁর স্মৃতিকথায় সাভারকারের অধ্যায়ে অনেক বেশি নিন্দাই হয়ে উঠেছে। নিচের টুকরো অংশটি বিচার করা যাক। সাভারকার এখানে অপদার্থ, আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নন।

> গোটা মামলা চলাকালীন কখনো সাভারকারকে নাথুরামের দিকে মুখ ফেরাতে দেখিনি। সে ওঁর পাশেই বসতো, বস্তুত একেবারে ওঁনার ঠিক পরেই। ওঁনার সঙ্গে সে খুব কমই কথা বলতো। অন্যান্য অভিযুক্তরা অসংকোচে পরস্পরের মধ্যে টুকরো কথার আদান প্রদান করতো কিংবা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। কিন্তু সাভারকার দৃঢ় শৃঙ্খলাপরায়ণ ভঙ্গিতে স্ফিংস-এর মতো নীরবতায় সোজা বসে থাকতেন। কাঠগড়ায় উপস্থিত অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের বিষয়ে তিনি যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার ছাড়া গোটা মামলায় আমার সঙ্গেও তিনি কখনো কথা বলেননি। আমার মনে হয়েছিল, নাথুরাম এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গে একত্রে ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ তাঁর উপর ছিল তারই বিরুদ্ধে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনেই হয়ত তিনি আদালতে এরকম আচরণ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। বস্তুত বেশ দর্শনীয়ভাবে নিজের ভূমিকা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি; এমনকী অন্যান্য অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই।
>
> নাথুরামের সঙ্গে আমার যখন কথোপকথন হতো সেসময় সে আমাকে বলেছিল, লাল কেল্লার বিচার চলার দিনগুলিতে আদালতের মধ্যে কিংবা লাল কেল্লার জেলে ওর সঙ্গে তাতিয়ারাও-এর (সাভারকারের) এইরকম হিসেব করা, লোকদেখানো না-মেলামেশায় সে অত্যন্ত আহত হয়েছিল। তাতিয়ারাও-এর হাতের একটু স্পর্শ, সহানুভূতি মাখা একটা কথা কিংবা তার নির্জন কুঠুরির বন্দীদশায় অন্তত একঝলক সহমর্মী দৃষ্টির জন্য নাথুরাম কীভাবেই না পথ চেয়ে বসে থাকতো। এমনকী সিমলা হাইকোর্টে তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকারেও নাথুরাম এ প্রসঙ্গে তার আহত অনুভবের কথা উল্লেখ করেছিল।[২১]

আদালতে নিজের সপক্ষে সাভারকারের লিখিত বিবৃতি প্রসঙ্গে একমাত্র রবার্ট পেইন-ই অবজ্ঞাসূচক কথা লেখেননি, ইনামদারও তাই করেছিলেন। আর তাঁর কথার ওজন অনেক বেশি। সাভারকার যা যা করেছিলেন, ইনামদার ছিলেন তার একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

> সাভারকার তাঁর মামলার সপক্ষে একটি লিখিত বিবৃতি প্রস্তুত করেছিলেন। সেটির পরিশিষ্ট সংবাদপত্রের নানান টুকরো অংশে ভরাট ছিল। একজন বাগ্মীর সবটুকু চটক নিয়ে সাভারকার বিবৃতিটি আদালতে নিজেই পড়েছিলেন। যে মহাত্মাজীর চরিত্রকে তিনি এত আন্তরিকভাবে, এতবার উচ্চ প্রশংসা করেছেন, যে মহাত্মাজীর তিনি এত গুণগ্রাহী, আজ স্বাধীন ভারতের সরকার

তাঁরই হত্যায় সাভারকারকে অভিযুক্ত করেছে বলে তিনি তাঁর হতভাগ্যের জন্য বিলাপ করলেন। বক্তৃতার এই অংশটুকু পড়বার সময় সত্যিই আদালতে বিগলিত অশ্রুধারায় তাঁর গাল ভেসে যাচ্ছিল...

> সাভারকারের দাবি, এই অপরাধ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন! কিন্তু বিশ্বাস করুন, সাভারকার স্নায়বিকভাবে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং মামলা যত এগোচ্ছিল ততই তিনি আরো আগে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন।[২২]

ঐ বিস্ময়বোধ চিহ্নটি কিন্তু মূল লেখায় ছিল না, এটা লক্ষ্য করার মতো।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাভারকার আরো একবার অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। সাংঘাতিক বিব্রত অবস্থায় পড়ে, তিনি ইনামদারের পেশাগত সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন। আদালত এই সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়েছিল। সাভারকারের আইনজীবী এল বি ভোপাটকর তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, ইনামদার অভ্রান্ত এবং যোগ্য বলেই সাভারকার তাঁর সাহায্য চান।

> তিনি বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তিনি অভিযোগ থেকে রেহাই পাবেন কি না। আন্তরিকভাবে তিনি চাইছিলেন যে, আমি তাঁকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করি। আমি যেটা লক্ষ্য করলাম, তা হলো, আমার মক্কেল ড. পার্চুর বা গোপাল গডসের বিরুদ্ধে আনা মামলার বিষয়ে কিংবা নাথুরাম সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের সম্পর্কে তিনি একটা প্রশ্নও করেননি। এমনকী ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন ছিল না তাঁর। অথচ প্রায় তিন ঘণ্টা আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।[২৩]

বিচারের শেষ দিনে ইনামদারের কিনে-আনা নতুন অটোগ্রাফ বই-তে তিনি সাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। এর পরিবর্তে, তাঁর যেসব বই-এ ইতিমধ্যেই সাক্ষর করা আছে তারই যেকোনো একটা ইনামদারকে কিনে নিতে বলেন। হাইকোর্টের রায় প্রকাশ হবার পর ইনামদার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন সাভারকার ইনামদারের সঙ্গে দেখা করেননি। প্রখর বুদ্ধিশালী ইনামদার মুখোশের পিছনে লুকোন এই মানুষটি সম্পর্কে তাঁর বিচক্ষণ মীমাংসা গোপন রাখেননি— গভীরতর অপরাধবোধ থেকেই তার এই স্নায়বিক দুর্বলতা। জেলে যাবার নিদারুণ আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়া, এমনকী হিন্দুত্বের স্বার্থও ত্যাগ করার প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলেন, যদিও তা ফলপ্রসূ হয়নি। এই বিখ্যাত বিচারের দিনপঞ্জীতে কাপুরুষতা আর চাতুরীর যে কাহিনী রয়েছে, কোথাও এর তুলনা মেলা ভার।

হত্যা

সাভারকারের আচরণ বেশ সংগতিপূর্ণ মনে হলেও ষড়যন্ত্রের মামলায় যে অংশটুকুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে, মামলার সেই নথিপত্রগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। গডসে হত্যার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, কোনোরকম ষড়যন্ত্রের কথা সে অস্বীকার করেছিল। কাজেই ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব এবং ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্তকরণ এই একটিমাত্র বিষয়ই অবশিষ্ট ছিল।

এই মামলার অভিযুক্তরা হলো নাথুরাম গডসে (বয়স ৩৭), নারায়ণ আপ্তে (বয়স ৩৪), পুনার 'হিন্দু রাষ্ট্র'-এর যথাক্রমে সম্পাদক এবং প্রকাশক, বিষ্ণু কার্কারে (বয়স ৩৮), যে আমেদাবাদের একটা হোটেল চালাত, মদনলাল পাহ্ (২০), শঙ্কর কিস্তোয়া (২০), গোপাল গডসে (২৭), ভি ডি সাভারকার (৬৫) এবং দত্তাত্রেয় পার্চুর (৪৭), গোয়ালিয়রের একজন চিকিৎসক। রাজসাক্ষী দিগম্বর ব্যাজ (৩৯) যাকে ক্ষমা করা হয়েছিল, তাঁর বাড়ির ভৃত্য শঙ্কর কিস্তোয়া। কিস্তোয়া ছাড়া আর সকলেই মহাসভাপন্থী, সাভারকারের অন্ধ সমর্থক।

মামলার সমস্ত কাজকর্ম কানপুর প্রতিবেদনে বেশ সুন্দরভাবে লিখিত ছিল, তার থেকেই এই সারসংক্ষেপ করা হলো।[২৪] ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক সময় মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির ২৭ তারিখে পানচার এতে যোগ দেয় এমন অভিযোগ করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যকে আরো সুদূর প্রসারী করার জন্য ব্যাজ আর শঙ্কর ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখের সন্ধ্যায় দু'টি gun cotton slab (একটি দেশি বিস্ফোরক) এবং প্রইমার সহ পাঁচটি হ্যান্ড গ্রেনেড বোম্বেতে আনে। এগুলো দীক্ষিত মহারাজের চাকরের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে রেখে আসা হয়। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় আপ্তে আর নাথুরাম গডসে বোম্বাই পৌঁছোয়। একটা রিভলবার সংগ্রহের জন্য ব্যাজ-এর সঙ্গে তারা দীক্ষিত মহারাজের বাড়িতে যায়। কিন্তু সেখানে তারা রিভলবার পায় না। কার্কারে এবং মদনলাল এর কিছুদিন আগেই বোম্বে এসেছিল এবং হিন্দু মহাসভা ভবনেই তারা ছিল। ব্যাজ এবং শঙ্করও সেখানে ছিল। ১৫ তারিখে দীক্ষিত মহারাজের বাড়িতে রাখা বিস্ফোরক পদার্থগুলো কার্কারে এবং মদনলাল নিয়ে আসে। ঐ দিন সন্ধ্যায় বিছানা বালিশের সঙ্গে বেঁধে এগুলোকে আনা হয় দিল্লিতে। ব্যাজ এবং গডসে পুনায় ফিরে আসে। ব্যাজ ফিরে আসে তার ভাণ্ডারের কিছু ব্যবস্থাপনার কাজে আর নাথুরাম তার ভাই গোপাল গডসেকে নিতে আসে। গোপাল তাকে একটা রিভলবার জুটিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিল। ব্যাজ এবং শঙ্কর ফিরে আসে দিল্লিতে। ১৭ তারিখ খুব ভোরেই তারা পৌঁছে যায়। প্রমাণ হয়েছে, নাথুরাম আর ব্যাজও তখন সেখানে ছিল আর তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করতে যে খরচখরচা হবে তার জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করছিল। নাথুরাম এবং ব্যাজ ১৭ তারিখ বিকেলে বিমানে চড়ে সন্ধ্যায় দিল্লি পৌঁছোয়। প্রথমে মারিনা হোটেলে, তারপর কনট সার্কাসে একটা উচ্চবিত্ত ইয়োরোপিয় ধাঁচের হোটেলে তারা থাকে। সেদিনই তারা সাভারকারের সঙ্গে দেখা করে। সেদিনই রাত সাড়ে বারোটায় মদনলাল আর কার্কারে দিল্লি এসে পৌঁছোয়। হিন্দু মহাসভা ভবনে জায়গা না পেয়ে তারা শেরিফ হোটেলে যায়।

১৯ তারিখ বিকেলে ব্যাজ আর শঙ্কর দিল্লি এসে পৌঁছোয় এবং হিন্দু মহাসভা ভবনে থাকে। ১৭ই জানুয়ারির পরের কোনো এক দিনে গোপাল গডসে আসে দিল্লিতে। আরেকটা খবর হলো সে ১৮ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় এসে পৌঁছোয় এবং ১৯শে জানুয়ারি অন্যদের সঙ্গে দেখা করে। সে-ও মহাসভা ভবনেই ছিল। কাজেই ব্যাজ, শঙ্কর, গোপাল গডসে এবং মদনলাল সকলেই সেদিন রাত্রে ছিল মহাসভা ভবনে। ২০ তারিখ সকালে

আপ্তে, ব্যাজ এবং শঙ্কর বিড়লা ভবনে যায় এবং সেখানকার প্রার্থনার মাঠটি, পেছনের চাকরদের থাকার ঘর সব সরেজমিনে তদন্ত করে তারা হিন্দু মহাসভা ভবনে ফিরে আসে। যে দু'টি রিভলবার তারা এনেছিল, সেগুলো ভবনের পেছনের জঙ্গলে চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা যায় যে, দুটোই অকেজো।

এরপর তারা সকলে মারিনা হোটেলে নাথুরামের ঘরে মিলিত হয় এবং সন্ধ্যার পরিকল্পনা সেখানে চূড়ান্ত রূপ পায়। পরিকল্পনা ছিল যে, একটা হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবার জন্য মদনলাল বিড়লা ভবনের পেছনের দিকে বিস্ফোরণ ঘটাবে। এরফলে যে আতঙ্ক ছড়াবে তার সুযোগে ব্যাজ ও শঙ্কর দুটো রিভলবার দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর দিকে গুলি ছুঁড়বে এবং তাঁর দিকে ওরা প্রত্যেকেই একটা করে হ্যান্ডগ্রেনেড ছুঁড়বে। মহাত্মাজী প্রার্থনার সময় প্রতিদিন যেখানে বসেন তার ঠিক পেছনদিকের চাকরদের ঘরের একটা জানলার জাফরি দিয়ে ব্যাজ একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়বে আর রিভলবার চালাবে। একজন ফোটোগ্রাফার হিসেবে প্রার্থনাসভার ছবি তোলার নাম করে সে ওখানে ঢুকে পড়বে। ঐ একই সময়ে কার্কারে, গোপাল গডসে আর মদনলাল বাকি হ্যান্ড-গ্রেনেডগুলো ছুঁড়বে। নাথুরাম আর আপ্তে নির্দ্দিষ্টভাবে একটার পর একটা কাজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের সংকেত দেবে। পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য একটা হ্যান্ড গ্রেনেড আর... দেওয়া হয় মদনলালকে; ব্যাজকে একটা রিভলবার আর একটা হ্যান্ড গ্রেনেড, গোপাল গডসে আর কার্কারে প্রত্যেককে একটা করে হ্যান্ড গ্রেনেড দেওয়া হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তারপর মারিনা হোটেল থেকে বিড়লাভবনের দিকে যায়। প্রথমে মদনলাল আর কার্কারে তারপর নাথুরাম গডসে বাদে অন্য সবাই। নাথুরাম পরে একটা ট্যাক্সি করে যায়। নাথুরাম ওদের অনুসরণ করবে এরকমই কথা হয়েছিল। মদনলাল বিড়লা ভবনের পেছন দিকের দরজায় gun cotton slab (একটি দেশি বিস্ফোরক) আগুন লাগায়। কিন্তু বাকিরা তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলো ঠিকমত করতে পারে না। নাথুরাম গডসে, আপ্তে এবং গোপাল গডসে সঙ্গে সঙ্গে যে ট্যাক্সিতে এসেছিল সেই ট্যাক্সি করেই স্থানত্যাগ করে। ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয় মদনলাল। কার্কারে, ব্যাজ এবং শঙ্কর পালাতে সক্ষম হয়।

নাথুরাম গডসে এবং আপ্তে যখন বোম্বেতে ছিল তখন তারা দাদাজী মহারাজ আর দীক্ষিত মহারাজের কাছ থেকে একটা পিস্তল সংগ্রহ করার চেষ্টা করে বিফল হয়। দিল্লি থেকে তারা যায় গোয়ালিয়রে। ২৭শে জানুয়ারি রাত সাড়ে দশটায় সেখানে পৌঁছোয়। রাতটা তারা সেখানেই থাকে। তারপর তারা সমস্ত পরিকল্পনার কথা যার কাছে বলেছিল সেই ড. পার্চুর এবং দণ্ডবতে (আত্মগোপনকারী অভিযুক্ত)-এর সাহায্যে গোয়েল নামে একজনের কাছ থেকে একটা পিস্তল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সেদিন রাতেই গোয়ালিয়র পরিত্যাগ পরে পরদিন সকালে তারা আসে দিল্লিতে। সেখানে তারা কার্কারের সঙ্গে যোগ দেয়। সেদিন রাত্রে তারা সকলে দিল্লির প্রধান রেল স্টেশনের বিশ্রামাগারে কাটায়। পরদিন ৩০শে জানুয়ারি সন্ধেবেলা নাথুরাম গডসে মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করে এবং ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয়।

অভিযুক্তদের মধ্যে সাতজনকে বিশেষ বিচারক দোষী সাব্যস্ত করেন। নাথুরাম গডসে

এবং আপ্তে এই দুজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় এবং বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নির্দোষ বলে সাভারকারকে মুক্তি দেওয়া হয়। হাইকোর্টে আবেদন জানানোর আরো দুজন অভিযুক্ত ড. পার্চুর এবং শঙ্কর কিস্তোয়া সাজা থেকে রেহাই পায়। আর বাকি অভিযুক্তদের আবেদন নাকচ হয়ে যায় এবং নাথুরাম গডসে ও আপ্তের ফাঁসির আদেশ বহাল থাকে। বাকি তিনজনের দণ্ডাজ্ঞা মুলতবী রাখা হয়।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৯ আম্বালা জেলে নাথুরাম গডসে ও আপ্তের ফাঁসি হয়। শেষপর্যন্ত ভারত সরকারের আদেশে ১২ই অক্টোবর, ১৯৬৪ গোপাল গডসে, কার্কারে এবং মদনলাল জেল থেকে মুক্তি পায়, যদিও মহারাষ্ট্র সরকার এই মুক্তির ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সেইমতো পরামর্শও দিয়েছিল। গুলজারিলাল নন্দা ছিলেন তখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভারতীয় পেনাল কোডের ১২০গ নং ধারায় (ষড়যন্ত্র) এবং তার সঙ্গে ৩০২নং ধারায় (হত্যা) অন্যান্যদের সঙ্গে সাভারকারের বিরুদ্ধে গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় পেনালকোড, ভারতীয় অস্ত্র আইন এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের আওতায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

রাজসাক্ষী

ষড়যন্ত্রের অন্যান্য মামলার মতো, দুষ্কর্মের একজন সহযোগী গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে অন্যদের বিপাকে ফেলে এবং আদালতে সে সমস্ত সত্য কথা প্রমাণ করে দেবে এই আশ্বাসে ক্ষমাভিক্ষা পায়। দিগম্বর ব্যাজ বিচারক আত্মাচরণের কাছ থেকে প্রশংসা পায়। মামলার সাক্ষী হিসেবে সে ছিল ৫৭ নম্বরে এবং ২০শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই, ১৯৪৮-এর ছাপানো নথিপত্রে ৮০ থেকে ১১৮ পাতায় তার সাক্ষ্য স্থান পেয়েছে। সে থাকত পুনেতে এবং সে ছিল অস্ত্রশস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার একজন কারবারী। '১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি থেকে আমি কার্তুজ, বোমা, রাইফেল, স্টেনগান ইত্যাদির কারবার শুরু করি... আমি ছোরা, ছুরি, বাঘনখ... কলমকাটা ছুরি ইত্যাদিও বিক্রি করতাম। বইও বিক্রি করতাম। 'হিন্দু মহাসভা' নামে পরিচিত সংগঠনটিকে জানি' ১৯৪০ সাল থেকে। প্রতিবছর এর সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে সে যোগ দিতো। 'যখন আমি এধরনের কোনো অনুষ্ঠানে যেতাম, তখনি সেখানে বই আর অস্ত্র বিক্রি করতাম।' সে শাস্ত্র ভাণ্ডার চালাতো। সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সে ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে কার্যকরী সদস্য হয়। সে সাভারকারের দেহরক্ষী আপ্পা কাসারকে ১৯৪৪ সাল থেকে চিনতো। 'তার সঙ্গে আমার ছোরার কারবার ছিল।' সাভারকারের সচিব, গজনাত্রাও দামলে, ছিল তার আরেকজন জানাশোনা লোক। ১৯৪৪-৪৫ সময়কালে সাভারকারের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৪০-৪১ থেকে গডসেকে সে চেনে। আপ্তে আর কার্কারের সঙ্গে তার প্রথম অস্ত্রশস্ত্রের কারবার হয় ১৯৪৭ সালের জুলাই-আগস্টে। নভেম্বরে অস্ত্রের জন্য উত্তরোত্তর দাবি আসে। প্রকৃতপক্ষে বোম্বের মহাসভা ভবনেই অস্ত্র লেনদেন হবে এরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল।

ব্যাজ তার সব 'মাল' নিয়ে ১৪ই জানুয়ারি ১৯৪৮ সেখানে এসে পৌঁছোয়। বোম্বেতে তার মিলিত হবার পরেই ব্যাজ, আপ্তে আর গডসে একটা খাঁকি কাপড়ের থলেতে দুটো gun cotton slab (একটি দেশি বিস্ফোরক), পাঁচটা হ্যান্ড গ্রেনেড, ফিউজ তার, বিস্ফোরক ইত্যাদি নিয়ে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে যায়। 'সাভারকার ভবনে পৌঁছে আপ্তে তাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে। আপ্তে আমার হাত থেকে থলেটা নেয় তারপর আপ্তে আর গডসে সাভারকার ভবনের ভেতরে যায়। পাঁচ-দশ মিনিট পরে তারা ফিরে আসে। আপ্তে যখন বেরিয়ে আসে তখন থলেটা তার হাতেই ছিল।' তারা মহাসভার দপ্তরে ফিরে আসে। অবশ্যই তার বর্ণনাকে চাকচিক্যময় করার কোনো প্রবণতা ব্যাজ-এর ছিল না।

কার্কারে আর মদনলালকে ঐ থলে নিয়ে আপ্তে দিল্লির দিকে রওনা হতে বলে।

> আপ্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি তাদের সঙ্গে দিল্লি যেতে রাজি আছি কি না। আমি তাকে দিল্লিতে কী কাজ আছে তা জিজ্ঞাসা করি। আপ্তে আমাকে বলে, তাতিয়ারাও (সাভারকার) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু আর সোরাবর্দীকে 'শেষ' করে দিতে হবে এবং সে কাজের দায়িত্ব তিনি ভরসা করে আমাদের ওপর দিয়েছেন। সে আমাকে আরো বলে যে, এই উদ্দেশ্যে আমাকেও তাদের সঙ্গে দিল্লি যেতে হবে, আমার যাতায়াতের খরচখরচা তারাই দেবে। আমি বলি যে আমি দিল্লি যেতে রাজি আছি, কিন্তু এখুনি যেতে পারছি না। কারণ প্রথমে বাড়ির কিছু কাজকর্ম সারবার জন্য আমাকে পুনা ফিরতে হবে। তখন নাথুরাম গডসে বলল যে, সে-ও তার ভাই গোপাল গডসের সঙ্গে দেখা করবার জন্য পুনা যেতে চায়। গোপাল একটা রিভলবার সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া তাদের সঙ্গে দিল্লি যাবার জন্য গোপালকে বোম্বেতে নিয়ে আসতে হবে।

ব্যাজ তাদের প্রতিটি গতিবিধি এবং মদনলালের মতো অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছিল। সাভারকারের কাছে টাকাকড়ি ব্যাপারটা কখনই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। গুলাবচাঁদ হীরাচাঁদের মতো সুবিখ্যাত শিল্পপতিরা তাঁকে টাকার যোগান দিত। নিজেও তিনি অত্যন্ত আরামে থাকতেন— অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তুলনায় এ একেবারে বিপরীত চিত্র। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের কাছেও টাকা তোলাটা খুবই সহজ কাজ ছিল।

১৭ জানুয়ারি ব্যাজ বোম্বে ফিরে আসে এবং ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস রেল স্টেশনে গডসে আর আপ্তের সঙ্গে দেখা করে।

> কয়েক পা হাঁটবার পর আপ্তে প্রস্তাব দেয় যে, দিল্লি রওনা হবার আগে আমদের কিছু টাকাপয়সা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আপ্তে একটা ট্যাক্সি ডাকে আর আমরা সবাই তাতে চেপে বসি। তারপর আমরা লালবাগের গভর্নমেন্ট রোডে বোম্বে ডাইং হাউস-এ যাই। সেখানে শেঠ চরণদাস মেঘজী মথুরাদাসের সঙ্গে দেখা করি। তিনি বোম্বে ডাইং ওয়ার্কস-এর মালিক। আমি আগেই তাকে

চিনতাম। আমি আপ্তে আর গডসের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিই। তারপর ঐ তিনজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এরপর আমরা তিনজন দাদারের মহাসভা ভবনের দিকে রওনা হই। শঙ্করকে তুলে নেবার উদ্দেশ্যেই আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। শঙ্কর গাড়ির মধ্যে এসে বসবার পর গডসে বলে, তাতিয়ারাও-এর সঙ্গে আমাদের একবার শেষ 'দর্শন' হওয়া উচিত। তাই আমরা শিবাজী পার্কে সাভারকার সদনে যাই। সাভারকারের বাড়ির দিকে যে ছোট গলি ঢুকে গেছে তার সামনে বড়রাস্তার ওপর ট্যাক্সি থামে। ঐ মোড় থেকে তাঁর বাড়ি তিরিশ-চল্লিশ পা হবে। আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সাভারকারের বাড়ির দিকে যাই। সাভারকার সদনের বাইরের মাঠে শঙ্করকে অপেক্ষা করতে বলা হয়।

আমি, আপ্তে আর গডসে বাড়ির ভিতর আঙিনায় ঢুকি। আপ্তে আমাকে নিচের তলার একটা ঘরে অপেক্ষা করতে বলে। নাথুরাম গডসে আর আপ্তে ওপরে যায়। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে তারা নিচে নেমে আসে। গডসে আর আপ্তে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, তখন তাদের পিছু পিছু তাতিয়ারাও আসেন। তাতিয়ারাও বলেন, 'যশস্বী হৌন ইয়া'। আপ্তে আর গডসেকে উদ্দেশ্য করেই তাতিয়ারাও কথাগুলো বলেন। তারপর আমরা চারজনে ট্যাক্সিতে ফিরে আসি এবং রুইয়া কলেজের দিকে যাই। ট্যাক্সিতে আপ্তে আমাদের বলে যে, তাতিয়ারাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, গান্ধীর শতক শেষ হয়ে গেছে। আপ্তে আরো বলে যে, আমাদের কাজ যে সাফল্যের সঙ্গে শেষ হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে কথাগুলো ঠিকঠিক বলা হয়েছিল লিখুন— "তাতিয়ারাভানি আসে ভবিষ্যৎ কালে আহে কি গান্ধীজীকি সম্ভর বর্ষে ভারালি— আতা আপালে কাম নিশ্চিতা হোনার ইয়াত কাহি সংশয়া নাহি।" তারপর আমরা শ্রীমন্ত আফজুল পুকারের বাড়ির দিকে চললাম।

১৯শে জানুয়ারির দিল্লি যাত্রা, পরের দিন সকালে আপ্তের সঙ্গে বিড়লা ভবনে দেখাশোনার জন্য যাওয়া, সন্ধ্যার বিস্ফোরণ, দিল্লি থেকে তাদের পালানো এবং ২২শে জানুয়ারি পুনায় আসা সবই ব্যাজ বর্ণনা করেছিল। ৩১শে জানুয়ারির ভোরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'আপ্তে আমাকে বুঝিয়েছিল যে এই কাজ করার জন্য তাতিয়ারাও (সাভারকার) আদেশ দিয়েছেন। আমি একে তাতিয়ারাও-এর আদেশ হিসেবেই গ্রহণ করি এবং সেই আদেশ পালন করতে বাধ্য হই। নাথুরাম গডসে আর আপ্তের সঙ্গে আমার যতবার দেখা হয়েছে, ততবারই ওরা আমাকে যা যা করতে বলেছে, আমি করেছি।'

অপরাধীদের মধ্যে সাভারকার ছিলেন সাত নম্বরে। কিন্তু তাঁর আইনজীবীই প্রথম ব্যাজ-কে জেরা করেছিলেন। সাভারকার এবং তাঁর রচনার সম্বন্ধে তার কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের প্রকাশিত কোনো বই আমি বিক্রি করতাম না... অনেকবারই আমি

সাভারকার সদনে গিয়েছি কিন্তু মাত্র একবারই তাঁর (সাভারকার) সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

সাভারকারের বাড়ির ঢোকার দরজাটা মাটি থেকে একটু উঁচুতে থাকায় সীমানা-প্রাচীরের বাইরে থেকেও সেটা দেখা যেত। আঙিনার দিকে যাবার দরজাটা পাঁচিলের এক দিকে ছিল। কেউ যদি সেই দরজায় দাঁড়ায়, তাহলে সাভারকারের বাড়িতে ঢোকার দরজাটা তার নজরে পড়বে না। বাড়িটা দোতলা। বাড়িতে কোনো ভাড়াটে ছিল কি না তা আমি বলতে পারবো না। সাভারকারের পরিবারের লোকজন ছাড়া আরো কয়েকজন ঐ বাড়িতে থাকতো। তাঁর বাড়ির একতলায় আমার সঙ্গে তাতিয়ারাও দেখা হয়েছিল। বাড়ির ভেতর যদি ঢোকা যায় তবে তার বাঁদিকটায় এ এস ভিদে বাস করতেন একথা সত্যি। কোনো অংশে দামলে থাকতেন আমি জানি না। তাঁকে সবসময় ঐ বাড়িতেই দেখা যেত। ঢোকার দরজার মুখোমুখি একটা ঘর ছিল। খবরের কাগজ ভর্তি একটা টেবিল সেখানে রাখা হতো। সেখানে দুটো চেয়ারও থাকতো। দেয়ালে একটা কাঠের তক্তা আটকানো ছিল। তার ওপর ছিল টেলিফোন। তাতিয়ারাও দোতলায় থাকতেন একথা সত্যি। পড়ার ঘরের দরজা সাধারণ সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

সে আরো বলে :

আমার মনে পড়ছে, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ যখন ভারতের স্বাধীনতা উদযাপিত হচ্ছে, সাভারকার সেদিন তাঁর বাড়িতে হিন্দু মহাসভার পতাকা এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আমি সেদিন আমার বাড়িতে শুধুমাত্র হিন্দু মহাসভার পতাকা উড়িয়েছিলাম। তাতিয়ারাও সাভারকার ছাড়া আর কোনো হিন্দু মহাসভাপন্থীকে আমি সেদিন বাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলতে দেখিনি। আমি যেসব হিন্দু মহাসভাপন্থীদের দেখেছি তারা সকলেই সেদিন তাঁদের বাড়িতে হিন্দু মহাসভার পতাকা উড়িয়েছিলেন। বোম্বে প্রাদেশিক হিন্দু সভার সিদ্ধান্ত ছিল যে কেবলমাত্র 'ভাগোয়া' ঝাণ্ডাই ওড়ানো হবে, একথা সত্যি। কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাতিয়ারাও-এর নিজের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়ানোর ঘটনার হিন্দু মহাসভাপন্থীরা বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, এটা ঘটনা। তাঁর বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ায় আমিও বিরক্ত হয়েছিলাম। নাথুরাম গডসে, আপ্তে, কার্কারে ওরাও তার বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিল।

সম্পর্ক যে কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল সাক্ষ্যই তা দেখিয়ে দেয়।

১৯৪০-৪১ সালে আমি দীক্ষিত মহারাজের কথা জানতে পারি। তিনি ছিলেন একজন ধর্মীয় গুরু, সনাতনপন্থী। তিনি কংগ্রেসী ছিলেন কিনা তা আমি বলতে পারবো না। তিনি আমার কাছ থেকে প্রায়ই অস্ত্রশস্ত্র কিনতেন বলে আমি প্রায়শই তাঁর বাড়ি যেতাম। তিনি আমার কাছ থেকে কেন অস্ত্রশস্ত্র

চান এ প্রশ্ন আমি কখনোই তাঁকে করিনি। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময়ই কেবল তিনি সাধারণত আমার থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনতেন। আমি কেবল হিন্দুদেরই অস্ত্র বিক্রি করি। দীক্ষিত মহারাজ সাধারণত ছোরা, kuncle duster এবং বাঘনখ কিনতেন।

সাভারকারের জেরাই সবচেয়ে দীর্ঘ ছিল। বাকিদের আইনজীবীরা খুবই সংক্ষেপে সেরেছেন। সাভারকারের বাড়িতে যাওয়া সংক্রান্ত ব্যাজ-এর সাক্ষ্যের প্রমাণ স্বরূপ সরকারী পক্ষ আরো দুজন সাক্ষীকে উপস্থিত করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন অভিনেত্রী মোদক (পি ডব্লিউ ৬০) যাঁর ফিল্মী নাম ছিল বিম্বা। ১৪ই জানুয়ারি বোম্বেগামী পুনা এক্সপ্রেসে আপ্তে এবং গডসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দাদার রেল স্টেশনে নামবার পর তাঁর ভাই সেখানে তাঁকে নেবার জন্য হাজির ছিল। তাঁরা গডসে এবং আপ্তেকে শিবাজী পার্ক পর্যন্ত 'লিফট' দিয়েছিলেন।

আমার ভাই-এর বাড়ি আর সাভারকার-সদন একই রাস্তায় এবং রাস্তায় একই দিকে অবস্থিত। দুটো বাড়ির মধ্যে একটা খোলা জায়গা আছে। কেউ যদি দাদার রেল স্টেশন থেকে আসে আর বাড়িতে আসার রাস্তায় বাঁক নেয় তবে প্রথমে পড়বে আমার ভাই যেখানে থাকেন সেই বাড়ি, তারপর সাভারকার সদন। দুটো বাড়িই রাস্তার ডান হাতে। আমার ভাই যেখানে থাকে সেই বাড়ি আমরা ছাড়িয়ে গেলাম, সাভারকার সদনের সামনে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক দুজন ওখানেই নামলেন। তারপর আমরা আবার গাড়ি ঘুরিয়ে সেটাকে ভাই-এর বাড়ির সামনে নিয়ে এলাম। আমি দেখলাম ভদ্রলোক দুজন সাভারকার সদনের দিকে যাচ্ছেন। বোম্বের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যে সনাক্তকরণ কুচকাওয়াজ হয়েছিল, সেখানে আমি ঐ ভদ্রলোকদের দুজনকেই চিনতে পারি। আমি তাদের প্রথম দেখি ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৮, তারপর ঐ সনাক্তকরণ কুচকাওয়াজ আর এখন এই এছাড়া আর কখনো কোনোদিন আমি এঁদের দেখিনি।

আরেকজন সাক্ষী ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভার আইতাপ্পা কোতিয়ান। ১৭ জানুয়ারি সে-ই গডসে, আপ্তে আর ব্যাজ-কে সাভারকার সদনে নিয়ে গিয়েছিল। সেও একইরকমভাবে সনাক্তকরণ কুচকাওয়াজ আর আদালতে তাদের সনাক্ত করেছিল। ব্যাজ-এর চাকর কিস্তোয়াও তাই।

তারপর আমাদের ট্যাক্সিটা শিবাজী পার্কে নিয়ে যেতে বলা হয়। আমি ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিই এবং সেটাকে রাণাডে রোড দিয়ে নিয়ে যাই। ঐ রাস্তা দিয়েই আমি দক্ষিণদিকে শিবাজী পার্কে গিয়েছিলাম। শিবাজী পার্কের দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় রাস্তাটার মোড়ে আমি গাড়ি থামাই। চারজন আরোহী-ই ট্যাক্সি থেকে নেমে যায়। যতদূর আমি দেখতে পেয়েছিলাম তাতে আমার ডান হাতের রাস্তার মোড় থেকে দ্বিতীয় বাড়িটায় তারা গিয়েছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তারা ট্যাক্সিতে ফিরে আসে। তারপরে আমাকে বলা হয় দাদারের হিন্দু কলোনিতে

যেতে। রুইয়া কলেজে পৌঁছোবার পর তারা একজন লোককে ড. মহেশৈসকারের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে। সে তাদের সোজা ইরানি শপ পর্যন্ত যেতে বলে এবং বলে দেয় যে তার পেছনেই ঐ 'ওয়াড়ি'। আমি সেখানে ট্যাক্সি নিয়ে যাই আর ওরা সকলে নেমে যায়। ওরা একটা বাড়িতে ঢোকে। মিনিট পনেরো পরে ফিরে আসে। তারপর আমাকে কুরলা নিয়ে যেতে বলে।

তারপর আরো অনেকবার তাদের বেড়াতে নিয়ে গিয়ে কেমন করে সে বেশ ভালো টাকাই রোজগার করেছিল তার বর্ণনা দেয় সে।

সাভারকারের জবানবন্দী

ঐ দু'টি সাক্ষাৎকার বিষয়ে সাভারকারের বক্তব্য সঠিকভাবে বিস্তৃতাকারে উদ্ধৃতির দাবি রাখে। ১৪ই জানুয়ারি রাত ৯টার সময় গডসে, আপ্তে আর ব্যাজ-এর আসার ব্যাপারে তিনি বলেন :

> প্রথমতএখানে ব্যাজ কোথাও আমার নাম উল্লেখ করেনি, কাজেই আপ্তে এবং গডসে পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য সাভারকার সদনে এসেছিল কেবল সেই কথাটাই এখানে উঠেছে। কিন্তু সাভারকার সদনে আসা মানেই তো আর সাভারকারের সঙ্গে দেখা করা নয়। দামলে, ভিদে আর কাসারের সঙ্গে আপ্তে আর গডসের ভালোই পরিচয় ছিল। দামলে, ভিদে আর কাসারকে প্রায় সবসময়ই নিচের তলায় দেখা যেত। দামলে আর ভিদে তো ওখানে থাকতো। সাক্ষ্যে ব্যাজ নিজেই একথা বলেছে। কাজেই আপ্তে আর গডসে তাদের হিন্দু মহাসভার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আসতেই পারে... কিংবা ফোন করতে পারে। হিন্দু মহাসভার অন্য যেসব কর্মী পড়ার ঘরে বসে পড়াশুনো করতো তাদের সঙ্গেও দেখা করতে পারে। আর দুজনেই তো পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।
>
> ব্যাজ পরিষ্কারভাবেই বলেছে যে, আপ্তে যখন বেরিয়ে এসেছিল তখন ওর হাতে একটা থলি ছিল। ব্যাজ এমন একটা কথাও বলেনি যাতে দেখানো যায় যে, আপ্তে থলেটা বাড়ির ভেতরে রাখতে গিয়েছিল। উপরন্তু ব্যাজ এ কথা স্বীকার করেছে যে, থলেটা সেদিন রাত্রে তারা দীক্ষিত মহারাজের বাড়িতে রেখেছিল।
>
> দ্বিতীয়ত, আরো একবার এ বিষয়টি লক্ষ্য করা হোক যে, আপ্তে এবং গডসে উভয়েই এটা অস্বীকার করেছে। তারা বলেছে যে, অভিযোগমতো ব্যাজ-এর সঙ্গে থলে নিয়ে তারা সাভারকার সদনে যায়নি। তৃতীয়ত, এই ঘটনাকে প্রমাণ করার জন্য কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষী সরকার পক্ষ হাজির করতে পারেনি। ফলত, 'ব্যাজ এবং থলে'-র গোটা কাহিনীর কোনো প্রামাণিক মূল্য আদৌ নেই।

১৫ই জানুয়ারি ব্যাজ-এর সঙ্গে আপ্তের এইরকম কথাবার্তা হয়। ব্যাজ গান্ধী হত্যার পরিকল্পনায় কখনো নিজমুখে সাভারকারকে কোনো কথা বলতে শোনেনি।

তৃতীয়ত, যদি ধরেও নেয়া যায় যে, 'ব্যাজ যখন বলছে যে আপ্তে তাকে ঐ বাক্য বলেছিল' তখন যে সত্যি কথাই বলছে, তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে আপ্তে ব্যাজ-কে যা বলেছিল সেটা সত্যি না মিথ্যে। আমি কখনো আপ্তেকে গান্ধী, নেহরু এবং সুরাবর্দীকে শেষ করে দিতে বলেছি, এমন কোনো প্রমাণ নেই। হিন্দু সংঘপন্থীদের ওপর সাভারকারের নৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগানোর জন্য আপ্তে হয়ত নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এই জঘন্য মিথ্যা কথাটা উদ্ভাবন করেছিল। এটা তো সরকার পক্ষেরই কথা যে আপ্তে মাঝে মাঝে এইরকম নীতিজ্ঞানহীন কৌশলের আশ্রয় নিত। যেমন, অভিযোগ করা হয়েছে যে আপ্তে হোটেল মালিক এবং অন্যদের মিথ্যা নাম-ঠিকানা জানিয়েছিল এবং যেসমস্ত অস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স ছাড়া সঙ্গে রাখা কিংবা বেচাকেনা করা অনুমোদিত নয়, সেগুলো সে সংগ্রহ করত।

চতুর্থত, আপ্তে এবং গডসে উভয়েই বার বার অত্যন্ত জোরালভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে যে তারা কখনো আমার সম্বন্ধে ব্যাজ-কে এইরকম কোনো মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের বক্তব্য, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য এবং রাজসাক্ষী হিসেবে ক্ষমা পাওয়ার জন্য ব্যাজ হয় পুলিসের চাপে কিংবা তাদের খুশি করার জন্য আমাকে দোষারোপ করতে এইসব মিথ্যা বলছে। কেননা সে জানতো যে, পুলিস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছে এবং এই মামলায় আমাকে দোষী প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে সত্যিমিথ্যে যে কোনো প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পঞ্চমত, সরকারী পক্ষের দিক থেকেও আমার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাজ-এর সাক্ষ্যের এই অংশটুকু একটা বাস্তব অংশ মাত্র। অথচ কোনো রাজসাক্ষীর বয়ান কখনই নির্ভরযোগ্য নয় যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলি বাস্তব তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ এবং ভালো সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ব্যাজ-এর সাক্ষ্যের এই অংশটি অন্য কোনো নিরপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণে সমর্থন করার মতো কাউকে সরকার পক্ষ উপস্থিত করতে পারেনি।

ব্যাজ-এর অভিযোগমতো ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৮-এর রাত্রে। তার বয়ানে ২০৭ নং পাতায় সে বলে, সুতরাং 'গডসে, আপ্তে এবং আমি (ব্যাজ) আর শঙ্কর একটা ট্যাক্সি নিয়ে যাই। গডসে বলেছিল তাতিয়ারাও-এর সঙ্গে একবার শেষ-'দর্শন' করে আসি আমরা। আমরা সাভারকার সদনের দিকে গাড়ি চালালাম। সেখানে শঙ্করকে প্রাঙ্গণের বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হলো। আমরা তিনজন সাভারকারের বাড়িতে ঢুকলাম। আপ্তে আমাকে (ব্যাজ-কে) নিচের তলার ঘরে অপেক্ষা করতে বলল। গডসে

আর আপ্তে ওপরের তলায় গেল। পাঁচ-দশ মিনিট পরে তারা নিচে নেমে এল। গডসে আর আপ্তে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাতিয়ারাও তাদের পিছনে এলেন। তাতিয়ারাও বললেন, 'সফল হও এবং ফিরে এস' (যশস্বী হৌন ইয়া)। তাতিয়ারাও এই কথাগুলো আপ্তে আর গডসেকে বলেছিল। আমরা চারজনে তখন ট্যাক্সিতে চেপে সাভারকারের বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এবং রুইয়া কলেজের দিকে যাই। ট্যাক্সিতে আপ্তে আমাকে বলে যে তাতিয়ারাও বলেছেন যে, গান্ধীর শতক শেষ। আপ্তে আরো বলে যে, আমাদের কাজ যে সফলভাবে শেষ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' তারপর তারা আফজলপুরকারের বাড়ির দিকে যায় ইত্যাদি।

প্রথমত, এ প্রসঙ্গে আমি জানিয়েছি যে, ১৭ই-জানুয়ারি, ১৯৪৮ বা তার কাছাকাছি অন্য কোনো দিন আপ্তে আর গডসে আমার সঙ্গে দেখা করেনি এবং আমি তাদের বলিনি 'সফল হও এবং ফিরে এস' এবং আমি কখনো এরকম ভবিষ্যদ্বাণী আপ্তে কিংবা অন্য কারোর কাছে করিনি যে গান্ধীজীর শতক শেষ।

দ্বিতীয়ত, এই বাড়িতে আসা প্রসঙ্গে ব্যাজ যা বলেছে সেটি সত্য বলে ধরে নিলেও, সে যেহেতু পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছে যে, সে আমার বাড়ির নিচের তলার একটা ঘরে বসেছিল এবং আপ্তে আর গডসে একাই ওপরে গিয়েছিল, কাজেই ওরা আমার দেখা পেয়েছিল না কি দেখা করতে পারেনি কিংবা বাড়ির দোতলায় আরো যেসব ভাড়াটিয়া থাকত তাদের পরিবারের কারোর সঙ্গে দেখা করেছিল কিনা এসব কোনো কিছুই সে নিশ্চিত করে জানতে পারে না। আপ্তে আর গডসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং আমার সঙ্গেই তাদের কথা হয়েছিল যদি তর্কের খাতিরে একথাও ধরে নেওয়া হয়, তবুও একটা খুব সহজ যুক্তিতে সে সম্পর্কে ব্যাজ-এর কোনো প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত ধারণা থাকা সম্ভব নয়। কেননা নিচের তলায় যে ঘরে সে বসেছিল বলে নিজেই স্বীকার করেছে যে ঘর থেকে ওপরতলায় যাই ঘটুক না কেন তা সে শুনতে বা দেখতে পারে না। আপ্তে আর গডসে যেহেতু একলাই ওপরে গিয়েছিল তাই তারা ঐ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ছাড়া কোনো কথা বলতেই পারে না, এই বিশ্বাসে একে স্বতঃপ্রমাণিত সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া অবাস্তব। না, বরং এমন হতে পারে যে তারা ঐ অভিযুক্ত ষড়যন্ত্র ছাড়া যে কোনো বিষয় নিয়েও কথা বলতে পারে।

বিশেষত এমন হতেই পারে, কেননা সরকারপক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, সেই বিশেষ দিনে ব্যাজ, আপ্তে আর গডসে ঐ গাড়িটায় চেপে বোম্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নানান লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে গিয়েছিল এবং সেখানে গান্ধীজীকে হত্যার ষড়যন্ত্র ছাড়া একেবারে ভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলেছিল। যেমন তারা আফজলপুরকারের কাছে

গিয়েছিল এবং নিজাম গণপ্রতিরোধ আন্দোলনের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল এবং টাকাও সংগ্রহ করেছিল একথা সরকারপক্ষের সাক্ষী আফজলপুরকার তাঁর বয়ানে বলেছেন। তারা বোম্বেডাইং ওয়ার্কসের শেঠ চরণদাস মেঘজীর কাছে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আপ্তে একলাই দেখা করেছিল যদিও কেবল নিজাম রাষ্ট্রের বিষয়েই কথা হয়েছিল এবং নিজাম রাষ্ট্র প্রতিরোধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিল।[২৬] এরমধ্যে তারা গিয়েছিল কুরলা এবং সেখানে পটবর্দ্ধন, পতানকর, কালে ইত্যাদি ইত্যাদির সঙ্গে দেখা করেছিল,[২৭] তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল, আর 'প্রাত্যহিক অগ্রণী' এবং 'হিন্দু রাষ্ট্র প্রকাশন' এবং আরো অন্য কিছু সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। কাজেই আপ্তে আর গডসে যদি সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেও থাকে, যদি তাদের সঙ্গে সাভারকারের আদৌ দেখা হয় এবং উপরতলায় তাঁর সঙ্গে কথা হয় তবে হায়দরাবাদ, গণ প্রতিরোধ 'প্রাত্যহিক অগ্রণী' কিংবা অন্য কোনো হিন্দুসভার কাজ এই নিয়েও কথা বলতে পারে অথবা শুধু তার শরীরস্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে ফিরে আসতে পারে, এমন হওয়াই তো সবচেয়ে বেশি সম্ভবপর। তারা সারাদিন আরো অন্য লোকের সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলেছে এবং কোনোটাই এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে নয় সেকথা তো সরকারপক্ষের সাক্ষ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, ঠিক ঐ একই কারণে ব্যাজ-এর অভিযোগটিও খারিজ হয়ে যায়, যেখানে সে বলছে, 'মাত্র পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই আপ্তে আর গডসে নিচের তলায় ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সাভারকার তাদের পিছু পিছু আসেন। সাভারকার গডসে এবং আপ্তেকে বলেন 'সফল হও এবং ফিরে এস'। যদি এটা ধরেও নেওয়া যায় যে ওকথাটা আমি বলেছি, তবুও যে কোনো উদ্দেশ্য এবং যে কোনো কাজ যাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যেমন নিজাম গণ-প্রতিরোধ, প্রাত্যহিক পত্রিকা অগ্রণীর জন্য তহবিলের অর্থ সংগ্রহ কিংবা রাষ্ট্র প্রকাশন লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার বেচা যেটাতে আমি নিজেও আর্থিকভাবে আগ্রহী ছিলাম কিংবা অন্য কোনো বৈধ কাজকর্মের প্রসঙ্গও তো এতে উল্লেখ করা হতে পারে। উপরতলায় আপ্তে আর গডসের সঙ্গে কী কী কথাবার্তা হয়েছে সে বিষয়ে ব্যাজ যেহেতু কিছুই জানে না, কাজেই আমার মন্তব্য 'সফল হও ইত্যাদি' ঠিক কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে ব্যাজ নিশ্চিতকরে কিছুই বলতে পারে না।

চতুর্থত, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে অন্য কোনো বাড়িতে যাবার সময় এরই প্রতিক্রিয়ায় আপ্তে তাকে বলেছিল যে আমি বলেছি 'গান্ধীজীর শতক শেষ'। ব্যাজ-এর এই যে অভিযোগ, সেটাও শোনা কথা এবং এটা আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই নয়। কেননা আমি যেকথা আপ্তেকে বলেছি বলে অভিযোগ উঠেছে সেটা আপ্তে ব্যাজ-কে বলেছে। নিজে

ব্যক্তিগতভাবে ব্যাজ আমায় আপ্তেকে এই কথাগুলো বলতে শোনেনি। আমি যে আপ্তেকে এই কথাগুলি বলেছি এ প্রসঙ্গে আপ্তে মিথ্যে বলতেই পারে। এতে আমি সত্যি আপ্তেকে এ কথা বলেছি সেটা প্রমাণও হয় না, সমর্থিতও হয় না।

কাজেই ব্যাজ মিথ্যে বলেছে নাকি নৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগাবার জন্য গডসে আর আপ্তে মিথ্যে কথা বলেছে যাতে তাদের এই অভিযুক্ত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রকে আরো একটু ছড়িয়ে লোকের কাছে আমার নামটি যুক্ত করা যায়, সে যাই হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই এই ষড়যন্ত্রে আমি যুক্ত ছিলাম কিংবা অপরাধের বিষয়ে আমার জানা ছিল বলে আমাকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো নিরপেক্ষ, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব প্রমাণের অভাবে আমাকে কোনোমতেই দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে না।

পঞ্চমত, সর্বোপরি গডসে এবং আপ্তে দুজনেই স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করে বলেছে যে, তারা এমন কোনো কথা ব্যাজ-কে বলেনি। উপরন্তু ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৮ যা যা ঘটেছিলো বলে ব্যাজ অভিযোগ করেছিল সেই গোটা ঘটনাটাই আপ্তে আর গডসে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, ঐদিন তারা ব্যাজ কিংবা অন্য কাউকে নিয়ে গাড়ি করে সাভারকার সদনে যায়নি এবং কখনো সাভারকারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেনি। গোটা কাহিনীটা ব্যাজ যেভাবে বলেছিল তার সঙ্গে আপ্তে আর গডসের বক্তব্যের এমন স্ববিরোধিতা যে, ব্যাজ-এর অভিযোগের এই ভিত্তিটাই নাকচ হয়ে যায়।

ষষ্ঠত, ব্যাজ অভিযোগ করেছে যে, সাভারকার সদনে সেদিনের যাবার ঘটনার সময় সে গডসে এবং আপ্তের সঙ্গে কোতিয়ান নামের একজন লোকের ট্যাক্সি ভাড়া করেছিল। কোতিয়ানই ছিল চালক। ঐ ট্যাক্সি চালক কোতিয়ান তার জবানীতে বলেছে 'শিবাজী পার্কে আমি ট্যাক্সিটা দাঁড় করাই। চারজন আরোহী নেমে যায়। যতদূর আমি দেখতে পেয়েছি তাতে আমার ডান হাতে রাস্তার মোড় থেকে দ্বিতীয় বাড়িটায় তারা ঢোকে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই তারা ফিরে আসে।' ব্যাজ-এর গল্পের সমর্থন পাবার জন্য যদি ট্যাক্সি চালককে নিয়ে আসা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে জড়িয়ে যেসব ঘটনা রয়েছে যে প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সে-ও একথা প্রমাণ করতে পারেনি। আমার বাড়িটা ঠিক কোথায় সেটা ট্যাক্সি চালক বলতে পারেনি, সে তার নাম জানে না, কার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার আরোহীরা ঐ বাড়িতে যেতে চেয়েছিল, ও বিষয়ে সে একটা কথাও বলেনি, সে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখও করেনি যে ওটা দ্বিতীয় বাড়িটা, কেবল অস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আমি যেখানে থেমেছিলাম সেখান থেকে যতদূর আমি দেখতে পেয়েছিলাম তাতে ওটা আমার ডান হাতে রাস্তার ওপরে দ্বিতীয় বাড়ি।' সে শুধু বলেছিল, ওদের সে কেবল বাড়ির দিকে যেতে দেখেছিল। একবারও বলেনি যে সে তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেখেছিল।

কাজেই আমার বাড়িতে তার আসা প্রসঙ্গে ব্যাজ-এর অভিযোগ তার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হতে ব্যর্থ এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি...

সাভারকারে মতে,

ব্যাজ যদি সত্যিই আমার অভিযুক্ত আদেশের মতো এমন অস্বাভাবিক, বেপরোয়া আদেশ পেয়েও থাকে যাতে তার জীবনের ঝুঁকি নিতে হয় এবং এরকম একটা বিপজ্জনক উদ্দেশ্যে তাকে সরাসরি দিল্লি যেতে হয়, তবে সামনে থেকে গান্ধীজীকে আক্রমণ করার জন্য তার যে প্রতিশ্রুতি সেটা পূর্ণ না করেই কেমন করে সে অত তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে এল আর কেনই বা সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল আর পালিয়ে বেড়াচ্ছিল? এ কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, তারপর থেকে 'তার একমাত্র চিন্তা কেমন করে নিজেকে বাঁচানো যায়।'

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যাজ-কে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে আক্রমণ করেন। এমনকী তাঁর প্রতি গডসে এবং আপ্তের একনিষ্ঠতা সম্পর্কিত সরকারী পক্ষের প্রমাণের ওপর তিনি এই বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, 'অনেক অপরাধী তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রের গুরুদের এবং পথপ্রদর্শকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাদের মতবাদ অনুসরণ করার কথা প্রচার করে। কিন্তু এই গুরু বা পথপ্রদর্শকদের অনুসরণকারীরা যেসব অপরাধ সংগঠিত করে সেক্ষেত্রে গুরুদের প্রতি এইসব অপরাধীর শ্রদ্ধা কিংবা আনুগত্যের কারণে গুরু বা পথপ্রদর্শকরাও ঐসব অপরাধের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমন কথা কি কখনো প্রমাণিত হয়েছে?'

এই উদ্ধৃতিতে সাভারকারের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুন্দর আভাস এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। এই নিশ্চিত আশ্বাসে সাভারকার তার নষ্ট হওয়া বিশ্বাসযোগ্যতাকে অনেকটাই মেরামত করে ফেলেছেন :

গান্ধীজী এবং নেহরুজীর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার যে অনুভব তা যদি আমি মহামান্য হুজুরের নজরে আনার চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টি মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ প্রসঙ্গে সুদূর অতীতে গান্ধীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে যে সম্পর্ক ছিল আমি তা উল্লেখ করবো না। ১৯০৮ সালে গান্ধীজী কীভাবে একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণ ভার্মার 'ইন্ডিয়া হাউসে' আমার তত্ত্বাবধানে আমার কথামতো বাস করতেন, কেমনকরে গান্ধীজী আর আমি একসঙ্গে বন্ধুর মতো থাকতাম, সহযোদ্ধার মতো একসঙ্গে কাজ করতাম, পরে কীভাবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে এবং আমার পরিবারে ব্যক্তিগতভাবে বেড়াতে এসেছিলেন এবং আমাদের পুরোনো বন্ধুত্ব এবং বর্তমান রাজনীতির বিষয়ে অত্যন্ত সুখকর আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করেছিলেন এসব কিছুই আমি উল্লেখ করবো না। কীভাবে গান্ধীজী এখন এবং তখনও তাঁর 'নবীন ভারত'-এ আমার সম্পর্কে সহৃদয় রচনা লিখেছেন এ কথা বলেও আমি আদালতের সময় নষ্ট করবো না। কেননা এই মামলার প্রসঙ্গে এইসব স্মৃতিচারণা অনেক দূরের বিষয় বলে মনে হতে পারে।

এটুকু বলাই এখানে যথেষ্ট যে, কয়েকটি বিশেষ বিষয় এবং অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের নীতির কারণে আমাদের মতাদর্শগত মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা এবং সমীহের ভাব সবসময়েই বজায় ছিল।

তিনি তাঁর বিবৃতিতে ২০শে জানুয়ারি সংঘটিত মদনলালের আক্রমণের প্রকাশ্য নিন্দা করেননি এটা বেশ তাৎপর্যময়। ১৯৪৪ সালে জিন্নার ওপর আক্রমণকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

রায়

বিচারক আত্মাচরণ অত্যন্ত অধ্যবসায়ে তাঁর রায়ে ব্যাজ-এর শপথ নেওয়া প্রামাণিক বক্তব্যের বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। ২৪নং অধ্যায়ে তাঁর নিরীক্ষার যে যুক্তিগুলি রয়েছে সেগুলি বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হওয়া উচিত। সেটাই যথাযথ হবে।

> কার্যত এখন এটাই আইনের অনুশাসন যে লিখিত বয়ান (corpus delicti) এবং অভিযুক্তের সনাক্তকরণ উভয় দিক থেকেই রাজসাক্ষীর বক্তব্য অবশ্যই সমর্থিত হতে হবে, যদিও অপরাধের প্রতিটি খুঁটিনাটি সমেত সমস্ত বিবরণের সমর্থন প্রয়োজনীয় নয় অথবা সমর্থিত প্রমাণাদি শাস্তি দানের পক্ষে যথেষ্ট হতেই হবে এটাও জরুরী নয়। প্রয়োজনীয় সমর্থনের প্রকৃতি এবং বিস্তৃতি প্রতিটি নির্দিষ্ট মামলায় পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এবং সেইমতো বদলে যায়। বিশেষত অভিযুক্ত অপরাধের প্রকৃতি, চরিত্র এবং রাজসাক্ষীর পূর্বপরিচয় ও তার সাক্ষ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহের মাত্রা, রাজসাক্ষী তার বক্তব্য নথিভুক্ত করাকালীন পরিস্থিতি, এবং অভিযুক্তকে তার মিথ্যা দোষারোপ করার উদ্দেশ্য— এ-সবই বিচার্য।
>
> রাজসাক্ষীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং জেরা চলেছিল ২০.৭.১৯৪৮ থেকে ৩০.৭.১৯৪৮ পর্যন্ত। প্রায় সাতদিন তাকে জেরা করা হয়েছিল। অতএব তার আচার-আচরণ এবং কীভাবে সে সাক্ষ্য দিচ্ছে তা লক্ষ্য করার প্রচুর সুযোগ ছিল। সে অত্যন্ত সোজাসুজি এবং সরাসরি তার বয়ান পেশ করেছিল। সে কখনই জেরা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চাতুরী বা চাতুরীর চেষ্টা বা কোনো প্রশ্নে নিজের গা বাঁচানো এসব কিছুই করেনি। কোনো মানুষের পক্ষেই যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি সে বিষয়ে এত নিখুঁতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এত বিস্তারিত এবং এত নির্দিষ্টভাবে সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভব হতে পারে না। যে কাহিনীর আদৌ কোনো ভিত্তি নেই সেটিকে কোনো মানুষ এত দীর্ঘ দিন ধরে এত বিস্তারিতভাবে মনে রেখেছে এমন ধারণা করা কঠিন।
>
> রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যকে খুব সহজেই তিনটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে— প্রথমত, পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে এমন সাক্ষ্য, দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে যে সাক্ষ্যগুলি সমর্থিত হয়েছে এবং তৃতীয়ত কোনো নির্দিষ্ট অভিযুক্তের সনাক্তকরণে যে সাক্ষ্যগুলি সমর্থিত হয়নি।

রাজসাক্ষীর যে সাক্ষ্য পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমি রাজসাক্ষীর সেই সাক্ষ্যে আসছি, যেগুলি সাধারণভাবে সমর্থিত হয়েছে। রাজসাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, সে সেসময় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরকের কারবার করত এবং ঐ বিষ্ণু আর. কার্কারে, মদনলাল আরো দুজন ব্যক্তির সঙ্গে ৯.১.১৯৪৮ তার বাড়িতে বিস্ফোরকগুলির তদন্ত করতে আসে। ১০.১.১৯৪৮ তাকে হিন্দু রাষ্ট্র অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে সে নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ ডি. আপ্তেকে দু'টি... এবং পাঁচটি হ্যান্ড গ্রেনেড ১৪.১.১৯৪৮ দাদারের হিন্দু মহাসভার দপ্তরে সরবরাহ করতে সম্মত হয়।

আসামী পক্ষ থেকে এই মর্মে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, বিষ্ণু আর কার্কারে এবং নারায়ণ ডি আপ্তের সঙ্গে যে ব্যক্তিরা ৯.১.১৯৪৮ রাজসাক্ষীর বাড়িতে গিয়েছিল বলা হচ্ছে, রাজসাক্ষীর কাহিনীর সমর্থনে অন্তত তাদের উপস্থিত করা হোক। সরকারী পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের খুঁজে বের করার জন্য যতরকম সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এমনকী তারা যদি সাক্ষ্য দিতে আদালতে উপস্থিতও হতো তাহলেও তাদের সাক্ষ্যে এদের বিরুদ্ধে দুষ্কর্মের সহচর ছাড়া অন্য কিছু প্রমাণ করা যেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

রাজসাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, দীক্ষিত মহারাজের মন্দির প্রাঙ্গণে নারায়ণ ডি আপ্তে তাকে তাদের সঙ্গে দিল্লি রওনা হতে বলেছিল। কেননা মহাত্মা গান্ধীকে 'শেষ' করে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে তা করতে রাজিও হয়েছিল। সে শঙ্কর কিস্তোয়াকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি রওনা হয়েছিল এবং মদনলাল কে পাহওয়া ও গোপাল ভি গডসের সঙ্গে ১৯.১.১৯৪৮ থেকে ২০.১.১৯৪৮ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভা ভবনে ছিল।

আসামি পক্ষের তরফ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, রাজসাক্ষীর কাহিনীর সমর্থনে হিন্দু মহাসভা ভবনের কোনো একজনকে অন্তত উপস্থিত করাতে হবে। হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের সপক্ষে সরকারী পক্ষ এরকম কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারেনি।

রাজসাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, ২০.১.১৯৪৮ নারায়ণ ডি. আপ্তে তাকে ও তার সঙ্গে কিস্তোয়াকে নিয়ে বিড়লা ভবনে গিয়েছিল এবং তাকে প্রার্থনা-মঞ্চ, পেছনে জাফরি লাগানো জানলা আর চাকরদের বাসা দেখিয়েছিল।

আসামীপক্ষের তরফ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, অন্ততপক্ষে দারোয়ান এবং ঐ বাসায় থাকে এমন দু-একজন চাকরকে রাজসাক্ষীর কাহিনীর সমর্থনে হাজির করানো হোক। দারোয়ান এবং বাসায় থাকা চাকরের সেদিন বিড়লা ভবনে এদের আসাযাওয়া যে বিশেষ লক্ষ্য করেনি তেমন সম্ভাবনাই

বেশি। যাই হোক, নারায়ণ ডি. আপ্তে ঐ স্থানে তার আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে যাবার আগে রাজসাক্ষীকে যে প্রার্থনা-মঞ্চ এবং আশেপাশের এলাকা দেখিয়ে দেবে তার সপক্ষে যুক্তি থেকেই যায়। বিষয়টা কীভাবে রয়েছে এবং কী কাজ করার ইচ্ছা প্রথমে সেটা তার কাছে ঠিকমতো ব্যাখ্যাত যদি না হয়, তবে এমনি সে রাজসাক্ষীকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে বলতে পারে না।

রাজসাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, ২০.১.১৯৪৮ মারিনা হোটেলে তারা gun-cotton slab-এ প্রাইমার ও হ্যান্ড-গ্রেনেডে বিস্ফোরক আটকেছিল, ওখানেই সমস্ত পরিকল্পনা আলোচনা করেছিল এবং তাদের মধ্যে 'মাল' ভাগাভাগি করেছিল। অবশ্যই, সঙ্গত কারণে সরকারী পক্ষের তরফে এর কোনো প্রত্যক্ষ সমর্থন উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য সরকারী পক্ষের তরফে অপ্রত্যক্ষে সমর্থিত ছোট্ট একটি প্রমাণ... উপস্থিত করা হয়েছে। এক্সিবিট P/১৭- এবং P/২৪-এর সমর্থিত নৈন সিংহের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, সেদিন ৪০ নং রুমে তিনটি বাড়তি চায়ের অর্ডার ছিল এবং যেগুলি দেওয়াও হয়েছিল।

কোনো প্রমাণের বিচারবিশ্লেষণে একটি সুপরিচিত নীতি হলো, পরবর্তী ঘটনার আলোকে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলিকে বিন্যস্ত করা। পরবর্তীকালে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে যদি রাজসাক্ষীর দেওয়া উপরোক্ত কাহিনী অত্যন্ত ভালোভাবে মিলে যায় তবে কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই সেটি সমর্থিত হয়। অতএব রাজসাক্ষীর যে সাক্ষ্য সাধারণভাবেই সমর্থিত হয়েছে তার ওপর কেন আস্থা রাখা যাবে না, তার সপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই।

এবার আমি নির্দিষ্ট একজন অভিযুক্ত বিনায়ক ডি সাভারকারের সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য যে কোনোভাবে সমর্থিত হয়নি, সে বিষয়ে আসছি।

রাজসাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেছে, ১৪.১.১৯৪৮ নারায়ণ ডি আপ্তে ও নাথুরাম ভি গডসে তাকে দাদারের হিন্দু মহাসভার দপ্তর থেকে এই বলে সাভারকার সদনে নিয়ে গিয়েছিল যে, 'মাল' রাখার ব্যবস্থাপনা করতে হবে। 'মাল' ভর্তি থলে তার কাছে ছিল, নাথুরাম ভি গডসে ও নারায়ণ ডি আপ্তে তারপর তাকে সাভারকার সদনের বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে গিয়েছিল। নারায়ণ আপ্তে ও নাথুরাম গডসে পাঁচ-দশ মিনিট পর 'মাল'-এর ব্যাগ নিয়ে ফিরে এসেছিল।

তারপর রাজসাক্ষী বলে যে, ১৫.১.১৯৪৮ দীক্ষিত মহারাজের মন্দির প্রাঙ্গ নে নারায়ণ ডি আপ্তে তাকে বলেছিল, তাতিয়ারাও সাভারকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, গান্ধীজীকে 'শেষ' করে দিতে হবে এবং এ কাজের ভার তাদের ওপর দেওয়া হয়েছে। এরপর রাজসাক্ষী বলে, ১৭.১.১৯৪৮ নাথুরাম ভি গডসে পরামর্শ দেয় যে, তাদের সকলের গিয়ে তাতিয়ারাও সাভারকারের শেষ

'দর্শন' করা উচিত। তারপর তারা সাভারকার সদনের দিকে যায়। নারায়ণ ডি আপ্তে তাকে নিচের তলার ঘরে অপেক্ষা করতে বলে। নাথুরাম ভি গডসে এবং নারায়ণ ডি আপ্তে দোতলায় যায় এবং পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছু পিছু আসে তাতিয়ারাও সাভারকার। তাতিয়ারাও সাভারকার নারায়ণ ডি আপ্তে ও নাথুরাম ভি গডসেকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'যশস্বী হৌন ইয়া' (সফল হও এবং ফিরে এস)।

সাভারকার সদন থেকে তাদের ফেরার পথে নারায়ণ ডি আপ্তে বলে, তাতিয়ারাও সাভারকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন 'তাতিয়ারাও ইয়ানি আসে ভবিষ্য কেলে আহে কি গান্ধীজীচি সম্ভার বর্ষে ভারালি— আতা আপালে কাম নিশ্চিতা হোনার ইয়াত কাহি সংশয় নাহি' (গান্ধীজীর শতক শেষ— তাদের কাজ সফলতার সঙ্গে শেষ হবে এতে কোনো সন্দেহই নেই)।

বিনায়ক ডি সাভারকারের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের মামলা রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং কেবলমাত্র রাজসাক্ষীর ভিত্তিতেই আনা হয়েছে বলে মনে হয়। বিনায়ক ডি সাভারকারের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর কথিত কাহিনীর যে অংশটুকু কুমারী শান্তাবাঈ বি. মোদক এবং আইতাপ্পা কে কোতিয়ালের সাক্ষ্যে সমর্থিত হয়েছে সেটুকুই সরকারী পক্ষের সান্ত্বনা।

নাথুরাম ভি. গডসে এবং নারায়ণ ডি. আপ্তে যে ১৪.১.১৯৪৮ সাভারকার সদনের সামনে নেমেছিল, কুমারী শান্তাবাঈ বি. মোদকের সাক্ষ্যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এই সাক্ষ্যে কোনোভাবেই এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, বিনায়ক ভি সাভারকারের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই নাথুরাম ভি গডসে এবং নারায়ণ ডি আপ্তে সাভারকার সদনের সামনে নেমেছিল। মামলার নথিবদ্ধ সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র বিনায়ক ডি. সাভারকারই নন, সাভারকার সদনে এ.এস.ভিদে এবং গজানন দামলেও থাকতেন। ১৭.১.১৯৪৮ নাথুরাম ভি গডসে, নারায়ণ ডি. আপ্তে এবং রাজসাক্ষী যে শিবাজী পার্কে নেমেছিল, আইতাপ্পা কে কোতিয়ানের দেওয়া সাক্ষ্যেও তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশ্য রাজসাক্ষী যে বলেছে, সে বিনায়ক ডি সাভারকারকে নাথুরাম ভি গডসে এবং নারায়ণ ডি আপ্তেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুনেছিল সে সম্পর্কিত রাজসাক্ষীর কাহিনীর সমর্থনে কোনো সাক্ষ্যই কার্যকর নয়। রাজসাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, শুধুমাত্র বিনায়ক ডি সাভারকারকে নাথুরাম ভি গডসে এবং নারায়ণ ডি আপ্তেকে উদ্দেশ্য করে 'যশস্বী হৌন ইয়া' বলতে শুনেছিল।

ঠিক তার আগে দোতলায় একদিকে নারায়ণ ডি আপ্তে আর নাথুরাম ভি গডসে, অন্যদিকে বিনায়ক ভি সাভারকার এদের পরস্পরের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল, মামলার নথিতে তার কিছুই দেখানো হয়নি। অতএব রাজসাক্ষীর উপস্থিতিতে নারায়ণ ডি আপ্তে এবং নাথুরাম ভি গডসেকে উদ্দেশ্য করে বিনায়ক ডি সাভারকারের কথা যে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার পরিকল্পনার

প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল এমন অনুমানের কোনো যুক্তি নেই। অতএব, বিনায়ক ডি সাভারকারের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর উপরোক্ত কাহিনীর ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 'বিপজ্জনক'।

সাভারকার নিন্দিত

প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের পরিস্থিতিতে বিচারকের বিশ্লেষণ বেশ ভালো। ব্যাজ-এর অসমর্থিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সাভারকারকে দোষী সাব্যস্ত করাকে তিনি 'বিপজ্জনক' মনে করেছেন, যদিও ব্যাজ-এক তিনি সত্যনিষ্ঠ সাক্ষী হিসেবেই দেখেছিলেন। অবশ্য তাঁর নিরীক্ষার পরবর্তী অধ্যায়ে, ঠিক সাত পাতা পরে, ব্যক্তিগত দোষাবহতা আলোচনা করতে গিয়ে, তিনি ব্যাজ-এর গৃহীত বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তার সাক্ষ্যে সাভারকারকে সারাক্ষণ দোষী বলা হলো, তবুও সাক্ষ্য প্রমাণ আইনের দৃষ্টিতে তাকে জেলে পাঠানোই 'বিপজ্জনক' হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত ঘটনাটা এরকমই দাঁড়াল। যদিও সাভারকারের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিচারক বললেন :

> বিনায়ক ডি সাভারকার তাঁর বয়ানে বলেন যে, এই 'ষড়যন্ত্রে' তাঁর কোনো হাত ছিল না আর যদি থাকেও তবে নারায়ণ ডি আপ্তে আর নাথুরাম ভি গডসের ওপর তাঁর এরকম কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বিনায়ক ডি সাভারকারের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের মামলা রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য এবং কেবল রাজসাক্ষীর ওপরেই নির্ভর করে ছিল। পূর্বে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিনায়ক ডি সাভারকারের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা 'বিপজ্জনক'। অতএব ২০.১.১৯৪৮ এবং ৩১.১.১৯৪৮ দিল্লিতে যা ঘটেছিল তাতে বিনায়ক ডি সাভারকারের হাত ছিল এমন অনুমানের কোনো যুক্তি নেই।

যাইহোক, এই মামলার বস্তুত পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে কোনো সিদ্ধান্ত টানা হয়নি।

শেষের যে বাক্যটি এখানে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটির প্রাসঙ্গিকতায় কোনো ভেজাল নেই। ব্যাজ-এর সাক্ষ্যপ্রমাণে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ২০শে জানুয়ারি এবং ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ 'দিল্লিতে যা ঘটেছিল তাতে' সাভারকারের বেশ ভালোই 'একটা হাত' ছিল। এর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার কোনো অভাব ছিল না, অভাব ছিল সমর্থনের। প্রাসঙ্গিকতাকে হিসেবের মধ্যে আনাই হয়নি। আর ব্যাজ-এর বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে বিচারকের নিজের সিদ্ধান্তেরই বিরোধিতা করা হয়েছে।

মোরারজী দেশাই যখন সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তখন যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। সরকারী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি, সি কে দপ্তরী বিচারক আত্মাচরণের কাছে আগের দিনে যে আবেদন করেছিলেন সেটি ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশিত হয়েছিল। সাভারকার সংক্রান্ত অংশটি পাঠ হলো এইরকম,

মাননীয় শ্রী মোরারজী দেশাই-এর জেরায় সাত নম্বর অভিযুক্তের (ভি ডি সাভারকার) কৌসুলি প্রশ্ন করেন, 'সাভারকারের প্রসঙ্গে কোনো ব্যবস্থা নেবার জন্য অধ্যাপক জৈনের বক্তব্যটি ছাড়া তাঁর বিষয়ে আপনার কি আর কোনো খবরাখবর জানা আছে?'

সাক্ষী এইভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় : 'আমি কি সমস্ত তথ্য জানাব? আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত। তাঁকে (সাভারকার) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' সাত নম্বর অভিযুক্তের কৌসুলি এরপর বলেন যে তিনি প্রশ্নটা বাদ দিচ্ছেন। সরকারী পক্ষ আবেদন জানায় যে, এই প্রশ্নোত্তর এবং কৌসুলির বক্তব্য নথিভুক্ত করা হোক। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি সেটি খারিজ করে দেন। এই প্রশ্ন, উত্তর এবং সাত নম্বর অভিযুক্তের কৌসুলির বক্তব্য নথিভুক্ত করা উচিত এই মর্মে আবেদন করা হলো।

সাভারকারের মৃত্যুর মাত্র এক-দু'বছর পরে তাঁর সহকারীরা কাপুর কমিশনের সামনে মুখ খুলেছিল এবং ব্যাজ-এর সাক্ষ্যের সপক্ষে প্রচুর সমর্থন উপস্থাপিত করেছিল। কমিশনের প্রতিবেদনে লেখা হয় :

ভি.ডি. সাভারকারের দেহরক্ষী আপ্পা রামচন্দ্র কাসারের যে বক্তব্য ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮ বোম্বে পুলিস নথিবদ্ধ করেছিল তাতে দেখা যায় যে এমনকী ১৯৪৬ সালেও আপ্তে এবং গডসে প্রায়শই সাভারকারের কাছে যেত এবং কার্কারেও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করত... ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে একটি সভার কাজে সাভারকার যখন পুনা যান তখন গডসে আর আপ্তে সারাক্ষণ সাভারকারের সঙ্গে থাকতো এবং তাঁর সঙ্গে হিন্দু মহাসভার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করতো। তিনি তাদের বলতেন যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। এবার তাদেরই সব কাজকর্ম চালাতে হবে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে ৫ কি ৬ তারিখে দিল্লিতে সর্বভারতীয় হিন্দু কনভেনশন ছিল এবং সাভারকার, গডসে আর আপ্তে একত্রে বিমানে সেখানে গিয়েছিলেন। কনভেনশনে কংগ্রেসের নীতির তীব্র সমালোচনা হয়। ১১ই আগস্ট সাভারকার, গডসে এবং আপ্তে সকলে একসঙ্গে বিমানে বোম্বে ফিরে আসেন... ১৩ কি ১৪ই জানুয়ারি বা ঐরকম সময় কার্কারে একজন পাঞ্জাবী যুবককে সঙ্গে নিয়ে সাভারকারের কাছে আসে এবং প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে সাভারকারের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা চলে। ১৫ কি ১৬ তারিখে বা ঐরকম সময় আপ্তে আর গডসে রাত সাড়ে নটায় সাভারকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এক সপ্তাহ বা ঐরকম কিছু দিন পরে, জানুয়ারির ২৩ কি ২৪ তারিখ নাগাদ আপ্তে আর গডসে আবার রাত দশটা কি সাড়ে দশটার সময় সাভারকারের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা যাবৎ কথা বলতে আসে...

সাভারকারের সচিব গজানন বিষ্ণু দামলে-কেও বোম্বে পুলিস ৪ঠা মার্চ ১৯৪৮ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। সে বলেছিল যে, 'অগ্রণী'-র এন ডি আপ্তেকে

সে গত চারবছর ধরে চেনে। আহমেদনগরে আপ্তে একটি রাইফেল ক্লাব শুরু করেছিল এবং যুদ্ধের সময় অবৈতনিক নিয়োগ অফিসার হয়েছিল। আপ্তে সাভারকারের বাড়িতে প্রায়ই আসতো এবং কখনো কখনো তার সঙ্গে গডসেও আসতো। অগ্রণীর জন্য যখন জামিনের দরকার পড়েছিল তখন আপ্তে আর গডসেকে সাভারকার কাগজের জন্য ১৫০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। কাগজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং হিন্দু রাষ্ট্র নামে একটি কাগজ বেরোনো শুরু হয়। তার পরিচালকবর্গের একজন ছিলেন সাভারকার আর আপ্তে ও গডসে ছিল এর কার্যনির্বাহী দালাল (Managing Agent)। ভি. আর. কার্কারেকে সে প্রায় তিনবছর ধরে চিনত। সে ছিল আহমেদনগরের হিন্দু মহাসভা কর্মী এবং কখনো সখনো সে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে আসতো। গত তিন বছর ধরে ব্যাজও ছিল তার পরিচিত। সে-ও সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে আসতো।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্কারে এবং একজন পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু বালক সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তারা দুজনেই আধঘন্টা কি ৪৫ মিনিট ধরে সাভারকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এদের কেউ-ই আর সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আপ্তে আর গডসে ১৯৪৮-এর জানুয়ারির প্রায় মাঝামাঝি একটু বেশি রাতে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করতে আসে। দুজন সাক্ষীর বক্তব্যেই দেখা যায় যে, আপ্তে ও গডসে উভয়েই সাভারকারের নিয়মিত দর্শনপ্রার্থীদের একজন ছিল এবং সম্মেলনে আর প্রতিটি সভায় তাদের সাভারকারের সঙ্গে দেখা যেত ... সাক্ষ্যে এটিও দেখা যাচ্ছে যে, কার্কারেও সাভারকারের বেশ পরিচিত ছিল এবং নিয়মিত অভ্যাগতদের একজন ছিল। ব্যাজও সাভারকারের কাছে আসতো। ড. পানচারও আসতেন তাঁর কাছে। এই সমস্ত ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই কোনো এক সময়ে বা অন্য সময়ে সাভারকার সদনে এসে জড়ো হচ্ছিল। এবং কখনো কখনো সাভারকারের সঙ্গে তাদের দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল। এটা তাৎপর্যের বিষয় যে, কার্কারে আর মদনলাল দিল্লি যাবার ঠিক আগে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং আপ্তে আর গডসে দুজনেই বোম ছোঁড়ার ঠিক আগে ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। প্রতিবারই তাদের বেশ দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছিল।

এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৬, ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮-এর বছরগুলোতে গডসে আর আপ্তে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনসভায় তাঁর সঙ্গে থাকতো।

আদালতে এগুলো যদি প্রমাণ করা যেত, তাহলে সাভারকার দোষী সাব্যস্ত হয়ে যেতেন। ১৪ই এবং ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখে গডসে এবং আপ্তের সাভারকারের

সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গকে ঘিরে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। সাভারকারের দেহরক্ষী এ আর. কাসার কাপুর কমিশনকে বলেছিল যে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর দিল্লি থেকে ফিরেই জানুয়ারির ২৩ কি ২৪ তারিখে তারা সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেছিল। সাভারকারের সচিব জি ভি দামলে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, গডসে আর আপ্তে সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেছিল 'জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে এবং তাঁর (সাভারকার) সঙ্গে তারা তাঁর বাগানে বসেছিল।'[২৯]

বিচারপতি কাপুরের রায়ের সমস্ত অংশটিও পরিষ্কার। নাগরওয়ালার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য তালিকাবদ্ধ করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, 'এই সমস্ত তথ্য একত্রিত করলে সাভারকার এবং তার দলবলই যে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এছাড়া অন্য কোনো তত্ত্ব নস্যাৎ হয়ে যায়।' নাগরওয়ালা অকৃতকার্য হয়েছিলেন কেননা, গান্ধিজীকে অপহরণ করা হবে এই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধারণার পিছনে ছুটেছিলেন তিনি।[৩০]

নাগরওয়ালা তাঁর অপরাধ সম্পর্কিত ১নং প্রতিবেদনে ব্যক্ত করেছেন যে, 'এই ষড়যন্ত্রের পেছনে সাভারকার ছিলেন এবং তিনি অসুস্থতার ভান করেছিলেন।'[৩১] হত্যার ঠিক পরের দিন নাগরওয়ালার ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ তারিখের চিঠিতে উল্লেখিত হয়েছে যে, কাসার এবং দামলে তাঁকে যা বলেছে তার সারবস্তু হলো, সাভারকার, গডসে এবং আপ্তে 'তাদের দিল্লি যাবার প্রাক্কালে' চল্লিশ মিনিটের মতো কথাবার্তা বলেছিল। 'কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই এই দুজনের সাভারকারের বাড়িতে যাতায়াত ছিল।'[৩২] সংক্ষেপে বলা যায়, ১৪ই-১৭ই জানুয়ারির সাক্ষাৎকারের পরে গডসে এবং আপ্তে ব্যাজ-এর অনুপস্থিতিতে আবার সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেছিল।

এবার আর এস এস-মহাসভা দুষ্টচক্রটির প্রসঙ্গ। মোরারজী দেশাই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তারা 'একত্রে কাজ করতো।'[৩৩] বিচারপতি কাপুর দেখেছিলেন যে, আর এস এস-এর অনেক সদস্য হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন।'[৩৪] তাঁর সিদ্ধান্তের একটি অর্থ এভাবে করা যায়, '(৪) (ক) আর এস এস ভারতে সবচেয়ে সুসংগঠিত জঙ্গী হিন্দু সংগঠন এবং যদিও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে এটি প্রকাশ্যে যুক্ত নয়, কিন্তু এর বিখ্যাত সংগঠক এবং কর্মীরা হিন্দু মহাসভার সদস্য কিংবা এর মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষক।'[৩৫]

কাপুর কমিশন গঠিত হয়েছিল কেন? যে কারণে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের হত্যাকাণ্ডে দুজন অভিযুক্তের রেহাই পাবার পরেই দ্রুত গঠিত হয়েছিল চন্দ্রচূড় কমিশন, ঠিক ঐ একই কারণে। গোপাল গডসে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৪ পুনায় তাঁকে সংবর্ধিত করার জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে, কেশরীর ভূতপূর্ব সম্পাদক জি ভি কেটকার দাবি করেন যে, নাথুরাম গডসে তাঁর সঙ্গে গান্ধীহত্যার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রায়শই খুঁটিনাটি আলোচনা করতো। ২০শে জানুয়ারির বোমা বিস্ফোরণের পরে ব্যাজ তাঁকে 'তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'-র কথা বলেছিল। লোকসভায় এবং সংবাদমাধ্যমে এ-নিয়ে কিরকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা অনুমান করাই যায় বা অন্য কারোর কারোর কাছে এই অপরাধের প্রাক্ সংবাদ ছিল কি না, এটি সরকারকে জানানো হয়েছিল কিনা, যদি হয়ে থাকে তবে কী পদক্ষেপ নেওয়া

হয়েছিল, বিস্তারিতভাবে এগুলি নিশ্চিত করতে ২২শে মার্চ, ১৯৬৫ একটি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। আইনী আদালতের হাতে পৌঁছোয়নি এবং বিচারপতি আত্মাচরণের সামনে উপস্থাপিত হয়নি এমন ভূরি ভূরি উপাদান কমিশনের কাছে এসে পৌঁছেছিল।

একটি অপরাধ সংক্রান্ত বিচারমামলা এবং একটি তদন্তকার্যের মধ্যে সুযোগের যা পার্থক্য বিচারপতি চন্দ্রচূড় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর প্রতিবেদনে সেটি বর্ণনা করেছেন।

> একটি সেশন মামলার চেয়ে একটি তদন্তের সুযোগ অনেক বেশি। কেন হত্যাটি সংগঠিত হয়েছিল এটা আমাকে নির্ধারণ করতেই হবে— সেশন আদালতের সামনে উপস্থাপিত প্রশ্নটি যেমন, উপস্থিত অভিযুক্তর ওপর সে আদৌ অপরাধী কিনা, তার তুলনায় এই প্রশ্নটির শাখাপ্রশাখা অনেক বেশি বিস্তৃত... আরো কোনো তদন্ত বাঞ্ছনীয় নয়। ঠিক সেই কারণেই অভিজ্ঞ বিচারপতি লক্ষ্য করেছেন যে 'অপরাধ সংক্রান্ত একটি মামলা সেই ঘটনার সত্যতা বিষয়ে কোনো তদন্ত বা তল্লাশি নয়।' অপরাধ সংক্রান্ত মামলা যা পারেনি আমার তদন্তের বিষয় সেটাই। আমি প্রকৃত সত্যের তল্লাশি চালাতে পারি।[৩৬]

বিচারক আত্মাচরণ যা দেখতে পাননি, বিচারক জীবন লাল কাপুর সেই 'আসল সত্যটি খুঁজে বের করেছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি পূর্ববর্তী সমস্ত অপরাধ— ১৯০৯-এ কার্জন উইলির হত্যা, ১৯০৯-এ জ্যাকসনের হত্যা, ১৯৩১-এ হটসনকে হত্যার প্রচেষ্টা এবং ১৯৪৮-এ গান্ধী হত্যা, এই সবগুলি অনাবৃত করেছিলেন। কলিনস এবং লাপিয়েরে লেখেন : 'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অবশ্যই সাভারকারকে একটা বিষয় শিখিয়েছিল। হত্যাকারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তিনি এত সতর্কভাবে গোপন করতেন যে, পুলিস কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা সাজাতে পারেনি।'[৩৭] 'একজন ধর্মান্ধ যার অদৃশ্য হাত অন্তত তিনটি হত্যাকাণ্ডের ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল' এইভাবে তাঁরা তাঁর চরিত্রকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।[৩৮]

১৯৪৮ সালে সাভারকার আইনের কবল থেকে রেহাই পান। ১৯৬৯ সালে বিচারপতি কাপুর বল্লভভাই প্যাটেলের ধারণাকে সমর্থন করেন। কারাবাস এবং ব্যক্তিগত ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সাভারকার গান্ধী হত্যা মামলার অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর দীর্ঘকালের আচরিত কৌশলে এই হত্যাকাণ্ডে তাঁর নিজস্ব ভূমিকা গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকী এবারেও হীন ক্ষমাভিক্ষার প্রস্তাব করা এবং অবমাননাকর মুচলেকা দেওয়াই তাঁর পছন্দ ছিল। আবারও, এই হলো তার সারা জীবনের দস্তুর। ১৯১১ সালে এর শুরু আর ১৯৫০ পর্যন্ত এইভাবে চলল।

৬. পরিণাম

গান্ধীহত্যার পরিণাম এখনো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে।

হিন্দুত্বের স্বার্থে ধর্মযুদ্ধের একটা অংশ হিসেবে সাভারকারের অনুগামীরা ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ সাল বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ করে দেয়। ব্যাপকঅর্থে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সঙ্গেই এই অপরাধ তুলনীয়। উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্ঘ পরিবারের কাছ থেকে নিন্দাসূচক একটা শব্দও নয়, কেবল দুঃখপ্রকাশ গোছের প্রায় নীরব অভিব্যক্তিই পাওয়া গেছে। হত্যার অল্প কিছুদিন পরে ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ নেহরু জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী মাহেরচাঁদ মহাজনকে লেখেন : 'আমি জানতে পারলাম যে সাভারকারের গ্রেপ্তারে জম্মুতে একদিনের হরতাল হয়েছে। জেনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। কেননা গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে এটি তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।'[১] সাভারকারের ভক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যখন সাভারকার এবং হিন্দু মহাসভার পক্ষে সওয়াল করার চেষ্টা করেন, তখন বল্লভভাই প্যাটেল ৬ই মে, ১৯৪৮ তাঁকে মনে করিয়ে দেন, সংগঠনটি যদিও সেভাবে এক্ষেত্রে যুক্ত নয়, 'কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি যে, এই দুঃখজনক ঘটনায় মহাসভার যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিল। দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন এসে পৌঁছেছে।'[২]

আর এস এস-এর দৃষ্টান্তে বর্তমান সময়ে ইতিহাসের যেরকম ভয়ানক পুনর্লিখন চলছে সে প্রসঙ্গে চতুর্দিকে বিস্তর আলোচনা চলছে। একটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র তার প্রতিবেদনে লিখছে :

> হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যখন-তখন মধ্যযুগে 'মুসলিম শাসকদের আক্রমণ'-এর তত্ত্বটি নিয়ে পড়েন। কিন্তু মোহনদাস কে গান্ধী, যাঁকে জাতির জনক হিসেবে মান্য করা হয়, তাঁর হত্যাকাণ্ডটি আরো অনেক বাদ পড়া বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নতুন ইতিহাস বই-এ এই ঘটনাটির কোনো উল্লেখই নেই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার কয়েকমাস পরে একজন উন্মত্ত উগ্র হিন্দু যার বিশ্বাস ছিল যে, গান্ধীজীর নীতিতে দেশের মুসলমানদের তোষণ করা হচ্ছে, তার হাতে গান্ধী নিহত হন। পরে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, আততায়ী একসময় একটি সামরিক কায়দার হিন্দু ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠনের সদস্য ছিল যার গর্ভেই আজকের শাসক দল বিজেপির জন্ম।[৩]

আজ আদবানি আর বাজপেয়ী সাভারকারকে জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য দেশকে আহ্বান জানাচ্ছেন। জেলা এবং সেশন বিচারকের সভাপতিত্বে তৈরি বিশেষ আদালতে সাভারকার শাস্তি এড়াতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, স্বাধীনতা পূর্বে জাতীয়তাবাদী দায়বদ্ধতার একটা অতীত পশ্চাদপট ছিল যাঁর, তাঁর হাতে সাভারকার শেষ প্রাপ্য পেয়েছিলেন। ছাড়া পাবার পর সাভারকার তাঁর নিজস্ব পথেই চরিত্রহীনতার অজস্র প্রদর্শন জারি করে চললেন যেগুলি ১৯৬৬ সালে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনে অসংখ্য চিহ্ন রেখে গেল। কিন্তু সাভারকারবাদ এখনো ফুলে-ফলে পল্লবিত। এর প্রচারে রয়েছেন ক্ষমতার উচ্চাসনে আসীন ব্যক্তিরা— প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী আদবানি। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এক জঘন্য ভঙ্গিমায় হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে এটাই খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গি। হিন্দুত্বের সমারোহ উদযাপনে, গুরুতর এক প্রতিক্রিয়াকে কেবলি উস্কানি দেয়া হচ্ছে।

১৯৫০ সালের মুচলেকা

জরুরী অবস্থার সময় আর এস এস-এর প্রধান এম ডি দেওয়ান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এস বি চ্যবন এবং বিনোবা ভাবের কাছে হীন তোবামুদে চিঠি লিখেছিলেন।[৪] এখানেও তিনি ভি ডি সাভারকারের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র পরম্পরা অনুসরণ করেছেন। তাঁর হীন প্রতিশ্রুতির সর্বশেষ নীচ কিস্তিটি একেবারে ১৯৫০-এ প্রস্তাবিত হয়। তাঁর 'বসওয়েল' ধনঞ্জয় কীর অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠায় এই অধ্যায়টির সবিশেষ বিবরণ দিয়েছেন।

সংখ্যালঘুদের প্রশ্নে নেহরু লিয়াকত চুক্তি কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটে। নিরাপত্তামূলক আটক আইন, ১৯৫০-এর আওতায় মহাসভার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাভারকারকে আটক করা হলো ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৫০ তারিখে। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৫০ তিনি জেল থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখলেন। কীর লিপিবদ্ধ করেন, 'কিন্তু এইবারে সরকার যেহেতু বিনাশর্তে মুক্তির কোনো অনুরোধ মঞ্জুর করতে রাজি ছিল না, তাই সাভারকার আবেদন জানান যে সরকার যতদিনের জন্য স্থির করবেন ততদিন তিনি কোনোভাবেই বর্তমান রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন না এই শর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক... সাভারকার আরো জানান, সকলেই এখন এটা জানে যে, ইতিমধ্যেই তিনি খুবই শীঘ্র রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অবসর নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।'[৫]

বোম্বের সরকার সাভারকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর পুত্র বিশ্বাস বোম্বের হাইকোর্টে একটি হেবিয়াস কার্পাসের আবেদন পেশ করে। এই আবেদন যখন প্রধান বিচারপতি এম সি চাগলা এবং বিচারপতি পি বি গজেন্দ্র গদকারের সামনে শুনানীর জন্য উপস্থিত হয়, তখন অ্যাডভাকেট জেনারেল সি কে দপ্তরী সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ আনার জন্য এক দিন সময় চান। ১৩ই জুলাই তিনি আদালতকে জানান,

তাঁকে একথা বলবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, সাভারকার যদি এমন কোনো

মুচলেকা দেন যে তিনি কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবেন না এবং বোম্বেতে নিজের বাড়িতেই থাকবেন, তাহলে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে রাজি। সাভারকারের পক্ষে কে এন ধারাপ একটি মুচলেকা দেন যে, সাভারকার আর কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, সে যাই হোক না কেন, তাতে অংশগ্রহণ করবেন না এবং বোম্বেতে তাঁর বাড়িতেই থাকবেন। এর ভিত্তিতে মহামান্য হজুর ১৩ই জুলাই, মুক্তির আদেশ জারি করেন। এই মেয়াদ ছিল এক বছর অথবা ভারতের সাধারণ নির্বাচন অথবা ভারত যদি কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, এদের মধ্যে যে ঘটনাটি আগে ঘটবে সেটি পর্যন্ত।

২০শে জুলাই, ১৯৫০ সাভারকার বললেন যে, 'আমার ওপর সরকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে... একটি নির্দিষ্ট সময়কাল অবধি আমার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়ায় অবশ্যম্ভাবী কারণে আমি এমনকী হিন্দু মহাসভার সাধারণ সদস্যপদ থেকেও পদত্যাগ করছি।'

মুক্তি পাবার পর সাভারকার আর এস এস-এর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। আর এস এস প্রধান এম এস গোলওয়ালকরকে ১৫ই জুলাই, ১৯৪৯ তিনি তারবার্তা পাঠান : 'আপনার মুক্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন। হিন্দুরাজের নির্ভীক বীর হিসেবে আর এস এস দীর্ঘজীবী হোক।'[৮] সাভারকারের শুভেচ্ছা সত্য হয়েছে। আর এস এস দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে— একটু বেশি দীর্ঘ, অনেকের এরকম মনে হচ্ছে। অপরদিকে হিন্দু মহাসভা অতি দ্রুত তলিয়ে গেল। ভগ্ন হৃদয়ে সাভারকার মারা গেলেন। সাভারকারের পক্ষে সামান্য সান্ত্বনার প্রলেপ ছিল যে, তার ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে আর এস এস প্রধান এম এস গোলওয়ালকর তার ১৫ই মে, ১৯৬৩ তারিখের বক্তৃতায় চল্লিশ বছর আগে লিখিত হিন্দুত্ব-এর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেন।[৯] তিনি জানতেন যে, দীর্ঘদিন হলো তাঁর খেলোয়াড়ী জীবন শেষ হয়ে গেছে। অনেক আগেই স্রোতের অভিমুখ তাঁর বিরুদ্ধে ঘুরে গিয়েছিল। বস্তুত বিশের দশকে পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার যে আশা নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন, তার সবটুকুই বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছিল। ভারত তখন ইতিমধ্যেই আরেকজন প্রার্থীর হাতে তার হৃদয় মন সঁপে দিয়েছে— তিনি গান্ধী। তাই এই মানুষটার প্রতি সাভারকারের এত তিক্ততা। ব্যক্তিত্বের এই অবহেলিত দিকটি রবার্ট পেইন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অনুভবে লিপিবদ্ধ করেছেন : 'মৃত্যুর আগে তিনি জেনেছিলেন যে তিনি হলেন এমনই এক মানুষ যে সারা জীবনভোর মঞ্চের কেন্দ্রীয় চরিত্র দখলের ডাক পাবার প্রতীক্ষায় রইল, কিন্তু সে ডাক কোনোদিন এল না।'[১০]

গডসে এবং আর এস এস

গান্ধী হত্যার পর সাভারকার আর এস এস-এর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসের সম্পর্কে কী বলা যায়? আর এস এস-এর সঙ্গে তার যোগসূত্রটি কী? এ প্রশ্নে আদবানি যা বলতে বাধ্য হলেন সেটা হলো : 'নাথুরাম গডসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের কড়া সমালোচক ছিলেন। আর এস এস-এর বিরুদ্ধে তাঁর

অভিযোগ ছিল যে এরা হিন্দুদের নির্বীর্য করে দিয়েছে। গডসের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কংগ্রেস যখনই আর কোনো কিছুই পায় না তখন আমাদের বিরুদ্ধে নতুন করে এই অভিযোগ তোলে। এটা ওদের অভ্যেস।'[১১]

এর বিরোধিতা করে নাথুরাম গডসের ভাই গোপাল গডসে একটি বিধ্বংসী সাক্ষাৎকারে এই অস্বীকৃতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

প্র: আপনি কি আর এস এস-এর একটা অংশ ছিলেন?

উ: আমরা সব ভায়েরাই আর এস এস-এ ছিলাম। নাথুরাম, দত্তাত্রেয়, আমি আর গোবিন্দ। নিজেদের বাড়িতে বেড়ে ওঠার চেয়ে বরং আমরা আর এস এস-এর মধ্যেই বেড়ে উঠেছি বলতে পারেন। আমাদের কাছে এটা একটা পরিবারের মতো ছিল।

প্র: নাথুরাম আর এস এস-এ ছিলেন? তিনি ওদের ছেড়ে যাননি?

উ: নাথুরাম আর এস এস-এ একজন বৌদ্ধিক কারিয়াভাহ্ (বৌদ্ধিক কর্মী) হয়েছিলেন। তাঁর বয়ানে তিনি বলেছেন যে তিনি আর এস এস ছেড়ে চলে এসেছিলেন। একথা তিনি বলেছিলেন কেননা গান্ধীহত্যার পর গোলওয়ালকর এবং আর এস এস খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু তিনি আর এস এস ছাড়েননি।

প্র: সম্প্রতি আদবানি বলেছেন যে নাথুরামের সঙ্গে আর এস এস-এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

উ: আমি এ কথার বিরোধিতা করছি। এরকম কথা বলা কাপুরুষতা। আপনি বলতে পারেন, আর এস এস তো এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, 'যাও, গান্ধীকে হত্যা কর।' কিন্তু আপনি তাঁকে (নাথুরাম) অস্বীকার করতে পারেন না। হিন্দু মহাসভা কখনো তাঁকে অস্বীকার করেনি। ১৯৪৪ সালে নাথুরাম যখন আর এস এস-এ বৌদ্ধিক কারিয়াভাহ্ হয়েছেন তখনি তিনি হিন্দু মহাসভার কাজ করতে শুরু করেন।[১২]

সঙ্ঘ পরিবার কখনই তার অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের কথা মানুষকে ভুলিয়ে দিতে পারবে না। হিংসা কিংবা নিপীড়নের সপক্ষে সাভারকারের যে ওকালিতি তার থেকে তাঁর হিন্দুত্বকে আলাদা করা যায় না। গডসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে এমনই এক ভ্রাতৃহত্যার চিহ্ন বিদ্যমান, যেটি সাভারকারবাদকে চিরকাল ব্যক্তিগতভাবে বয়ে বেড়াতে হবে।

এই যে বিজেপি-র কথায় এবং কাজে সাভারকারকে ফিরিয়ে আনার অধ্যবসায়ী চর্চা তা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় রাজনীতিকে হিন্দুত্বের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার জন্য সর্বাত্মকভাবে নির্ধারিত পাশার দান ফেলা হচ্ছে। এটা কখনোই ঘটবে না। দেশের হৃদয়টি কোথায় রয়েছে তা ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিভাত।

পরিশিষ্ট

সাভারকারের ক্ষমাভিক্ষা এবং সরকারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, ১৯১১-১৯৫০

পরিশিষ্ট ১ : ১৯১১, ১৯১৩

১৯১১ সালের জুন মাসে সাভারকার আন্দামানে এসে পৌঁছোন। বছর ঘোরবার আগেই তিনি ভারত সরকারের কাছে একটি 'ক্ষমাভিক্ষার আবেদন' জমা দেন। আবেদনপত্রটির বিষয়টি অবশ্য পাওয়া যায়নি। সাভারকার তাঁর পাঠানো ১৪ই নভেম্বর, ১৯১৩ সালের পরবর্তী আবেদনপত্রে এই প্রথম আবেদনটি উল্লেখ করেন। চিঠির বৃহদাংশে জেলের মধ্যেকার সুবিধার কথা এবং একটি ভারতীয় জেলে স্থানান্তরিত করার অনুরোধ— কেননা সেখানে আমি (ক) ক্ষমা পেয়ে যাব; (খ) আমার বাড়ির লোকেরা দেখা করতে পারবে...'

আবেদনপত্রের শেষ এবং প্রকাশিত অনুচ্ছেদটি নিচে দেওয়া হলো :

> পরিশেষে ক্ষমাভিক্ষার আবেদনটি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে পাঠ করার সময় মহামান্য হুজুরকে আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি কি যে অনুমোদনের জন্য এটিকে ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে হবে? ভারতীয় রাজনীতির বর্তমান অগ্রগতি এবং সরকারের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি আরো একবার সংবিধানিক পথটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ১৯০৬-১৯০৭ সালের ভারতবর্ষের উত্তেজক এবং আশাহীন পরিস্থিতিতে যেভাবে শান্তি অগ্রগতির পথ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, আজ সেইরকম কন্টকময় পথে ভারতবর্ষ ও মানবতার কল্যাণকামী কোনো মানুষ অন্ধের মতো পা ফেলবে না। কাজেই সরকার যদি তাঁদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকবো। যতদিন আমরা জেলে থাকবো, ততদিন ভারতে মহামান্য হুজুরের শতসহস্র অনুগত প্রজার গৃহে প্রকৃত সুখ আর আনন্দ থাকতে পারে না, রক্ত জলের চেয়েও সান্দ্র। কিন্তু আমরা যদি মুক্তি পাই তাহলে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দধ্বনি তুলবে, এই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে— যে সরকার কেমন করে প্রতিহিংসা নিতে হয় এবং শাস্তি দিতে হয় এ কথার চেয়ে কেমন করে ক্ষমা করতে হয়, সংশোধন করতে হয় এ কথা আরো বেশি ভালো করে জানে। উপরন্তু দেশে ও বিদেশে অনেক বিপথগামী যুবক, যারা

একসময় পথপ্রদর্শক হিসেবে আমার দিকেই তাকিয়ে থাকতো, আমার সাংবিধানিক পথে ফিরে-আসা তাদের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনবে। সরকার আমাকে যত কাজ করতে বলবে সেইমতোই প্রায় সব করতে আমি প্রস্তুত। কেননা আমার আজকের পরিবর্তন যেহেতু বিবেকের দ্বারা পরিচালিত, তাই আমার ভবিষ্যৎ-এর আচরণও সেরকমই হবে। অন্যভাবে যা পাওয়া যেতে পারে সে তুলনায় আমাকে জেলে আটকে রাখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। শক্তিশালীর পক্ষেই একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া সম্ভব। কাজেই অনুতপ্ত সন্তান পিতৃতুল্য সরকারের দরজায় ছাড়া আর কোথায় ফিরে যাবে? মহামান্য হুজুর অনুগ্রহ করে বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন এই আশা রইল।

পরিশিষ্ট ২ : ১৯২৪, ১৯২৫

ফ্রন্টলাইন-এ প্রকাশিত দলিল, ৭ই এপ্রিল, ১৯৯৫
বোম্বের তথ্য দপ্তরের আধিকারিকের সৌজন্যে পৃ. ২/৫-১-২৪
বোম্বে সরকার বিনায়ক দামোদর সাভারকারের মুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দপ্তর নিম্নলিখিত সরকারী সিদ্ধান্ত জারি করেছেন।

১) Criminal Procedure, ১৮৯৮-এর Code-এর ৪০১নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কাউন্সিলের রাজ্যপাল এখানে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞার অনতিবাহিত অংশটি শর্তসাপেক্ষে মকুব করে দিলেন।

২) 'আসামীর শর্তসাপেক্ষ মুক্তির আদেশ ইয়েরাভাডা কেন্দ্রীয় জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর কাছে অবশ্যই পাঠানো হবে। তিনি আসামীর কাছ থেকে আদেশে নির্দিষ্ট করে দেওয়া শর্তগুলো গ্রহণ করার জন্য একটা মুক্তিপত্র দেবেন। এবং জেলের ইনসপেক্টর জেনারেলের মাধ্যমে এটি সরকারের কাছে পাঠানো হবে, তার সঙ্গে থাকবে যে আদেশের অনুবর্তিতায় আসামীকে মুক্তি দেওয়া হলো সেই সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন।'

এই মুক্তির সঙ্গে যুক্ত শর্তগুলি দিল এরকম :

> (১) যে, উল্লেখিত বিনায়ক দামোদর সাভারকার, বোম্বের কাউন্সিল রাজ্যপালের শাসনাধীন এলাকার মধ্যে ঐ উল্লেখিত এলাকার রত্নগিরি জেলার মধ্যে বাস করবেন এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া কিংবা বিশেষ জরুরী মামলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া এই জেলার সীমানার বাইরে যাবে না।
>
> (২) যে পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে সর্বসমক্ষে এবং গোপনে কোনোরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপে সরকারের অনুমতি ছাড়া তিনি যুক্ত হবেন না, উল্লেখিত সময়সীমা পার হবার পর এই বিধিনিষেধ সরকার কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হবে।

সাভারকার আগেই এইসব শর্ত স্বীকার করে নেবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনিও ভেবেছিলেন, এটা তাঁকে বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁর বয়ানটি তাঁর মুক্তির বিষয়ে কোনো বিশেষ সুবিধা দেবে না। তিনি নিম্নলিখিত বয়ানটি জমা দিয়েছিলেন :

আমি এই মর্মে স্বীকার করছি যে, আমার বিচার ছিল সঠিক এবং শাস্তিও ছিল যথাযথ। আমি অতীতে যে হিংসার পথ গ্রহণ করেছিলাম, সেটি আন্তরিকভাবে ঘৃণায় পরিহার করছি এবং সর্বশক্তিতে আইন এবং সংবিধানকে সমর্থন করার কর্তব্যের দায়বদ্ধতা আমি অনুভব করছি এবং ভবিষ্যৎ-এ আমাকে যতদূর অনুমতি দেওয়া হবে ততদূর পর্যন্ত সংস্কারকে সফল করে তুলতে আমি ইচ্ছুক।'

মূল চিঠি

সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর উদ্দেশে

* * *

শিরগাঁও, ৯ই মে, ১৯২৫

সমীপে,

ডি. ও'ফ্লাইন এস্কোয়ার

কার্যরত উপ সচিব

বোম্বে সরকার, স্বরাষ্ট্রদপ্তর

মহাশয়,

গতকাল কোহটের দাঙ্গা প্রসঙ্গে 'মারাঠা'-য় লেখা আমার নিবন্ধটি সম্পর্কে আপনার ৬ই মে তারিখের চিঠি পেয়েছি।

যে শর্তে আমি আবদ্ধ এই চিঠি আমাকে তারই কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার কাছে এর অর্থ— জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব সাম্প্রতিক নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জড়িয়ে আছে, সরকারের সেরকম কোনো কার্যকলাপের প্রসঙ্গে কোনো বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন উঠে তবে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা বা চর্চা থেকে বিরত থাকা। এই ব্যাখ্যার আলোতেই আমি সৎভাবে আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই আদেশ শর্তটিকে আরো সংকীর্ণ অর্থে উপলব্ধি করতে আমাকে বাধ্য করেছে।

এখন এই নতুন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কাছে আমার অবস্থানের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করার সময়, অত্যন্ত বিনীতভাবে আমি অনুরোধ করছি যে, এই আদেশ আমার হাতে যেহেতু এসে পৌঁছেছে ৮ই মে, তাই ঐ তারিখের আগে লেখা আমার সমস্ত নিবন্ধ এবং সমস্ত বক্তৃতা স্বাভাবিকভাবে আমি মুক্তির শর্তের অর্থবিষয়ে যে প্রথম এবং প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করেছিলাম তারই দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অতএব, সেগুলি এই বিশ্লেষণের আওতায় আনা উচিত নয়। অবশ্য আপনার চিঠি পাবার তারিখের পরবর্তী সময় থেকেই আমার সমস্ত কার্যকলাপ আপনার এই ব্যাখ্যার আওতায় বিবেচিত হবে।

অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি

মহাশয়

আপনার অত্যন্ত অনুগত হিসেবে

স্বাক্ষর : ভি ডি সাভারকার

মূল রচনা

* * *

৭ এপ্রিল ১৯৯৫ তারিখে 'ফ্রন্টলাইন'-এর একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ :

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট শহরে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক গোলমাল দেখা দেয়। মহামানব মহম্মদকে অত্যন্ত খারাপভাবে চিত্রিত করে কোহাটের জীবন দাস 'রঙ্গিলা রসুল' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন। ফলে কোহাটে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্য শহরে এবং তদানীন্তন পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্তে এরই কারণে দাঙ্গা বেঁধে যায়। সারা দেশ জুড়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ায় সাভারকার অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করেন এবং ১লা মার্চ, ১৯২৫ পুনার 'মারাঠা'-তে তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন।

সরকার এটিকে খুব সদয়চিত্তে গ্রহণ করেনি। তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, এই জাতীয় কোনো ভবিষ্যৎ রচনা সরকারের কাছে তাঁর মুক্তির প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করার যৌক্তিক কারণ হিসেবে গণ্য হবে। কোহাটের ঘটনা সম্পর্কে সাভারকারের খুব কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও এরপর তড়িঘড়ি করে সাভারকার একটি দীর্ঘায়িত কৈফিয়ত পাঠান যার শেষে তাঁকে নিজেকে ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ দেবার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতেও সরকার তাঁর বিষয়ে এরকম সদয় ব্যবহার করবে। ৬ই এপ্রিলের এই চিঠিতে তিনি বেশ পরিষ্কার করে বলে দেন যে, 'স্বরাজ'-এর ধারণা-র সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ নেই। 'একমাত্র যে স্থানে স্বরাজ শব্দটি এসেছে সেটি হলো তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে এবং সেখানে এটি সুনিশ্চিত যে, আমি কিংবা অন্যেরা স্বরাজ সম্বন্ধে কী ভাবি তার জন্য নয় বরং শ্রীযুক্ত গান্ধী কীরকম অতিরঞ্জিত অর্থে খিলাফতকে দেখেন সেটি দেখাতে বা তার আভাস দিতেই এটি উল্লেখিত হয়েছে।'

এতে সরকার একটুও শান্ত হয়নি। ৬ই মে, ১৯২৫ তাঁকে সংক্ষিপ্ত অশিষ্ট বয়ানে বলা হলো যে, সরকারের কাছে তাঁর ব্যাখ্যা আদৌ সন্তোষজনক বলে গণ্য হয়নি : ... আপনার কাছে এটি খুব সুনিশ্চিত হবার কথা যে, 'মারাঠা'-র ১ মার্চ, ১৯২৫ সংখ্যায় আপনি যে নিবন্ধটি প্রকাশ করেছেন, আপন প্রকৃতিতেই সেটি আবেগকে প্রজ্বলিত করতে এবং হিন্দু এবং মহম্মদীয়দের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে বাধ্য। সরকারের অনুমতি না নিয়ে কোনোভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত না হবার যে মুচলেকা আপনি দিয়েছিলেন, এটি তার বিরোধী।'

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মারফত ৮ঠা মে সাভারকার এই চিঠি পান। এতে তিনি এতই বিচলিত হয়ে পড়েন যে ঠিক তার পরের দিনই বোম্বে সরকারের স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কার্যনির্বাহী উপ-সচিব ডি ও ফ্লাইনকে উত্তরে এইভাবে লেখেন: ... অত্যন্ত বিনীতভাবে আমি অনুরোধ করছি যে, এই আদেশ যেহেতু আমার হাতে ৮ই মে এসে পৌঁছেছে, তাই ঐ তারিখের আগে লেখা আমার সমস্ত রচনা এবং আমার সমস্ত ভাষণ স্বাভাবিকভাবে মুক্তির শর্তের অর্থ বিষয়ে যে প্রথম এবং প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা আমি করেছিলাম তারই দ্বারা

পরিচালিত হয়েছে। কাজেই সেগুলি এই বিশ্লেষণের আওতায় আসা উচিত নয়।'

সাভারকার ভয় পেয়েছিলেন যে, মার্চ থেকে মে মাসের ৮ তারিখের মধ্যে তাঁর কিছু লেখা ও ভাষণের জন্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের পক্ষথেকে একটা হুমকি এল, অমনি হিন্দুদের তথাকথিত মঙ্গলের জন্য তাঁর মাথাব্যথা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরিশিষ্ট ৩ : ১৯৪৮

আর্থার রোড কারাগার

বোম্বে,

সমীপে

পুলিস কমিশনার তারিখ-২২/২/১৯৪৮

বোম্বে

মহাশয়,

আপনার ১৯৪৮-এর বিজ্ঞপ্তি নং ১২০২ গতকাল আমার হাতে এসেছে।

(১) এই অভিযোগ সম্পর্কে আমার স্বীকারোক্তি হলো যে, আমি কখনও মহম্মদ অনুসারী হবার কারণে মহম্মদীয়দের বিরুদ্ধে কোনো হিংসাত্মক আচরণ করার জন্য বা তাদের ঘৃণা করার জন্য হিন্দুদের উত্তেজিত করিনি বা কখনো ঘৃণা ছড়াইনি। আবার সমগ্র জীবনে আমি প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একজন প্রচারক ছিলাম। আমি সবসময় জোরালো ভাষায় বলেছি যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য অর্জন করেছে এমন প্রতিটি নাগরিককে সহ-নাগরিকের মতো অবশ্যই ভালোবাসতে হবে এবং জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে, হিন্দু না মহম্মদীয় না পার্শী না ইহুদী এরকম সামান্যতম ভেদাভেদ না করে সমান অধিকার এবং তাদের প্রতি রাষ্ট্রের সমান দায়ভার স্বীকার করতে হবে। 'একটি মানুষ একটি ভোট' এবং 'কেবলমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই কাজ' গত পঞ্চাশ বছর, আমার সমস্ত রাজনৈতিক জীবন জুড়ে আমার সমস্ত ভাষণে, আমার সমস্ত রচনায় এই দুই নীতির অক্লান্ত পৌনপুনিকতাই দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু এটা স্বীকৃত সত্য যে, আত্মরক্ষার যুক্তির আদর্শে নিজেদের রক্ষা করার জন্য হিন্দুদের আমি উপদেশ দিয়ে গেছি। আমার বিশ্বাস একেই সমস্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হবার জন্য হিন্দুদের উত্তেজিত করা হিসেবে ভুলব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি নিবেদন করছি যে, এই ব্যাখ্যা ভুল এবং অবাঞ্ছিত। সর্দার প্যাটেল নিজেও কিছু মুসলিম নেতার প্ররোচনামূলক ভাষণের প্রত্যুত্তরে কড়া ভাষায় বলেছিলেন 'তলোয়ারের জবাব তলোয়ারেই দিতে হবে।' কিন্তু নিশ্চিতভাবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি সমস্ত মুসলিমদের ঘৃণা করেন কিংবা হিংসায় উস্কানি দেন।

(২) এই তথ্যের সমর্থনে, আমার গ্রেপ্তারের ঠিক আগে সবচেয়ে সাম্প্রতিক জারি করা এবং টাইমস-এ প্রকাশিত বক্তব্য যার একটি স্থানে গণক্রোধে সংগঠিত এই ভ্রাতৃঘাতী অপরাধ, মহাত্মা গান্ধীর হত্যায় এই ভয়ানক অপরাধকে প্রকাশ্যে নিন্দা করার পর, আমি

প্রতিটি দেশপ্রেমী নাগরিককে এই কথা মনে রাখতে মিনতি করেছি যে, একটি সফল জাতীয় বিপ্লব এবং সদ্যোজাত জাতীয় রাষ্ট্রের ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের মতো সাংঘাতিক শত্রু আর নেই, বিশেষত সে দেশ যখন বাইরে থেকে প্রতিবেশী শত্রুতায় পরিবেষ্টিত তখন।

(৩) পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এখন আমার ৬৫ বছরের মতো বয়স। গত তিনবছর ধরে হৃদযন্ত্রের বিপাকে এবং দুর্বলতার কারণে প্রায়শই শয্যাশায়ী হয়ে গৃহবন্দী থেকেছি। আগস্টের গত ১৫ তারিখ আমার কিছু অনুগামী বিরত হওয়া সত্ত্বেও আমার বাড়িতে আমি জাতীয় পতাকা তুলেছি।

ফলত, সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাতে এবং উপরোক্ত সহৃদয় উপস্থাপনার সহায়তা করতে সরকারকে এই মর্মে মুচলেকা দেবার আগ্রহ প্রকাশে আমি ইচ্ছুক যে, আমাকে যদি শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয় তবে সরকারের প্রয়োজনমতো যেকোনো সময়কাল যাবৎ কোনো সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক প্রকাশ্য কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা থেকে আমি বিরত থাকবো।

সাক্ষর : ভি ডি সাভারকার

সাভারকারের ১৯৫০ সালের মুচলেকার জন্য ৬নং অধ্যায় 'পরিণতি' দ্রষ্টব্য।

টীকা

১. কিংবদন্তী এবং মানুষটি

১) আগাগোড়া বাঁকা হরফে ছাপা, বিশ্বেশ্বর মিশ্র, দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৫ই মে, ২০০২

২) দি স্টেটসম্যান, ৫ই মে, ২০০২

৩) শেখর আয়ার, দি হিন্দুস্তান টাইমস, ৫ই মে, ২০০২

৪) ভারত দপ্তর (Indian office), MSS EMF ১২৫/৮ ১৯৩৯ ভারতবর্ষের জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রসচিবকে লেখা চিঠিপত্র, মার্সিয়া কাসোলারির 'হিন্দুত্ব'স ফরেন টাই-আপ ইন দি ১৯৩০ আর্কাইভাল এভিডেন্স', নামক সুবিদিত নিবন্ধে উদ্ধৃত, ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২২শে জানুয়ারি, ২০০০, পৃষ্ঠা-২২৬। এই তথ্য বহুল দলিল উদঘাতিক করে 'মুসোলিনি সহ ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রতিনিধিকুল এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা; এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অস্তিত্ব। ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে এবং চর্চায় একটা বিমূর্ত স্বার্থের চেয়েও হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনে আরো বেশি কিছু ছিল।'

৫) হিন্দুস্তান টাইমস, ৫ই মে, ২০০২

৬) নিচের পঞ্চম অধ্যায়ে গান্ধী-হত্যা এবং এতে সাভারকারের লিপ্ত থাকার বিষয়ে অনেক বেশি নাড়াচাড়া করা হয়েছে।

৭) রুদ্রাংশু মুখার্জী (সম্পাদিত) দি পেঙ্গুইন গান্ধী রিডার, পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৭

৮) গণ-পরিষদে বিতর্ক, ৪র্থ খণ্ড , পৃ, ৭৩৭-৬২

৯) এস. এস. সাভারকার এবং জি. এম. যোশী (সম্পাদিত) হিস্টোরিক স্টেটমেন্টস বাই সাভারকার, পপুলার প্রকাশন, মুম্বাই, ১৯৬৭, পৃ. ২০৫-০৬

১০) দি স্টেটসম্যান, ৫ই মে

১১) দি অর্গানাইজার, ২রা জুন, ১৯৯১ হিন্দু মহাসভার মঞ্চ থেকে

১২) সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন, ভি. ডি. সাভারকার, এল জি খারের দেওয়া সভাপতির ভাষণগুলির সংগ্রহ, মুম্বাই ১৯৪৯ দ্রষ্টব্য। এখানে পরবর্তী অংশে HRD হিসেবে উদ্ধৃত।

১৩) এ. জি নুরানীর দি আর এস এস এ্যান্ড দি বিজেপি : এ ডিভিশন অফ লেবার, লেফটওয়ার্ড বুকস। নিউ দিল্লি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১ পৃষ্ঠা নং ৬২ দ্রষ্টব্য। ১৯৮০ সালের 'গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র' থেকে ১৯৯০ সালে বিজেপি-র 'হিন্দুত্ব'-এ স্থানান্তরণের একটি পর্যালোচনার জন্য ৫৯—৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪) ডেবোনেয়ার, আগস্ট, ১৯৮০

১৫) দি হিন্দু, ১৬ই আগস্ট, ২০০২

১৬) দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮১

১৭) বিজেপি-র কেউ আর সহ-সভাপতির মন্তব্যকে অস্বীকার করেনি এটা বেশ চিত্তাকর্ষক এবং সত্য-উদঘাটনী

১৮) সম্পাদকীয়, অর্গানাইজার, ১১ই জানুয়ারি, ১৯৭০। তখন অর্গানাইজার সম্পাদনা করতেন কে আর মালকানি, যিনি পরবর্তীকালে বিজেপির সহসভাপতি হয়েছিলেন।

১৯) নুরানী, দি অরএসএস এ্যান্ড দি বিজেপি, পৃ. ৫১

২০) দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৮ই মে, ১৯৯১

২১) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২১শে মে, ১৯৯১

২২) সানডে অবজার্ভার, ২রা জুন, ১৯৯১

২৩) সম্পাদকীয়, দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২১শে মে, ১৯৯১

২৪) দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৯

২৫) দি স্টেটসম্যান, ১১ই আগষ্ট, ২০০২

২৬) ধনঞ্জয় কীর, বীর সাভারকার পপুলার প্রকাশন, বোম্বে, ১৯৬৬। ১৯৫০ সালে এর প্রথম সংস্করণটি সাভারকার এ্যান্ড হিজ টাইমস নামে প্রকাশিত।

২৭) কীর, বীর সাভারকার, পৃষ্ঠা ৪

২৮) রবার্ট পেইন, ডি লাইফ এ্যান্ড ডেথ অফ মহাত্মা গান্ধী, দি বডলি হেড, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা নং ২০৬-০৭

২৯) টেরোরিজম ইন ইন্ডিয়া, ১৯১৭-১৯৩৬, গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেস, সিমলা, ১৯৩৭, পৃষ্ঠা নং ১১৮

৩০) এম আর জয়কর, দি স্টোরি অফ মাই লাইফ, এশিয়া পাব্লিশিং হাউস, ১৯৫৮, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৩

৩১) কীর, বীর সাভারকার, পৃষ্ঠা নং ৪৯

৩২) পেইন, লাইফ এ্যান্ড ডেথ অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃষ্ঠা ৬১৭-১৮

৩৩) ঐ, পৃষ্ঠা ২০৪

৩৪) কীর, বীর সাভারকার, পৃষ্ঠা ৫২

৩৫) জয়কর, দি স্টোরি অফ মাই লাইফ, পৃষ্ঠা নং ১১৬

৩৬) স্বতন্ত্রীয় বীর সাভারকার, এ গাইড টু দি ইন্ডিয়ান রেভোলিউশনারী মুভমেন্ট। এই গ্রন্থে রয়েছে দি ইন্ডিয়ান ওয়্যার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ১৮৫৭, ডেডিকেশন টু দি মার্টায়ারস অফ ১৮৫৭ এবং লেটারস ফ্রম আন্দামানস সমগ্র সাভারকার ... পঞ্চম খণ্ড, মহারাষ্ট্র, প্রান্তিক হিন্দু সভা , পুনে, ১৯৬৩ এখানে একটি SSW নামে দ্রষ্টব্য।

৩৭) পরের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই রচনার বিশদ সমালোচনা করবো।

৩৮) কীর, বীর সাভারকার, পৃষ্ঠা নং ৭৪

৩৯) ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫-৮৭

৪০) পি বি ভাচ্চা, ফেমাস জাজেস, ল'ইয়ারস এ্যান্ড কেসেস অফ বোম্বে: এ জুডিশিয়াল হিস্ট্রি অফ বোম্বে ডুরিং দি ব্রিটিশ পিরিয়ড, এন. এম. ত্রিপাঠী, বোম্বে ১৯৬২, পৃষ্ঠা ২৯২-৯৫

৪১) আর সি মজুমদার, পেনাল সেটলমেন্টস ইন আন্দামানস, গেজেটীয়ার্স ইউনিট, সংস্কৃতি দপ্তর, শিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ২১১-১৩

৪২) কীর, বীর সাভারকার, পৃ. ১৪৯

৪৩) কৃষ্ণান দুবে এবং ভেঙ্কটেশ রামকৃষ্ণান, 'ফার ফ্রম হিরোইজম, দি টেল অফ 'বীর সাভারকার', ফ্রন্টলাইন, ৪ই এপ্রিল, ১৯৯৫। তাঁর ১৯১৩ এবং ১৯৫০ সালের মধ্যেকার সমস্ত লভ্য মুচলেকার বিষয়বস্তুর জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৪) কীর, সাভারকার এ্যান্ড হিজ টাইমস, পৃ. ১৮০; বীর সাভারকার পৃষ্ঠা ১৯২

৪৫) ইন্টালিজেন্স ব্যুরো, টেররিজম ইন ইন্ডিয়া (১৯১৭-১৯৩৬) পৃষ্ঠা ১২১

৪৬) পেইন, লাইফ এ্যান্ড ডেথ অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ৬৩১

৪৭) কীর, বীর সাভারকার, ১৯৬৬ পৃষ্ঠা ১৯১

৪৮) কে এম মুনসি, ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল ডকুমেন্টস, প্রথম খণ্ড, পিলগ্রিমেজ টু ফ্রীডম (১৯০৯-১৯৫০) ভারতীয় বিদ্যা ভবন, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৫১

৪৯) ল্যারী কলিনস এণ্ড দোমিনিক লাপিয়ের, ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, বিকাশ, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৩৬২

৫০) রিপোর্ট অফ কমিশন অফ এনকোয়ারী ইন্টু কনস্পিরেসি টু মার্ডার মহাত্মা গান্ধী, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেস, নতুন দিল্লি ১৯৭০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩, অনুচ্ছেদ ২৫, ১০৬

৫১) কীর, বীর সাভারকার, পৃষ্ঠা ৩৬৮ এবং ৩৭১

৫২) HRD, পৃষ্ঠা ২৬ এবং ৬৪

৫৩) আর সি মজুমদার (সাধারণ সম্পাদক) এবং এ এল মজুমদার (সহ-সম্পাদক), স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, মুম্বাই, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ৬১১

৫৪) জয়কর, স্টোরি অফ মাই লাইফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৪১

৫৫) বি আর আম্বেদকর, পাকিস্তান অর পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া, থ্যাকার এণ্ড কোং লিমিটেড, বোম্বে, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৬, পৃ. ১৩০

৫৬) দি স্টেটসম্যান, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০

৫৭) এ জি নুরানী, দি ট্রায়াল অফ ভগৎ সিং : পলিটিক্স অফ জাস্টিস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১

৫৮) দুর্গা দাস (সম্পাদক) সর্দার প্যাটেল'স করসপণ্ডেন্স্ ১৯৪৫-৫০ নবজীবন পাব্লিশিং হাউস, আমেদাবাদ, ১৯৭৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩

৫৯) ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৫

৬০) কীর, বীর সাভারকার, পৃ. ৩৬৯

৬১) দুর্গা দাস (সম্পাদক), সর্দার প্যাটেল'স করসপণ্ডেন্স, পৃষ্ঠা ৬৬

৬২) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৬ই জুন, ১৯৯১

৬৩) দুর্গা দাস (সম্পাদক), সর্দার প্যাটেল'স করসপণ্ডেন্স, পৃষ্ঠা ৩২১

৬৪) ঐ, পৃষ্ঠা ৩২৩

৬৫) ঐ, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

৬৬) রিপোর্ট রিগার্ডিং দি ফ্যাক্টস এ্যাণ্ড সারকামস্টানসেস বুলেটিং টু দি ডেথ অফ শ্রী দীন দয়াল উপাধ্যায়, গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেস, নতুন দিল্লি, ১৯৭০

৬৭) ঐ, পৃষ্ঠা ৬১-৬৩

৬৮) ঐ, পৃষ্ঠা ১২০-২১

৬৯) মুশিরুল হাসান (সম্পাদক), ইসলাম এ্যাণ্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম: রিফ্লেকশানস অন আবুল কালাম আজাদ, মনোহর, ১৯৬২ পৃষ্ঠা ৬-৭

৭০) নুরানী-র দি আর এস এস এ্যান্ড দি বিজেপি দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা: ৮

৭১) হিন্দু মহাসভা রেকর্ডস, ফাইল নং ১৩, প্রভা দীক্ষিত উল্লেখিত, কমুনালিজম : এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৬৮-৬৯

৭২) ডিবেটস অফ দি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ বোম্বে, ১৪নং খণ্ড, ১০ম অংশ, ৩১৪নং সারি।

২. সাভারকারের জাতীয়তাবাদ

১) অশোক মেহতা, ১৮৫৭ : এ গ্রেট রেবেলিয়ান, হিন্দ কিতাবস, বোম্বে ১৯৪৬, পৃষ্ঠা নং

৭ জয়প্রকাশ নারায়ণকে উৎসর্গ করা এই আকর্ষণীয় বইটি ১৯৪০-৪৫ সালের মধ্যে কারাগারে লিখিত। এই গ্রন্থপঞ্জীতে লেখকের গবেষণার প্রমাণ মেলে; ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে তার সম্মানেই তার মন্তব্য।

২) ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮-৭০

৩) দি টেলিগ্রাফ, ১২ই এবং ১৩ই মে, ১৯৮৮

৪) SSW পৃষ্ঠা নং ৩। আমাদের রচনার মূল অংশে এই গ্রন্থের আরো উল্লেখ আরো দৃঢ় ও গভীরভাবে উপস্থাপিত।

৫) ভি ডি সাভারকার সিক্স গ্লোরিয়াস এপোকস্ অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, রাজধানী গ্রন্থাগার, নতুন দিল্লি, ১৯৭০ এম. টি. গডবোল মারাঠী রচনাটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন, এবং তাঁর সচিব বাল সাভারকার কর্তৃক এটি প্রকাশিত। ১৯৬১ সালে এটি সমাপ্ত হয়।

৬) ঐ পৃষ্ঠা ৪৬১

৩. আন্দামান এবং হিন্দুত্বের উৎস

১) ভি ডি সাভারকার, ডি স্টোরি অফ মাই ট্রানসপোর্টেশান অফ লাইফ, মারাঠী রচনাটির ভি এন নায়েক কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত, সদভক্তি পাব্লিকেশান, মুম্বই, ১৯৫০। ভাই ড. এন. সাভারকারকে লিখিত ভি ডি সাভারকারের পত্রাবলী, এ্যান ইকো ফ্রম আন্দামানস, বিশ্বনাথ বিনায়ক কেলকর মুম্বই দ্রষ্টব্য; SSW-তে এটি পুনঃ প্রকাশিত। SSW অনুযায়ী পৃষ্ঠাসংখ্যায় দু'টি রচনাই এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

২) আর. সি. মজুমদার, পেনাল স্টেলমেন্টস ইন আন্দামানস

৩) SSW, পৃষ্ঠা ৪৮১। আমাদের মূল রচনায় SSW -এর পরবর্তী উল্লেখ রয়েছে

৪) আলোচিত খণ্ড দু'টি সম্পাদনা করেছেন কে এন পানিক্কর এবং সুমিত সরকার

৫) জন কীগান, দি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, অ্যালফ্রেড এ. নফ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৯১

৬) এই গ্রন্থে গান্ধীকে বারংবার হাস্যাস্পদ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ৫২১, ৫২২, ৫৫৬, ৫৬৩ পৃষ্ঠা গুলি দ্রষ্টব্য

৭) কীর, সাভারকার এ্যান্ড হিজ টাইমস, পৃষ্ঠা ১০৮

৮) ঐ, পৃষ্ঠা ১০৮-০৯

৯) আর সি মজুমদার, পেনাল স্টেলমেন্টস, পৃষ্ঠা ২০১-০২; ২৩৪ নং পৃষ্ঠার টীকা গুলিও দ্রষ্টব্য

১০) মুশিরুল হাসান, 'টেক্সট বুকস এ্যান্ড ইমাজিন্‌ড্ হিস্ট্রি; দি বিজেপি'স ইনটেলেকচুয়াল 'এজেন্ডা' ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ত্রৈমাসিক , গ্রীষ্ম ২০০২, পৃষ্ঠা ৭৯-৮০

১১) আর সি মজুমদার, পেনাল সেটলমেন্টস, পৃ. ২০১

১২) ঐ, পৃষ্ঠা ২০৪-০৫

১৩) ঐ, পৃষ্ঠা ২৩২

১৪) ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৩

৪. হিন্দুত্ব বনাম হিন্দুধর্ম

১) বিপান চন্দ্র, কমুনালিজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, বিকাশ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১৬৮

২) এ জি নুরানীর ইসলাম এ্যান্ড জিহাদ, লেফটওয়ার্ড বুকস, নতুন দিল্লি, ২০০২ গ্রন্থটির ৫২-৭৬ পৃষ্ঠায় ঐশ্লামিক মৌলবাদ বিষয়ক অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য

৩) নুরানী, দি আর এস এস এ্যান্ড দি বিজেপি, ২০০১ পৃষ্ঠা ৭-৮

৪) দ্রষ্টব্য এ. জি. নুরানীর 'লিগাল অ্যাসপেক্টস টু দি ইস্যু', সর্বপল্লী গোপালের অ্যানটামি আ এ কনফন্ট্রেশান : দি বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি ইস্যু, ভাইকিং; ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৭৭

৫) প্রভা দীক্ষিত, কমুনালিজম : এ স্ট্রাগল ফর পাওয়ার, পৃষ্ঠা ১৭০

৬) ঐ পৃষ্ঠা ১৭১

৭) ভি. ডি. সাভারকার, হিন্দুত্ব : হু ইজ এ হিন্দু? এস. এস. সাভারকার, পাব্লিশার্স বীর সাভারকার প্রকাশন, মুম্বাই, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৯ এই রচনার মূল অংশে এই রচনার সমস্ত পরবর্তী উল্লেখ রয়েছে।

৮) নীনা ব্যাস, দি হিন্দু, ৯ই মে, ২০০২

৯) নুরানী, দি আর এস এস এ্যান্ড দি বিজেপি, ২০০১ পৃ. ১৮

১০) কীর, বীর সাভারকার, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৫২৭

১১) গোলওয়ালকর, বাঞ্চ অফ থটস, বিক্রম প্রকাশন, বাঙ্গালোর, ১৯৬৮

১২) ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩

১৩) স্বপন দাশগুপ্ত, 'নেশনহুড স্পেসিফায়েড : হিন্দুত্ব অ্যাজ এ ডাবল এজড় সোর্ড', দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৯ই জুন, ১৯৯৩

১৪) দি হিন্দুস্তান টাইমস, ২৪শে মার্চ, ২০০২

১৫) দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৭ই মে, ২০০২

১৬) তপন রায়চৌধুরী, 'স্বামী বিবেকানন্দ'স কনস্ট্রাকশান অফ হিন্দুস্থান' উইলিয়াম রেডিস সম্পাদিত স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড দি মর্ডানাইজেশান অফ হিন্দুটজম, OUP ১৯৯৮ পৃ. ১৬

১৭) আলটার কে আন্ডারসন এ্যান্ড শ্রীধর ডি দামলে, দি ব্রাদারহুড ইন স্যাফ্রন, ভিস্টার, নতুন দিল্লি, পৃ. ৩৩। ভি. ডি. সাভারকারের কাছে গোলওয়ালকাবের ঋণের বিষয়ে ৪৩নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৮) ক্ষীর, বীর সাভারকার, পৃষ্ঠা ১৭৫

১৯) ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ সালে লেহ-তে আদবানীর সিন্ধু দর্শন উৎসবের জন্য প্রধান স্বামীর দি কারগিল ওয়ার, লেফট ওয়ার্ড বুকস, ২০০০ ৯৭নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২০) ড. রমেশ যশবন্ত প্রভু বনাম প্রভাকর কে কাণ্ডে, ১৯৯৬, সুপ্রিম কোর্টের মামলা পৃষ্ঠা ১৩০ এবং মনোহর যোশি বনাম নীতিন ভাত্তরাও পাতিল এবং অন্যান্য (১৯৯৬); ISCC পৃষ্ঠা ১৬৯ আরো বিশদ সমালোচনার জন্য দি সুপ্রিম কোর্ট অন হিন্দুত্ব, এ জি নুরানীর সিটিজেনস রাইটস, জাজেস এ্যান্ড স্টেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি, OWP, ২০০২ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ৭৬-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২১) ড. এম ইসমাইল ফারুকি এবং অন্যান্য বনাম ভারতীয় যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য (১৯৯৪) 6SCC ৩৬০, এ জি নুরানীর সিটিজেনস্ রাইটস্, জাজেস এ্যাণ্ড স্টেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২, জাস্টিস ভার্মার কাজকর্মের বিশদ সমালোচনার জন্য ৬৬-৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২২) ড. রমেশ প্রভু বনাম প্রভাকর কে পাণ্ডে, (১৯৯৬), সুপ্রিম কোর্ট মামলা, পৃষ্ঠা ১৩০ এবং মনোহর যোশি— নীতিন. বি. পাতিল ঐ পৃষ্ঠা: ১৬৯

২৩) অভিনাম সিং বনাম সি. ডি. কোমাচেন এবং অন্যান্য (১৯৯৬) ৩ SCC ৬৬৫-৬৭১ নং পৃষ্ঠায়

২৪) ড. দাস রাও দেশমুখ বনাম কমল কিশোর নানাসাহেব এবং অন্যান্য (১৯৯৫) ৫ S.C.C. ১২৩ পৃষ্ঠা ১৩৮ এ

২৫) জাস্টিস ভার্মার বিচারের বিশদ সমালোচনার জন্য নুরানীর সিটিজেন্স রাইটস-এর ৭৬-৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৬) গোলওয়ালকর বাঞ্চ অফ থটস, পৃষ্ঠা ১৩৪ মূল রচনায় পরে উল্লেখিত

২৭) বি. বি. মিশ্র, দি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল পার্টিস, OUP. ১৯৭৬ পৃষ্ঠা ১৬২-৬৩

২৮) আন্ডারসন এবং দামলে, ব্রাদারহুড ইন স্যাফ্রন, পৃষ্ঠা ২৮-২৯

২৯) ঐ পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ আন্ডারসনের চমৎকার প্রবন্ধ, 'দি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ', ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি : ২৫শে মার্চ, ১৯৭২, ৬৭৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এখানে পরে অ্যান্ডারসনের মতো RSS নামে উল্লেখিত।

৩০) এর পরে HRD হিসেবে উল্লেখিত। পরবর্তী সমস্ত উল্লেখ এই রচনার অন্তর্ভূক্ত।

৩১) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

৩২) সীতারামাইয়া, দি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, বোম্বে, পদ্মা, ১৯৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩৫-১৯৪৭ পৃষ্ঠা ৫১৩-৫১৪

৩৩) এইটি এবং পরবর্তী উদ্ধৃতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর লিভস ফ্রম এ ডায়েরি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩, ১৭৫-৯০ পৃষ্ঠা থেকে

৩৪) ঐ

৩৫) ঐ ১০৬ নং পৃষ্ঠা

৩৬) জয় চ্যাটার্জী, বেঙ্গল ডিভাইডেড, হিন্দু কমুনালিজম এ্যান্ড পার্টিশান, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ১৮৯। একটি পাদটীকায় দেখা যায় যে, মুখার্জীর নিজের একটি তারিখবিহীন টীকা থেকে এটি নেওয়া হয়েছে।

৩৭) 'হিন্দুত্ব'স ফরেন টাই-আপ ইন দি ১৯৩০, আর্কাইভাল এভিডেন্স; ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২২শে জানুয়ারি, ২০০০ পৃষ্ঠা ২১৮-২৮

৩৮) কাসোলারিস-এর উৎস হলো NAI হোম পোল বিভাগ, ২৮শে আগস্ট, ১৯৪২, গোপন তদন্তের বিবরণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, ৭ই মার্চ, ১৯৪২

৩৯) কাসোরালির উৎসগুলি হলো, বিশেষ গৃহ দপ্তর ৬০ D (ডি) অংশ II ১৯৩৭, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৮ শেষ হওয়া সপ্তাহের জন্য বোম্বে গোপন নথি থেকে অংশবিশেষ, শিরোনাম 'হিন্দু এ্যাফেয়ারস' এবং 'সামারি রিপোর্ট অফ দি মিটিং হেল্ড ইন দি তিলক সমারোহ মন্দির অন বিহাফ অফ পুনা স্টুডেন্টস; ৩রা আগস্ট, ১৯৩৭, মহারাষ্ট্র রাজ্য আর্কাইভস, (MSA), বিশেষ গৃহ দপ্তর, ১০০৯ III , ১৯৪২, '২৭শে মে ১৯৪৩ পুনায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের অফিসার প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের একটি সারসংক্ষেপিত প্রতিবেদন' শিরোনামে পুলিস রিপোর্ট, এবং বিশেষ গৃহ দপ্তরের ১০ই জুন, ১৯৪৩ তারিখের টীকা থেকে।

৪০) টুওয়ার্ডস ফ্রিডম : ডকুমেন্টস অন দি মুভমেন্ট ফর ইন্ডিপেনডেনস ইন ইন্ডিয়া ১৯৪৩-৪৪, অংশ III , সম্পাদনা, পার্থসারথি গুপ্ত, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ, অক্সফোর্ড প্রেস ১৯৯৭

৪১) ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৪১

৪২) ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৬৬

৪৩) ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৪৭-৪৮, ৫০, ৫১

৪৪) নিকোলাস মানসার্গ, দি টান্সফার অফ পাওয়ার ১৯৪২-১৯৪৭, M.M.S.O. লন্ডন, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২৩

৪৫) হিস্টোরিক স্টেটমেন্টস্, ভি. ডি. সাভারকার, পৃষ্ঠা ১০৯-১৩

৪৬) ঐ, পৃষ্ঠা ২১৯-২০

৪৭) ঐ, পৃষ্ঠা ২১৬

৫. গান্ধী হত্যা

১) দি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৫শে মার্চ ১৯৭২ তারিখের নিবন্ধের তৃতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ৬৮১। অ্যাণ্ডারসন তিন দশক আগে ভারতে আসেন। তিনি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র দপ্তরে সম্মানীয় 'ইন্ডিয়া হ্যান্ড'

২) কীর, সাভারকার এ্যান্ড হিজ টাইমস, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৩৭১

৩) বিষয়বস্তুর জন্য গৌবা, পৃষ্ঠা, ৩৭৬-৭৭ দ্রষ্টব্য

৪) কাপুর প্রতিবেদন, অংশ II , পৃষ্ঠা ৪৪-৪৭

৫) জগদীশ চন্দ্র জৈন, আই কুড নট সেভ বাপু, জাগরণ সাহিত্য মন্দির, কামাচা, বেনারস, ১৯৪৯

৬) ভারত সরকারের ১৯৩৫ এর আইন অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলা হতো।

৭) কাপুর প্রতিবেদন, অংশ II , পৃষ্ঠা ৩৫৬, অনুচ্ছেদ ২৬, ১১২, ১১৩ এবং ১১৪

৮) প্রথম অধ্যায়, ৪০নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৯) প্রথম অধ্যায়, ৪৩ নং পৃষ্ঠা, উল্লেখ্য হিসেবে

১০) দুর্গা দাস (সম্পাদিত) সর্দার প্যাটেলস করেসপন্ডেনস্ ১৯৪৫-৫০, নবজীবন পাব্লিশিং, হাউস, আমেদাবাদ, ১৯৭৩, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩

১১) ঐ, পৃষ্ঠা নং ৬৫

১২) কাপুর প্রতিবেদন, অংশ II, পৃষ্ঠা ৩০৩, অনুচ্ছেদ ২, পৃষ্ঠা ১০৬

১৩) গোপাল গডসে, মে ইট প্লিজ ইয়োর অনার : স্টেটমেন্ট অফ নাথুরাম গডসে, পুনা-১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৪, রচনার প্রধান অংশে এই গ্রন্থের পরবর্তী উল্লেখ রয়েছে।

১৪) পেইন, লাইফ এ্যান্ড ডেথ অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃষ্ঠা ৬১৮

১৫) আদালতে সাভারকারের ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৮ তারিখের ৭, ৮, এবং ৯নং অনুচ্ছেদ, NAI মহাত্মা গান্ধী হত্যার মামলার ছাপানো রেকর্ড রয়েছে নতুন দিল্লির ভারতের জাতীয় আর্কাইভস-এ। সেগুলি পড়ে দেখার এবং আর কিছু অংশ অনুলিপি করে নেবার অনুমতি দেওয়া লেখক NAI -এর কাছে ঋণী

১৬) গোপাল গডসে, গান্ধীজীস মার্ডার এ্যান্ড আফটার, ইংরাজি অনুবাদ, অধ্যাপক এস. টি গডবল, সূর্য প্রকাশন, নঈ সড়ক, দিল্লি ১৯৮৯। মূল রচনায় এর পরবর্তী উল্লেখ রয়েছে।

১৭) কীর, সাভারকার এ্যান্ড হিজ টাইমস, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৩৬৮

১৮) ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬৯

১৯) কলিনস এ্যান্ড লাপিয়ের, ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট, ৩৬৪ পৃষ্ঠা

২০) ঐ, পৃষ্ঠা ৩৮৩-৮৪

২১) পি. এল ইনামদার, ডি স্টোরি অফ দি রেড ফোর্ট ট্রায়াল ১৯৪৮-৪৯, পপুলার, প্রকাশন, বোম্বে, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ১৪১

২২) ঐ, পৃষ্ঠা ১৪২

২৩) ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩

২৪) কাপুর রিপোর্ট, অংশ II, পৃষ্ঠা ৩৭-৭০

২৫) কীর, বীর সাভারকার, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৪৭৭

২৬) সরকার পক্ষের সাক্ষী শেঠ চরণ দাস মেখাজীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য

২৭) PW ৮৬, পৃষ্ঠা ৪১৮ দ্রষ্টব্য

২৮) নতুন দিল্লির ভারতের জাতীয় আর্কাইভে প্রামাণ্য নথি ছাড়াও নথির জন্য গান্ধী মার্ডার ট্রায়াল, টেগোর মেমোরিয়াল পাব্লিকেশন, নতুন দিল্লি, ১৯৪৯ দ্রষ্টব্য

২৯) কাপুর প্রতিবেদন, অংশ II, পৃষ্ঠা ৩০০, অনুচ্ছেদ ২৫.৯২ এবং ২৫.৯৩

৩০) ঐ, অংশ II, পৃষ্ঠা ৩০৩, অনুচ্ছেদ ২৫.১০৬

৩১) ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৫, অনুচ্ছেদ,২৫.১১৩

৩২) ঐ, অংশ I, পৃষ্ঠা ৩৬, অনুচ্ছেদ ৩.৫৮

৩৩) ঐ, পৃষ্ঠা ৫৪, অনুচ্ছেদ ১৯.১৮

৩৪) ঐ, পৃষ্ঠা ৫৯, অনুচ্ছেদ ১৯.৪৫

৩৫) কাপুর প্রতিবেদন, অংশ II, পৃষ্ঠা ৭৪

৩৬) চন্দ্রচূড় প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৭-৮

৩৭) কলিনস এবং লাপিয়ের, ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃষ্ঠা ৩৬২

৩৮) ঐ পৃষ্ঠা ৪৫৩

৬. পরিণতি

১) এস গোপাল (সম্পাদিত) সিলেকটেড ওয়ার্কস্ অফ জওহরলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল ফান্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দ্বিতীয় সিরিজ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২

২) দুর্গা দাস (সম্পাদিত) সর্দার প্যাটেল'স করেসপণ্ডেনস্ ১৯৪৫-৫০, নবজীবন পাব্লিশিং, হাউস, আমেদাবাদ, ১৯৭৩, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬

৩) ইন্টারন্যশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৫ই অক্টোবর, ২০০২

৪) নুরানীর দি আর এস এস এ্যাণ্ড দি বিজেপি, পৃষ্ঠা ৬৬

৫) ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৫ই অক্টোবর, ২০০২

৬) নুরানীর দি আর এস এস এ্যান্ড দি বিজেপি, পৃষ্ঠা ৩১ দ্রষ্টব্য

৭) কীর, বীর সাভারকার পৃষ্ঠা ৪৩০-৩১

৮) ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩২

৯) সাভারকার, হিস্টোরিক স্টেটমেন্টস, পৃষ্ঠা ২৩৫

১০) ঐ, পৃষ্ঠা ২২৪

১১) কীর, বীর সাভারকার পৃষ্ঠা ৫২৭

১২) পেইন, দি লাইফ এ্যান্ড ডেথ অফ মহাত্মা গান্ধী, পৃষ্ঠা ২০৯

১৩) দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২২শে নভেম্বর, ১৯৯৩

১৪) অরবিন্দ রাজগোপালের নেওয়া গোপাল গডসের সাক্ষাৎকার, ফ্রন্টলাইন, ২৮শে জানুয়ারি, ১৯৯৪